যে দিকটায় ভাঙন ধরল তার হেতু হয়তো বা অপর্ণার নিজেরও অজ্ঞাত। সময় অসময়ে তার অকারণ রুক্ষতায় চন্দ্র কখনো বিস্মিত কখনো বা বিমূঢ়। কিন্তু এও অভ্যস্ত হয়ে আসছে ক্রমশ।

ডাঃ সমাদ্দার রেডিয়াম পড়াচ্ছেন। তাঁর উত্তেজনায় ছাত্ররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সরমা পিছনের বেঞ্চে হেলান দিয়ে ফিরে তাকায় দরজার দিকে। পাগল প্রফেসারকে ক্ষেপিয়ে দিলেন যিনি, দরজায় ওধারে তাঁকে দেখা যায় কি না।

সরমা ব্যানার্জী।

খিদিরপুরে মোটর মেরামতের দোকান ছিল ওর বাবার। তাঁর হাতুড়ি-পেটা সুবর্ণ মূর্তি আজও চোখে ভাসে। মাকে মনেও পড়ে না। তিনি অনেক আগেই গেছেন। বড় ভাই মণিময়ের গানের সুনাম আছে বন্ধুমহলে। সেটুকু বজায় রাখতে গিয়ে দোকান রাখা আর হয়ে ওঠে নি। মেয়েদের সায়েন্স পড়া আর ছেলেদের মেয়েলী সুরে গান গাওয়া নিয়ে ভাই-বোনের অকৃত্রিম বচসা শ্রবণাভিরাম।

কিন্তু সরমার প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে অপরিহার্য যার নাম, সে অবিনাশ। কালো, ঢ্যাঙা, হাড়-জর্জরে। সৃষ্টির নির্মম পরিহাস যেন। অনেক ওপরে পড়ত, দ্বিতীয় বিজ্ঞান বার্ষিক ক্লাসে উঠে সরমা সহপাঠিনী হল তার। ছ বছর আগে ওদের প্রথম পরিচয়টুকু হাস্যরসাত্মক।

কমবয়সী ছেলেদের অদ্বিতীয় রহস্য-সখা অবিনাশ। এক পার্শী ধনীর দুলাল চ্যালেঞ্জ করল, ক্লাসে সরমা ব্যানার্জীর পাশে বসতে পারো? কুড়ি টাকা বাজি।

সমস্বরে হেসে উঠেছিল অন্য ছেলেরা। সরমার স্বাস্থ্যদৃপ্ত গৌর তনুর পাশে অস্থিবস্থা-নিন্দিত মূর্তিটি কল্পনা করা যেতে পারে। বিধাতা অট্টহাসি হেসে গেছেন ওর চেহারার মধ্যে।

রাজী, টাকা ফেলো।

ডাঃ চন্দ্রর ক্লাসে কিন্তু।

বহুত আচ্ছা।

ডাঃ চন্দ্র এই বেসরকারী কলেজে সদ্যনিযুক্ত অধ্যাপক তখন। গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি।

মেয়েদের আসন আলাদা। চন্দ্র ক্লাসে আসেন নি এখনো। অবিনাশ এসে দাঁড়াল সরমার সামনে। বিনয়-বিনম্র।

অন্য ছেলেরা রুমাল চাপা দিয়েছে মুখে। সরমা সবিস্ময়ে তাকালো তার দিকে।

আমি আপনার এপাশটিতে বসব। বিশ টাকা বাজি ফেলেছে ওই বাঁদরগুলো, গরিব মানুষ, ভালো খেতে পাইনে দুবেলা, লোভ সামলাতে পারলুম না। সরে বসুন না একটু—

প্রস্তাব শুনে সরমার দু-চোখ বিস্ফারিত।

অবিনাশের কণ্ঠস্বর মোলায়েম শোনায় আরো।—দেখুন, প্রায় মানুষের মতোই চেহারা নয় আমার, রোগে সারা তার ওপর। তবু ওদের ঠাট্টা আমার লাগে। দেবেন একটু জায়গা ?

মুখে হাসির মতোই লেগেছিল সরমার। কিন্তু বিপন্ন অবস্থাটা অগোচর নয় কারো। বই-খাতা নিয়ে অবিনাশ পাশে বসে পড়ল।

চন্দ্র এলেন। খুকখুক কাশির শব্দে হাসি চাপার চেষ্টায় ক্লাসঘর মুখরিত। রহস্য বোধগোচর হতে চন্দ্রও হেসে ফেলেছিলেন। সামলে নিলেন।

তুমি ওখানে কেন অবিনাশ ?

ওরা বড় জ্বালায় স্যার। বিনীত জবাব।

জায়গায় যাও।

আমি এঁকে বলেই এখানে বসেছি স্যার, আপনি জিজ্ঞাসা করে দেখুন। হাত বাড়িয়ে সরমার কেমিস্ট্রি বইটা টেনে নিল সে।—আজও অ্যালুমিনিয়ামই পড়ান স্যার, সেদিন ভালো বুঝতে পারিনি।

বেগতিক দেখে চন্দ্র পড়াতে শুরু করে দিলেন।

বাজির টাকা আদায় হতে সময় লাগল না। স্থির হল, পরদিন চায়ের সমারোহ হবে ক্লাসসুদ্ধু। কিন্তু অবিনাশের হাত থেকে রেহাই পেতে সরমা পালিয়ে বেড়াল পর পর সাতদিন।

এরপরে সরমা ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে। অবিনাশের অধ্যবসায় রবার্ট ব্রুসের প্রতিস্পর্ধী। পরীক্ষার ফল বেরুলে প্রতিবারই সরমা জিজ্ঞাসা করত, কী হল ?

কি আবার হবে।

পাস করেছ ?

আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

সরমার দাদা মণিময়ের কৌতুক আর একটু নির্মম। শেষবারে টিপ্পনী কাটল, এক কাজ কর অবিনাশ, বিয়ে-থাওয়া করে ফেল; ছেলে হোক, একসঙ্গে পরীক্ষা দিস।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অবিনাশ, সরমা কি রাজী হবে তাতে!

মণিময়ের বিব্রত চোখ জুটে দেয়ালের গায়ে সন্নিবিষ্ট। সরমা উঠে সশব্দে এক চাঁটি বসিয়ে দেয় অবিনাশের মাথায়।

কিন্তু একটা গুণ আছে মানুষটার। আঁকতে পারে ভালো। পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে শেষে একেই সম্বল করে নিল একদিন। সরমার সঙ্গে মতান্তর ঘটল সেদিন, যেদিন দেখল এ বিদ্যাটির পরিণতি দাঁড়াচ্ছে কমার্সিয়াল আর্ট-এ। রুটের বিজ্ঞাপন আর সুগন্ধ-তৈল-বিহারিণীর সুষমা প্রকাশের জন্য তুলিচালনা কুশল।

এসব কি হচ্ছে শুনি?

মন্দ কি। টোবাকো কোম্পানিতে বিজ্ঞাপন আঁকার কাজ নেব ভাবছি।

উদ্ধার করবে। এ বুদ্ধি ছাড়বে তো ছাড়ো, নইলে সব ফেলে ছড়িয়ে একাকার করে দেব আমি।

তার আগে ফ্রক পরে নিও একটা।

সরমা হেসে ফেলে, আঁকবার আর জিনিস পেলে না, সিগারেট আর নারকোল তেলের বিজ্ঞাপন?

টাকা আসছে।

টাকার জন্যে এই?

এই। টাকা পেলে দেহটা অন্তত বাঁচে কিছুকাল।

আর যেটা মরে?

সেটা অনেক আগেই মরেছে।···সেই যেদিন চন্দ্রর ক্লাসে বসেছিলাম তোমার পাশে।

হুঁ? হাসতে গিয়েও হাসি আসে না সরমার। চেয়ে থাকে মুখের দিকে।

ধ্যেৎ ছাই! অবিনাশ তুলি ফেলে দেয় হাত থেকে, সবুজ কালিতে লিকুইড হয়ে গেল সব কিছু, আমার আবার মরা বাঁচা। পালাও এখন, এ লেটারিংগুলো সেরে দিতে পারলে টাকা পাব দশটা—ছেলে ঠ্যাঙানো নেই আজ?

শশব্যস্তে উঠে আসে সরমা। আছে বইকি। সাধারণ ঘরের দৈনন্দিন সংগ্রাম পায়ে পায়ে। তার আছে ছেলে পড়ানো আর আছে সেখানে একজনের একাগ্রতা থেকে রোজ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসার দায়িত্ব।

সেই একজন বিপিন চৌধুরী।

অল্প বয়সে বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার দুর্দম কর্মপদ্ধতি অনেক অবাঙালী সহব্যবসায়ীর ঈর্ষার কারণ। তাঁরা সামনে করেন প্রশংসা, আড়ালে বলেন ওয়াইল্‌ড্‌। বর্তমানের বাসস্থল সান্তাক্রুজএ। মেরিন্‌ লাইন্‌সএ সাততলা বাড়ির ছক্‌কাটা আছে মগজে। অবকাশ কম। আর, অবসর সময়েও ওর ছোট গাড়িটা তুর্যগতিতে শহরের এমাথা ওমাথা করে বেড়ায় দিনে কতবার হিসেব নেই। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অপরাধে জরিমানা গুনেছে অনেক। স্বভাব বদলায় নি। তারই খুড়তুতো ভাই মণ্টুকে পড়ায় সরমা।

তবু খারাপ লাগত না। নানা ছলে পড়ার ঘরে বিপিনের আবির্ভাব এবং মণ্টুকে বাইরে পাঠিয়ে তার সঙ্গে আলাপের প্রয়াস, এও না। মণ্টু ছেলেমানুষ নয়, বোঝে সবই।

এর মধ্যে তোমার মাথা ধরে গেল!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, গেল—তুই যা দেখি আগে, অ্যাস্‌প্রো কিনে নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। ওকে একটু ছুটি দিন সরমা দেবী।

ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু লেগে থাকে শুধু, সরমা মুখে বলে না কিছু। মণ্টুর নিষ্ক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিপিন বসে পড়ে চেয়ার টেনে।—যা ব্যাপার শেয়ার মার্কেটের এ যদি দেখতেন একবার, পাকা লোকেরও মাথা ধরিয়ে ছেড়ে দেয়।

সাড়াশব্দ নেই অন্য তরফ থেকে।

মণ্টু পড়ছে কেমন?

ভালো।

এবার পাশ করতে পারবে তাহলে?

দেখা যাক।...আপনার যেরকম মাথা ধরা শুরু হয়েছে।

বিপিন হেসে ওঠে সশব্দে. লোকটা পাকা নই তেমন বুঝতেই পারছেন।

কিন্তু মানুষটির আর একটা দিকের আভাসও সরমা পায় এখানে পড়াতে এসে। দোতলা থেকে খাবারসুদ্ধু থালা-বাসন অথবা আসবাবপত্র যখন আছড়ে পড়ে একতলার মাটিতে, সরমার ভারী ইচ্ছে করে তার তখনকার সে মূর্তি দেখতে।

মণ্টু বহুদিন লজ্জা পেয়েছে সরমাকে অবাক হতে দেখে। বলে, দাদার রাগ, কোন মানে হয় না…।

রগচটা বিপিন চৌধুরীকে সরমা চিনত। কিন্তু তারই মধ্যে আছে আর একজন যে পারে তুচ্ছ থালা-বাসনের মতো অপরের জীবন-যাত্রা ভেঙে তচ-নচ করে দিতে, পারে প্রতিহিংসার আগুন জেলে নিজেকে সুদ্ধু সে আগুনে ভস্মীভূত করে ফেলতে, এ কি কোন দিন ভেবেছে।

এ বাড়িতে তার পড়াতে আসার বৈচিত্র্যটুকু হৃদয়গ্রাহী।

মণ্টু পাকা ছাত্র। আই. এসসি উত্তরণের দুরতিক্রমণীয় বাধা উপলব্ধি করে পর পর দু-বার পরীক্ষা না দিয়েই ফিরে এসেছে। আরো আসতে পারত বারকতক। সরস্বতী বাদ সাধলেন।

যোগাযোগটা ঘটেছিল চন্দ্রর প্ররোচনায়। বিপিন চৌধুরী দাদা ডাকত তাঁকে। দেখা-সাক্ষাতের স্বল্পতায় বাল্যবন্ধুত্ব চেনাশুনায় পর্যবসিত। একজনের ল্যাবরেটারির গবেষণা আর একজনের শেয়ার বাজারের। কাছাকাছি নয় কোনটা। তবু তাঁকে দেখামাত্র কাকীমার মেঘ-মূর্তিই স্মরণ হল বিপিনের।

একজন ভালো প্রফেসার-টফেসার দেখে দাও না মোহিনীদা, মণ্টুকে পড়াবে। কাকীমার ধারণা এ অভাবটুকুর জন্যেই ছেলে পাস করতে পারছে না তাঁর।

পাস করেও কাজ নেই তাহলে, শেয়ার মার্কেটের দড়ি পরিয়ে দাও মাকে। চকিতে মনে পড়ল কি।—মণ্টু আই. এসসি. পড়ে না?

হ্যাঁ।

প্রফেসার রাখতে চাও, মাইনে তো অনেক দেবে?

দেড়-শ দু-শ দিতে পারি।

চন্দ্র ভাবলেন একটু। মেয়ে টিচার রাখবে? বেটার দ্যান্ এনি অর্ডিনারি প্রফেসার?

বিপিন চৌধুরী ভেবে দেখার অবকাশ পেল না। চন্দ্রর উৎসাহ চতুর্গুণ।—ব্রিলিয়েন্ট স্কলার, সিক্সথ ইয়ারে পড়ছে এখন…সি ইজ নিডি, তবু রাজী হবে কি না বলতে পারিনে। হলে পাঠিয়ে দেব।

কাকীমাকে বলে দেখি একবার—

কিছু বলতে হবে না, আমার কথা বোলো তাঁকে। এখন শ-খানেক দিলেই হবে।

সরমার কাছে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছিলেন ঘুরিয়ে।—পড়াশুনার ক্ষতি না হলে একটা ভালো কাজ যদি পাও নেবে? আমাকে ধরেছে তারা। অবিনাশের সঙ্গেও পরামর্শ করতে পারো।

সরমা বিস্মিত। অবিনাশের নাম উল্লেখের পিছনে হেতু কি, সেটা সরমা জানে না তখনো।—কার কথা বলছেন?

তোমার। ছেলে পড়াতে হবে, একশ টাকা মাইনে দেবে এখন।

চকিতে কানের কাছটা লাল হয়ে ওঠে সরমার। ক্ষুদ্র জবাব দেয়, পরামর্শ করতে হবে না, আপনি বলে দেবেন যাব।

শুনে অবিনাশ হাসল। সরমা জলে ওঠে আরো।—ভেবেছে কি সবাই শুনি? আমি ছেলে পড়াব কি না সে পরামর্শও তোমার সঙ্গে করতে হবে?

ভারী অন্যায়। আমার পরামর্শ ছাড়া এক পা-ও নড় না তুমি বাইরের মানুষ এ জানল কি করে!

তেলে জলে মেলে না। সরমার স্বভাবেও রাগ মেশে না। হাসি সামলালো তবু, আমি বলে দিয়েছি যাব।

ততোধিক গম্ভীর অবিনাশ।—আমারও তাই পরামর্শ।

নির্দেশমত সরমা চৌধুরীগৃহে উপস্থিত। পরিচারিকা গঙ্গাবাঈ তাকে পড়ার ঘরে বসতে দিয়ে অন্দরমহলে ছুটল খবর দিতে। টেবিল থেকে একটা বিজ্ঞানের বই তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল সরমা। তার তখনো ধারণা, ছেলে পড়াতে হবে মানে ফোর্থ ক্লাস, থার্ড-ক্লাস, বড় জোর সেকেণ্ড ক্লাস।

ষড়যন্ত্রটা মণ্টুর অজ্ঞাত তখনো।

শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়তে হবে শুনে আঁতকে উঠল প্রথম। এ ভয় তার মারও ছিল। তার ওপর ব্যবস্থাটিও মনঃপূত নয়, বিপিনের মেজাজ বুঝে অমতটা জানাবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু অবসরমত তাকে পাওয়া দুরূহ।

শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের কল্পনা বিপিনেরও ছিল না কোন কালে। চন্দ্রর মুখের ওপর অসম্মতি জানাতে পারে নি শুধু। কিন্তু আধুনিকতায় অরুচির নজির নেই নব্য কর্মীর। নতুনত্বটা লোভনীয় ঠেকল অচিরে। লেখাপড়া-জানা মেয়ের সন্ত্রস্ত চাউনি অবলোকন করল মনে মনে। দ্বিধা অতলে নিমজ্জিত। ব্যবস্থাটা অন্দরমহলে পেশ করে দিয়েই খালাস।

মা!

ঘর-ফাটানো আর্তনাদে মণ্টু উপস্থিত মাতৃ-সকাশে। চারুদেবী প্রমাদ গুনলেন। এ মা ডাক তেমন মধুর নয়।

আমি কি করব, তোর দাদা ঠিক করেছে।

দাদা ঠিক করেছে! রাগে ক্ষোভে মণ্টু স্তব্ধ খানিকক্ষণ।—যেতে বলে দাও, শিগগীর, কেন আমাকে আগে বলো নি কিছু?

আঃ, শুনতে পাবে যে! বাড়ি বয়ে এসেছে, সামনে গিয়ে বোস্ দুদিন। পরে দাদাকে বলিস্ ওড়াতে পারে না কিছু—শুনলে নিজেই বারণ করে দেবে সে।

ও, আচ্ছা আমিই বলে দিচ্ছি—।

হুড়দাড় নীচে নেমে এলো। পড়াশুনা করলে পাশ করতে পারত না এমন নিরেট নয়। কিন্তু এ বিপদ কে জানত!

ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক উত্তাপ তিরোহিত। পা দুটোও আড়ষ্ট লাগছে কেমন। চেয়ার টেনে বসল আস্তে আস্তে।

বসে থেকে বিরক্তি ধরে গেছে সরমার। হাতের বই টেবিলে রাখল। সাড়া না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনার ভাই পড়বে?

মণ্টুর মেজাজ বিগড়াল আবার।—না আমি। দু বছর আই. এসসি পরীক্ষা দিই নি ইচ্ছে করে, কলেজের পরীক্ষাতেও দশ-পনেরোর বেশি পাইনে কখনো—এবারেও ফেল করব জানা কথা। কিন্তু পাস না করতে পারলে আপনার দোষ হবে—পড়াবেন কি না ভেবে দেখুন।

সরমা হতভম্ব। একে এ পরিবেশের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তায় এমন শর্ত। হাসি পেল একটু বাদেই। ছেলেটি পড়তে অনিচ্ছুক তার কাছে, সুস্পষ্ট। উঠে চলে আসত হয়তো, কিন্তু কথা শুনে একেবার বাজিয়ে দেখার লোভ সামলাতে পারল না। সকৌতুকে খানিক দেখল তাকে। পরে জবাব দিল, ভাবতে সময় লাগবে একটু।...বয়সে বড় আমি, নাম ধরে ডাকলে আপত্তি হবে না তো?

সন্ধ্যের দেরি ছিল তখনো। জবাবে খটাস করে সুইচটা টিপে দিল তবু। —আমার নাম মণ্টু।

সরমাও চেষ্টা করল গম্ভীর হতে।—আমাকে যদি ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে বলো এক্ষুনি বসে, সব বিষয়ে শূন্য পাব। তুমি দশ-পনের পাও যখন কিছু জানো নিশ্চয়।

মণ্টু মুখ তুলে বুঝতে চেষ্টা করল পরিহাস কি না। গম্ভীর মুখে জবাব দিল, কিছু না। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মোটে বুঝিনে আমি।

সরমা হাসল।—তুমি সুইচ টিপলে আলো জলবে এ তো জানাই ছিল। কি করে জলল, কারেণ্ট এল্লো কি করে, আলো জললে দেখতেই বা পাবে কেন, আমার কথা তোমার কানে যাচ্ছে কি করে—এ যদি বোঝ ভাল করে, দেখবে ইণ্টারমিডিয়েট ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির সব উত্তর ওতেই আছে।

শঙ্কটাপন্ন অবস্থা মণ্টুর। নির্বাক চোখ দুটো বলতে চায়; ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি।

একটু থেমে সরমা বলল, মেয়েছেলের কাছে পড়তে হবে এ দুর্ভাবনা কাটিয়ে উঠতে পারো যদি তোমার পরীক্ষাপাশের ভার আমি নিতে পারি।

সাপের মাথায় ধুলোপড়া বলে একটা কথা আছে। পাশের ঘরের আড়াল থেকে চারুদেবী লক্ষ্য করছিলেন তাই। ছেলের ধ্যানবুদ্ধ মূর্তি নয়নাভিরাম ঠেকল না। সহসা বীতরাগ জন্মাল সবগুলি চেনা মানুষের ওপর। বিপিনের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন, ছেলের উপরে রেগে গেলেন, ক্রুদ্ধ হলেন নবাগতার প্রতি এবং বাড়ির ঝি গঙ্গাবাঈ বিনা কারণেই ধমক খেল গোটাকতক।

দুই একদিন না যেতেই দুর্ভাবনা বাড়ল আরো। বিনা তাগিদে ছেলে নিজেই যথাসময়ে বসে যায় বইপত্র খুলে এ বেশ ভালো কথা। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর মুখের কথা না শুনে তার টকাটক আঁক-কষা-হাতে লাবণ্যশ্রী দেখবে তন্ময় হয়ে এবং একটানে আঁকা ফিজিক্সের ডায়গ্রামের দিকে না তাকিয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকবে অবাক বিস্ময়ে, এ তেমন ভালো কথা নয়।

মেয়েটা পড়ায় ভালো নিশ্চয়। মাথা বোঝাই বিদ্যে থাকুক আপত্তি নেই, ছেলেরই ফল ভালো হবে পরীক্ষায়। কিন্তু ছেলে পড়িয়ে দিন চলে যার তার আবার কথায় কথায় এই মুখ টিপে হাসার রোগ কেন!

শিক্ষয়িত্রীর অভাব নেই বোম্বাই শহরে, কিন্তু বিপিনের সঙ্গে যোগাযোগের রহস্যটুকু না জানার অস্বস্তি প্রবল।

সাতদিন অবিশ্রান্ত খাটুনির পর বিপিন চৌধুরীর অবকাশ মিলেছে একটু। আগেই বাড়ি ফিরল সেদিন। বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজের হেডলাইনের আড়ালে বিশ্রাম নিচ্ছে। মুখে পাইপ। দ্বারপ্রান্তে অচেনা নারীমূর্তি দেখে সবিস্ময়ে মুখ তুলল।

ভেতরে আসুন, কাকে চান?

মণ্টু…।

মণ্টু! ও মণ্টু। চিৎকার করে ডাকল, মণ্টু, মণ্টু, মণ্টু! চকিতে মনে পড়ল কি। মণ্টু—মানে, মণ্টুকে আপনি পড়ান নাকি?

হ্যাঁ।

ও। আসুন, আসুন। ত্রস্তে ব্যস্তে সরমাকে নিয়ে এলো পড়ার ঘরে। চেয়ার এগিয়ে দিল, বসুন। আমি মণ্টুর দাদা, বিপিন চৌধুরী। চন্দ্র সাহেব বন্ধু আমার, আপনার সম্বন্ধে তিনিই আমাকে বলেছিলেন।

সরমা নমস্কার জানাল।

নমস্কার, বসুন আপনি, মণ্টু!

হাঁকডাক শুনে মণ্টু পড়ি মরি করে ছুটে এসেছিল। জায়গামত বসল সে। বিপিন দমে গেল। সে নিষ্ক্রান্ত হলেই পাঠ শুরু হতে পারে।

দেড় ঘণ্টা।

পাশের ঘরে চেয়ার সরানোর শব্দ কানে আসতে খবরের কাগজ ফেলে দিল বিপিন। হেডলাইন পড়া, পায়চারি করা, ডাঃ চন্দ্রকে মনে মনে ধন্যবাদ জানানো. নারী-কণ্ঠের টুকরো টুকরো কথাবার্তা অনুধাবনের প্রয়াস, ইত্যাদির পর আর বাকি থাকে কি? ভাবরাজ্যে বিচরণ। শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীর পক্ষে পণ্ডশ্রম তাও।

পড়ালেন?

জবাবে সরমার গতি ঈষৎ মন্থর হল শুধু।

চন্দ্র সাহেবের মুখে শুনেছি ভালো স্কলার আপনি, দেখুন মণ্টু যদি পাস করতে পারে এবার। তা বলে খুব বেশি খাটতে হবে না আপনাকে, যা পারেন একটু আধটু দেখিয়ে দেবেন। এবারে না হয় আসছে বারে পাস করবে'খন, কি বলো মণ্টুবাবু?

অদূরে অবস্থান করছিল মণ্টু। বলা বাহুল্য, শ্রুতিমধুর ঠেকল না কানে। সরমা মৃদু হেসে মণ্টুর বিক্ষুব্ধ মূর্তির দিকে তাকাল একবার।

একতরফা আর কিছু বলাটা শেয়ার বাজারের দালালির মত শোনাবে এ জ্ঞান অবশ্য আছে বিপিনের। অগত্যা কাগজের দিকেই দৃষ্টি সংবদ্ধ হল আবার। সরমা চলে গেছে ততক্ষণে।

কেমন পড়ায় রে?

যে কোন একটা প্রশ্নের অপেক্ষায় ছিল মণ্টু।—ভালো। কিন্তু ওঁকে দেখে তুমি করলে এমন—ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি—যেন আজই উনি নতুন এলেন এখানে।

ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি! আমি? কখন?

কখন! আমার পাস ফেলের জন্য এমন দরদ যদি তোমার একশ টাকা মাইনে দিয়ে ওঁকে রাখার দরকার ছিল কি শুনি?

দুবার বেপরোয়া আক্রান্ত হয়ে ধমকে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না বিপিনের।

দিন যায়। সরমার ছাত্র আর একজন বেড়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। কখনো শেয়ার-ডিস্‌কাউণ্টের সামান্য প্রশ্ন নিয়ে চিন্তিত মুখে সরমার সাহায্য প্রার্থনা, কখনও বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের তুলনামূলক গবেষণা—কখনো বা মাথা ধরায় অপরিমিত অ্যাসপ্রো সেবনের ফলাফল সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা। কিন্তু কথা একাই বলে যেতে হয়। অন্য তরফ নির্বাক শ্রোতা। বিরক্ত হয়ে বলেও ফেলে বিপিন, আচ্ছা আপনি এত কম কথা বলেন কেন, মণ্টুকে তো বেশ পড়ান? ওই তো, ওই হাসিটুকুই কি জবাব হল!

মণ্টুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, আর ডিস্‌টার্ব করব না।...একটা কথা, কস্টিক সোডা লার্জ-স্কেল ম্যানুফ্যাকচারের একটা স্কীম আছে আমাদের। ওর চীপ প্রিপারেশান্ তো আপনাদের ভালো জানা আছে?

সরমা বোঝে, আবার আধ ঘণ্টার সূত্রপাত। জবাব দেয়, আমার বই-পড়া জানা ব্যবসায়ে কোন কাজে লাগবে না। চন্দ্র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করব, তিনি ভালো পরামর্শ দেবেন।

না না—চন্দ্র সাহেবকে কিছু বলে কাজ নেই, আমি এমনি বলছিলাম।

ক্রমশ কতকগুলি অনুভূতির প্রকোপ দেখা দেয় বিপিন চৌধুরীর মনে। শেয়ার বাজারের উত্তেজনায় রোমাঞ্চ নেই। মোটর নিয়ে ছোটাছুটির আভিজাত্যে মাদকতা নেই। আর, শুধুই অর্থ রোজগারের মোহগ্রস্ততায় আবেগ নেই।

সরমার অসচ্ছলতার খবর রাখতেন চন্দ্র। একবার তাঁর সাময়িক অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব ও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যানও করেছিল। মণ্টুকে পড়াবার ব্যবস্থা করে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

একদিন অবিনাশই সরমার ভালোমন্দের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে চাপিয়েছিল।

প্রায় দু-বছর আগের ঘটনা।

ওর লেখা ছোট একটা চিঠি উপলক্ষ করে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক আজ

বন্ধুত্বে পর্যবসিত। কালো ঢ্যাঙা মূর্তিটির আড়ালে কি যেন চোখে পড়েছে সেদিন। চিঠি ভোলেন নি—

'সরমা ব্যানার্জীকে মনে আছে মাস্টার মশাই? যখন আই, এস্‌সি পড়াতেন কলেজে, ছাত্রী ছিল আপনার? সেবারে প্রথম হয়েছিল কেমিস্ট্রিতে, এবার বি, এস্‌সি পরীক্ষা দিয়েছে। ভারী ইচ্ছে এম, এস্‌সি পড়ে।

কিন্তু এদিকে 'যাবার সময় হল বিহঙ্গের'। ডাক্তার মুখভার করেন তাঁদের শাস্ত্র-বহির্ভূত হয়েও দেহটাকে এমনি আঁকড়ে আছি কি করে। আমার অবর্তমানে সরমার ভার নিতে হবে। নিঃসংশয়ে জানি, রত্নের মত নিজের মূল্যেই দাম ওর। অবহেলায় অযোগ্য লোকের ভিড় বাড়াবার সম্ভাবনাও তাই বেশি। চেনাশুনা সকলের মুখ স্মরণ করলাম, আপনাকেই বারবার মনে পড়ছে। আপনার স্বীকৃতি পেলে এবারের মত বিশ্বরূপ পরিদর্শন শেষ করতে পারি। আসুন না একবার ওপরের ঠিকানায়?—অবিনাশ।

অবিনাশের বাচালতা জানতেন। তবু খটকা লাগে কেমন। ওর বাড়ি এসে স্তম্ভিত। অবিনাশের জ্ঞান ছিল না তখন।

কিন্তু অবিনাশ বেঁচে গেল সে যাত্রা। বিকলপ্রায় রুক্ষ শীর্ণদেহে প্রাণশক্তির পরাক্রম দেখে বিস্মিত হয়েছিল সবাই।

তার পরে একদিন সকালে তদারক করতে এসে চন্দ্র থমকে দাঁড়িয়েছিলেন বাইরে। সরমা বকছে অবিনাশকে, চোখ বড় বড় করে দেখচ কি, খেয়ে নাও এটুকু।

জবাবে অবিনাশের কবিত্ব কানে এলো, 'আজু রজনী হম ভাগে পোহায়নু, পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা—'

দুদিন আগেও যাকে নিয়ে অক্লান্ত টানা-হেঁচড়া গেছে যমে-মানুষে, কে বলবে এ তারই কণ্ঠস্বর। চন্দ্র বাইরে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন মৃদু মৃদু।

হাঁ করো, এই সাত সকালে আর রঙ্গ করতে হবে না। সমস্ত শরীরের মধ্যে আছে তো দুটো চোখ।

অবিনাশের হাস্যধ্বনি।—কালো, তা সে যতই কালো হোক না কেন, আছে আমার কালো হরিণ-চোখ।

সরমাও হেসে ফেলেছে হয়তো।—তোমার হল কি বলো তো, এই না চোখ উল্টে বসেছিলে সেদিন?

আ-হা, মরণ রে! তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান, তুঁহুঁ মম—

থাক, চললাম আমি। ঠক করে পথ্যের বাটি নামিয়ে রাখার শব্দ। দরজার সামনে এসে সরমা অকস্মাৎ রাঙা হয়ে উঠল চন্দ্রকে দেখে। তিনিও বিব্রত।

আসুন স্যার—

উৎফুল্ল মুখে অবিনাশ উঠে বসতে চেষ্টা করল প্রায়। আসুন মাস্টারমশাই, আসুন। সরমা বলছিল, আপনাকে নাকি দিনে দশ ঘণ্টা করে এখানে আটকে রেখেছি এ ক'দিন। শুনে ওকেই বকলাম ফিরে, অন্যায় করেছ—বৌদি হয়তো ওদিকে দিনে ঠিক দশটিবার করেই মুণ্ডুপাত করেছেন আমার।

সরমা সন্ত্রস্ত। চন্দ্রও অবাক। ভূতপূর্ব ছাত্রের মুখে এ কৌতুক বিসদৃশ। কিন্তু রাগতে গিয়েও পারলেন না। মিথ্যে বলে নি সরমা। সমস্ত অবয়বের মধ্যে ওর আছে দুটি চোখ। সহজ, স্বচ্ছ।

খেয়ে নাও।

খাচ্ছি। সরমার দিকে চেয়ে হেসে উঠল অবিনাশ, হাঁ করে ফেললে যে একেবারে! তুমি নাম ধরে ডাকলেও লোকটা যে আমি এক যুগের ওপরে প্রাচীন তোমার থেকে সে খেয়াল আছে? স্কুল-কলেজ মিলিয়ে বার দশ-এগারো ফেল মেরেছি, নইলে মাস্টারমশাই দুই এক বছরের বেশি বড় হবেন না বয়সে, বৌদি সম্পর্কটা চলতে পারে, পারে না মাস্টারমশাই?

সরমাকেই বলল, কি চন্দ্রর অস্বস্তি লক্ষ্য করে তাঁকেই শোনাল সঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু সঙ্কোচ কাটল চন্দ্রর। তার দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে হল বন্ধুত্ব কাম্য বটে। হেসে জবাব দিলেন, খুব পারে। বৌদি কি করেছেন ভালো হয়ে নিজেই একবার জিজ্ঞাসা করে এসো। ওকে দুধটা দাও সরমা—

এক চুমুকে বাটি খালি করে দিল অবিনাশ। এক ঢোঁক জল খেয়ে হঠাৎ হেসে ফেলল চন্দ্রর দিকে চেয়ে।—কিন্তু মাস্টারমশাই, যাবার সময় তো স্কুল না বিহঙ্গের?

তিনি স্মিত হাস্যে জবাব দিলেন, না।

সরমা কিছু না বুঝে দুজনকেই নিরীক্ষণ করল শুধু। অবিনাশের চিঠির প্রহসন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তার।

অপর্ণা অভিশাপ না দিক, খুব খুশিও হয় নি। আহার নিদ্রা এমন কি পড়া-শুনা ভুলে ঘরের লোকটির বাইরের কারো প্রতি এ টান কোথায় যেন লাগে। অর্থও ব্যয় হয়েছে কম না। অবিনাশের চিকিৎসার ত্রুটি রাখেন নি চন্দ্র।

কিন্তু চাবি অপর্ণার কাছে।

প্রথম প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই টাকা বার করে দিয়েছে। ঠাট্টা করে লেছে, ছাত্রের জন্য মাস্টারের এমন দরদ আর দেখি নি। পড়ানো ছেড়ে াতব্য চিকিৎসালয় খুলে বোসো একটা।

জবাবে অবিনাশের চিঠিটা তার দিকে এগিয়ে দেন চন্দ্র।—দেখো, মরতে সেও আর একজনের জন্য ভাবতে পারে কেমন?

অ্যাসিড পাউডার গ্যাস নিয়ে কারবার তাঁর, মনস্তত্বের ধার ধারেন না। ইলে করতেন না এমন ভুল।

সরমা কে?

ছাত্রী ছিল. এম, এস্‌সিতে ভর্তি হবে এবার—চিঠিতেই তো লেখা াছে সব।

এ ছেলেটির কে হয়?

কে আবার হবে, কেউ না।

তবে?

কি তবে?

কিছু না। একটা গানের বই খুলে বসল।

আবহাওয়া প্রতিকূল ঠেকছে। দ্বিধা কাটিয়ে চন্দ্র বলেন, সিন্দুকটা খোলো তা একবার।

কি দরকার?

টাকা লাগবে কিছু।

টাকা নেই সিন্দুকে।

হ্যাঃ, খুব জানো তুমি, আমি দেখলাম সেদিন হাজার টাকা।

অপর্ণার মেজাজ চড়া, নতুন পিয়ানোটা এল কোথা থেকে? আমি রোজগার করে এনেছি সে টাকা?

পিয়ানোর সংবাদ চন্দ্র যদি শুনেও থাকেন, ভুলে গেছেন। প্রয়োজনের ময় বিঘ্ন দেখে বিরক্তি বাড়ল।—কতদিন তোমাকে বলেছি ঘরে কাঁচা টাকা াকা দরকার কিছু, এখন তাড়াতাড়িতে কোথায় যাই বলো তো!

গানের বই অপর্ণার হাত থেকে পড়ে গেল। স্থির নেত্রে রোষ-বহ্নি। কছুটা বা অভিমান। উঠে সরাসরি ফোন তুলে নিল হাতে।

চন্দ্র হকচকিয়ে গেলেন কেমন।—ও কি?

নিরুত্তরে অপর্ণা ডায়েল ঘুরিয়ে নম্বর মেলাতে লাগল।

কাছে এসে চন্দ্র রিসিভার কেড়ে নিলেন হাত থেকে।—কি ব্যাপার?

পিয়ানো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলব।

সময় লাগে তাকে শান্ত করতে। কিন্তু টাকা দরকার। সময়ও কম। চন্দ্র কটাক্ষে দেখেন স্ত্রীটিকে।

চেক বইটা—

অপর্ণা নীরব।

চেক বইটা দেখে দেবে কোথায় আছে?

এর অনেক দিন বাদে জবাব দেবার সুযোগ অবশ্য পেয়েছেন চন্দ্র। না বলার মধ্য দিয়ে হয়তো বলেও ছিলেন কিছু।

বিনা আমন্ত্রণে সেদিন অবিনাশকে দেখে চন্দ্র বিস্মিত। খুশিও।

এসো, এসো—হঠাৎ তুমি! কই শরীর তো সারে নি তেমন?

সহাস্যে আসন গ্রহণ করল অবিনাশ।—ওইটেই বিশেষত্ব আমার, কেমন আছি দেখে বোঝবার জো-টি নেই।

খুব ভালো।

না তো কি। যমকে ফাঁকি দিয়েছি পাঁচ মাস আগে আর পাঁচ মাস বাদে হয়তো যমরাজা নিজে আসবেন স্বয়ং। পরোয়া করিনে, আপনি আছেন।··· এক্ষুনি উঠব কিন্তু, কাজে এসেছি একটু।

পকেট থেকে তিনখানা একশ টাকার নোট টেবিলের ওপর রাখল সে।—সরমাকে লেখাপড়া শেখানো মিথ্যে মাস্টারমশাই। আমার অসুখে কত খসল আপনার সে হিসেবটুকুও রাখে নি ঠিকমত। ভালোই হয়েছে, আমি অবশ্য রাগ করেছি মুখে, যে দেনা শুধতে পারা যাবে না তার হিসেব নাই রাখলে, তা বলে—

চন্দ্রর বিব্রত মুখভাব দেখে হেসে উঠল, আপনি একেবারে সোজা মানুষ মাস্টারমশাই। আমার টাকা এমনি আটকে থাকলে পাঁচ মাসে সতেরো বার তাগিদ দিতুম। উঠল, আচ্ছা আসি, আর একদিন বৌদির সঙ্গে বোঝাপড়া করে যাব।

কিছুক্ষণ। চন্দ্র অন্যমনস্ক। অপর্ণার কণ্ঠস্বরে মুখ তুললেন।

মূর্তিটি কে?

অবিনাশ, পছন্দ হল ?

খুব। মাস্টারমশাই বলে ডাকলেও কথাবার্তা পূজনীয় ব্যক্তির মত, পছন্দটা তাইতে বাড়ল আরো।

চন্দ্র নোট ক'টা তার দিকে ঠেলে দিলেন।—তুলে রাখো, ওর অসুখে যে টাকা খরচ হয়েছিল ফেরত দিয়ে গেল।

মোটা কেমিস্ট্রি বইয়ের আড়ালে তাঁর মুখ দেখা গেল না।

॥ ২ ॥

সায়েন্স কলেজ। ল্যাবরেটারির কোণের দিকে সরমার ডেস্ক। আজানু অ্যাপ্রনের দু হাত কনুই পর্যন্ত গোটানো। অবিন্যস্ত রুক্ষ কেশ। অ্যাসিড গ্যাস এবং ধোঁয়ায় মুখ আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে গবেষণার প্রতিক্রিয়া লিখে রাখছে খাতায়।

সব ক'টা ডেস্কএ বার্নার জ্বলছে সারি সারি। ছাত্ররাও কর্মনিবিষ্ট। সরমার সামনের ছেলেটি বিমনা হয়ে পড়ছে বার বার। নিজের কাজ দেখতে গিয়ে প্রতিবারই চোখ পড়ছে স্বাস্থ্যদৃপ্ত নারীপ্রাচুর্যের দিকে।

ওপাশ থেকে স্বজাতীয় আর একজন টিপ্পনী কাটে দিশি ভাষায়, ফুটন্ত অ্যাসিডে মুখটা যেন পোড়ালে হে মাথুর, কিন্তু কৈফিয়ত দেবে কি ?

যারা বুঝল তারা হেসে উঠল। রহস্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করল অন্য সকলে।

অভিযুক্ত আসামী প্রতিবাদ জানায়, দেখেছ মিস্ ব্যানার্জি, যা তা বলছে !

সরমা শিশি থেকে আরো খানিকটা অ্যাসিড ঢেলে দিল ফুটন্ত সলিউশনে। ওদের হাসি-ঠাট্টায় একবার কান দিলে রক্ষা নেই।

রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ঝাঁজ খানিকটা এদিক ওদিক ভেসে আসতে সাড়ম্বর কাশির সঙ্গে নাকে রুমাল চাপা দিল ছেলেরা। ঝাঁজের উগ্রতা একেবারে ছিল না এমন নয়। কাছে ছিল বলে সরমার নিজের চোখেই জল এসে গেছে। কিন্তু ঘটা করে কাশবার মত এমন কিছু করে ফেলে নি সে। তবু অপ্রস্তুত হল, আরক একটু বেশিই ঢেলে ফেলেছে।

ছেলেরা রেহাই দেবে না তাকে।—ওটা কিসের গবেষণা হচ্ছে মিস্ ব্যানার্জী, প্রাণ গেল যে !

সরমা সামনের এলোমেলো দুই-একগাছা চুল একদিকে সরিয়ে জবাব দিল, পরিশ্রম করে কাশতে হলে প্রাণ যাবেই, কাশি বন্ধ করো—এর নাম অ্যাসিটিল্-ক্লোরাইড।

দু দিন বাদে এ মেয়েই প্রথম হবে পরীক্ষায় সকলে জানে। ওরা বিব্রত করতে ছাড়বে না তবু। সর্বনাশ ! আমাদের তাড়াতে চাও এখান থেকে মুখে বলো না কেন।

মুখে বললে কি আর তোমরা যাবে!

ওটা কি কাজে লাগবে মিস্ ব্যানার্জী? দূর থেকে রাশ টেনে ধরে এক ভাটিয়া ছাত্র।

সরমা হাসিমুখে নিজের কাজ নিরীক্ষণ করতে লাগল। এমনি চলতে পারত আরো কিছুক্ষণ। দোরের কাছ থেকে হঠাৎ একজন বাঙালী ছাত্র নাটকীয় অভ্যর্থনা করে উঠল, স্বা-গতম্!

দ্বার-প্রান্তে দৃষ্টি পড়ল সকলের। আগন্তুক অবিনাশ। সুপরিচিত এবং সুপ্রতীক্ষিত। সপ্তাহে দু-তিন দিন তার এখানে আগমন অনিবার্য। অস্ফুট আনন্দ গুঞ্জরণে হল ভরপুর। সরমা ছদ্ম-গাম্ভীর্যে নিবিষ্ট-চিত্ত।

মাথুর ছেলেটি দোষস্খালনে সচেষ্ট হল এইবার। দরাজ গলায় আহ্বান জানাল, এসো অবিনাশবাবু, বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে সময় নষ্ট কোরো না। মিস্ ব্যানার্জী অ্যাসিটিল্ ক্লোরাইডের গন্ধ-ধূপ রচনা করে প্রতীক্ষায় আছেন, তোমার বিলম্ব দেখে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে দেখো—সঙ্গে আমাদেরও।

সরমা ডেস্কে ঝুঁকে পড়ল আরো। হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়াল অবিনাশ। নাকে কাপড়ের খুঁট এবং চোখে জামার আস্তিন চেপে ধরল নাটকীয় ভঙ্গীতে। —এই যে এসে গেছি।

বসে থাকো ওই টুলটায়। মুখ না তুলেই সরমা ঝাঁঝিয়ে ওঠে প্রায়।

ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তোমার এক্সপেরিমেণ্টের চোটে ভূত পালাবে এক মাইল দূর থেকে, আমি তো ছার মানুষ।

তবে পালাও, আমার দেরি হবে।

হুঁ। বারোমাসে তেরো রোগে ভুগি বটে সত্যি কথা, পুরুষমানুষ নই তা বলে! গম্ভীর মুখে সরমার টুলটা দূরে সরিয়ে বসে পড়ল। পরে কাশতে লাগল বিপুল বেগে।

দৃশ্য উপভোগ্য। সকলেই হাসছে। সরমাও।

অবিনাশ বলল, কালে কালে দেখব কত, আগে ছিল উনুনের ধোঁয়ায় জল গড়াত মেয়েদের চোখে, এখন ল্যাবরেটারির গ্যাসে। এর পরে বলবে, যুদ্ধ করব এরোপ্লেন চড়ে আর বক্সিং শিখব জো-লুইর কাছে।—আজই মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করব আমি।

বিপুল হাস্য-ধ্বনি।

ছদ্ম কোপের অভিব্যক্তি সরমার মুখে।—থামবে?

অবিনাশ নির্বিকার।—ধমকে থামালে থামব বইকি।

কিন্তু ছেলেরা ছাড়বে না ওকে। নিরীহ প্রশ্ন করে একজন, মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করবে কেন অবিনাশবাবু?

কেন করব না তাই বলো। এমনিতে বছরে পাঁচ মাস থাকি হাসপাতালে, তার ওপর হামেশা এই ল্যাবরেটারির ঝাঁজ—বাঁচব ক'দিন! মিনিস্টারকে বলব, সায়েন্স পড়া চলবে না মেয়েদের, কেমেস্ট্রি তো নয়ই। অন্তত ফ্যাসিটি-ক্লোরাইড—

অ্যাসিটিল্ ক্লোরাইড। সংশোধন করল একজন।

তর্ক জুড়ে দেয় অবিনাশ, পুরোমাত্রায় ফ্যাসিজম্ পদার্থটির বিক্রমে, ফ্যাসিটিক্লোরাইডই ঠিক নাম।

ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং শব্দে। ছুটির ঘণ্টা। ছেদ পড়ল রসালাপে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যাবরেটারি প্রায় ছাত্রশূন্য। সরমা এবং আর জনাকতক তাদের অসমাপ্ত কাজটুকু তাড়াতাড়ি শেষ করে নিচ্ছে। অবিনাশ ধ্যানমগ্ন। অর্থাৎ, নিঃশব্দে বসে।

ডাঃ চন্দ্র উপস্থিত ল্যাবরেটারিতে। অবকাশ সময়ে মাঝে মাঝে টহল দেন। সরমা লিখছিল মাথা নিচু করে, লক্ষ্য করল না। চন্দ্র একে একে সকলের কাজ নিরীক্ষণ করলেন চুপচাপ। কাছে আসতে সরমা সচকিত হয়ে অবিনাশকে আড়াল করে দাঁড়াল।

অ্যাসিটিল্ ক্লোরাইড?

হ্যাঁ। পিছনে হাত দুটো তার ইশারায় অবিনাশকে নির্দেশ দিচ্ছে কিছু।

চন্দ্র বললেন, অবিনাশের জন্য ব্যস্ত হতে হবে না তোমাকে, ওর অধ্যবসায় তোমার থেকে কম নয়।

এঁর সামনে অপ্রস্তুত হওয়া এই প্রথম নয়। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে সরমা বার্নারের শিখা বাড়িয়ে দিল খানিকটা।

ধ্যান-বুদ্ধের মতই বসে আছে অবিনাশ।

চন্দ্র বার্নার নিভিয়ে দিলেন।—তারপর অবিনাশ, তুমি এখানে যে?

অবিনাশ সবিনয়ে জবাব দিল, এখানে এ সময়ে আপনি আসবেন জানতুম না স্যার। কোনদিন তো এমন ফ্যাসাদে পড়ি নি।

সরমা বিব্রত মুখে ফিরে তাকাল একবার। আর যারা ঘরে আছে, কথা

কানে গেলেও বাংলা বোঝে না এই রক্ষা। মৃদু হেসে চন্দ্র অবিনাশের সামনে এসে দাঁড়ালেন।—তার মানে প্রায়ই এখানে এসে থাক তুমি।

প্রায়ই। আসাটা প্রায় রাইট-এ দাঁড়িয়ে গেছে এখন।

কিন্তু দারোয়ান তো জানে বাইরের লোকের এখানে আসা বারণ।

অমায়িক হাসিটুকু সহজেই দেখা দেয় অবিনাশের মুখে। উঠে দাঁড়াল।—দারোয়ান এও জানে স্যার আপনি সায়েন্স কলেজে চলে এলেন বলেই আমার আই.এস্‌সি পড়া খতম হয়ে গেল। তাই বলে না কিছু।

সরমা প্রমাদ গুনছে মনে মনে। বেশি ঘাঁটাতে গেলে কি যে বলে বসবে ও ঠিক নেই। কিন্তু এখানে পদমর্যাদা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ডাঃ চন্দ্রও। অল্প হেসে ঘুরে দাঁড়ালেন।—তোমার সঙ্গে কথা আছে সরমা, কাজ শেষ হলে আমার ঘরে এসো একবার। অবিনাশকে আহ্বান জানালেন, তুমিও আসবে নাকি ?

না মাস্টারমশাই, সরমা রেগে যাচ্ছে। আমি বরং বাইরের ফাঁকা হাওয়ায় দাঁড়াই একটু। কেমন পাকা স্বাস্থ্য আমার জানেন তো, ফ্যাসিটি ক্লোরাইডের দাপটে ঘায়েল হয়ে গেছি।

দ্বিতীয় অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে সে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। নীরব হাস্যে চন্দ্রও। ডেস্কের সরঞ্জাম যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে সরমা অ্যাপ্রন খুলে ফেলল। সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে চন্দ্রর ঘরে এলো।

বোসো। ডাক্তার সমাদ্দার রিটায়ার করে যাচ্ছেন শিগগীরই শুনেছ ?

না তো! সরমা বিস্মিত।

তোমাদের এই সেশান্‌ই শেষ, আর ধরে রাখা যাবে না। নিজে কতগুলো এক্সপেরিমেণ্ট করবেন বলে অবসর নিচ্ছেন, প্রকাণ্ড ল্যাবরেটারিও ফেঁদে বসছেন বাড়িতে। জনকতক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নেবেন, আমাকেও চাকরি ছাড়তে হতে পারে।

সরমা নীরবে শুনছে।

তুমি পরীক্ষার পর রিসার্চ করতে চেয়েছিলে না ?

সরমা ঘাড় নাড়ল।

একটু ভাবলেন তিনি।—তাঁর সঙ্গে কাজ করতে চাও তো চেষ্টা করে দেখতে পারি। ভালো রিসার্চ-স্কলারের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে অবশ্য… তবু আমি বললে হবে। কি বলো ?

খুশির ছোঁয়া লাগে। তবু শান্ত মুখেই জবাব দিল, আমি আর কি বলব স্যার…এ কাজ আমি কতটা পারব আপনিই ভালো জানেন।

চন্দ্র নীরবে চেয়ে থাকেন স্বল্পক্ষণ।—আচ্ছা যাও, পরে খবর দেব।

কি নিয়ে কাজ করবেন তিনি?

চন্দ্র হেসে উঠলেন হঠাৎ, সেটা তিনি নিজেও জানেন কি না সন্দেহ আছে। তবে…সে জন্মে ভাবিনে, যাই করুন ভবিষ্যতে তার দাম হবে। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবে এইটেই বড় কথা। আচ্ছা, ভালো করে পড়াশুনা করো তো এখন, রেজাল্ট ভালো হওয়া চাই।

পথের ধারে অবিনাশ প্রতীক্ষারত। সরমা কাছে আসতে ধমকে উঠল, ছুটির ঘণ্টা বেজেছে তো ঘণ্টাখানেক আগে, এতক্ষণে ছাড়লেন চন্দ্র সাহেব?

হ্যাঁ। সরমা চেষ্টা করল গম্ভীর হতে। তোমার স্বভাব বদলাবে কবে?

মরলে, দিন-তারিখ সঠিক বলতে পারছি না এখন।

সমুদ্রের ধারে একটা নির্জন জায়গায় অবকাশ পেলেই এসে বসে দুজনে। সেদিকে পাশাপাশি অগ্রসর হল। সরমা বলল, ঠাট্টা নয়, ভদ্রলোক নেহাত ভালো মানুষ তাই, কোনদিন সত্যিই দারোয়ান ডাকলে বুঝবে মজা।

ছদ্ম-রাগে ভুরু কোঁচকাল অবিনাশ।—দেখো, রাগিও না। বছরে পাঁচ মাস হাসপাতালে কাটালেও গোটা তিরিশেক বসন্ত পার হয়েছে এই কাঠামোয়। চন্দ্রর ওই পর্বতকান্তির পায়ে আছড়ে পড়ে গর্জন করব, অপমান সহ্য হবে না স্যার, যুদ্ধং দেহি!

শাসন মাথায় থাকল। সকৌতুকে ফিরে তাকাচ্ছে পথচারীও। শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে সরমা হাস্য দমন করল কোন প্রকারে।

নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে বালুর ওপর বসল তারা। সামনে অতলান্ত জলরাশির দিকে চেয়ে অবিনাশ সুগম্ভীর প্রশ্ন করে, আর কি বক্তব্য তোমার?

সায়েন্স কলেজে আসতে পাবে না আর।

আসবই। ছেলেরা আমাকে ভালবাসে, মেয়েরাও বাসত, চেহারার জন্মে পারে না।

মেয়েরা বলতে আমি ছাড়া আর কে থাকে ল্যাবরেটারিতে?

মেয়েদের বেলায় বহুবচন প্রয়োগ করতেই ভালো লাগে আমার—তোমার কথাই বলছি।

হুঁ। নিরীহ মুখে সরমা একমুঠো বালু ওর শার্টের কাঁধের ফাঁক দিয়ে পিঠময় ছড়িয়ে দিল।—আর এটা কেমন লাগে?

এ হেন দুষ্কার্য এই প্রথম নয়। গম্ভীর মুখে অবিনাশ দু হাত ভরে বালু তুলতে লাগল। অর্থাৎ, আজ সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।

সরমা সশঙ্কে সরে গেল খানিকটা।—ভালো হবে না বলচি!

কি ভালো হবে না?

আমি চ্যাঁচাবি—

আচ্ছা অন্ধকার হোক। বালু ফেলে দিল অবিনাশ।

আপসের চেষ্টা দেখে সরমা, ঝেড়ে দিচ্ছি—। জামা তুলে রুমাল দিয়ে পিঠ মুছে দিতে লাগল।

ওতেও রাগ পড়বে না, এ নিয়ে তিন-চারদিন হল।

বেশ হল। ছেলেদের সামনে অমন করবে আর?

আমার কি দোষ, ওরা খুশি হয়।

তা বলে তুমি উস্‌কে দেবে ওদের?

নিশ্চয় দেব। কোথায় কাব্য করব উদাস কণ্ঠে অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের পল্লবে, অধরা ছিল তোমার কাঁকন-পরা নিটোল হাতের মধুরিমায়—না ক্যাপ্‌টিক্লোরাইড নিয়ে হাবুডুবু!

সমস্বরে হেসে ওঠে দুজনেই। শুভ্র দুই হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সরমা বলল, কাঁকন কই?

মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

সরমার দাদা মণিময়। নাটক লেখা শুরুর পর থেকে ব্যানার্জী ছেড়ে বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছে। কোট প্যাণ্ট, নেকটাই এবং ডার্বি-শু দুটোও সিকি দরে বিক্রি করে দিয়েছে এক বন্ধুর কাছে। রকমারি খদ্দরের চাদর এবং তালপাতার চটির জন্য মাঝে মাঝে সরমার কাছে ধার চাইতে হয়। না পেলে রুদ্রমূর্তিতে শরণাপন্ন হয় অবিনাশের। টাকা পায় এবং সঙ্গে আরো কিছু, যার জন্যে মনে মনে ওকে জ্যান্ত কবর দিতে ছাড়ে না প্রায়ই।

বিপত্নীক। ছেলে আছে বছর পাঁচেকের। স্ত্রী বেঁচে থাকতে সঙ্কল্প ছিল ছেলেকে সাহেব ইস্কুলে পড়তে পাঠাবে। অধুনা বাংলা দেশের শান্তিনিকেতনই পছন্দ বেশি। এ সম্বন্ধে সরমার পরামর্শও নিতে গিয়েছিল। জবাব পায় নি

জানে সরমা অবহেলা করে তাকে। ফলে ছেলের মাথায়ই সশব্দে চাটি পড়েছে একটা।

দাদরে ছোট এক অপরিসর গলির মধ্যে একতলায় পাশাপাশি দুখানি ঘর। প্রথমটি মণিময়ের আবাস, তার পুঁথিপত্র হারমনিয়াম সমেত। পরেরটা সরমা এবং বিনুর।

মণিময়ের গানের টিউশন আছে গোটা দুই। রেডিও থেকেও যৎকিঞ্চিৎ রোজগার হয়। আবার কোথায় কোন্ রেকর্ড কোম্পানির অস্থায়ী স্বর-শিল্পীও বটে। কিন্তু মাসের শেষে ঘরে বাইরে ধার চাওয়াটা আছেই। সকলকেই আশ্বাস দেয়, নতুন নাটকটা সিনেমায় কণ্ট্রাক্ট হলে ঋণ পরিশোধ করবে। স্টুডিওতে প্রাত্যহিক হাজিরা এবং বিনীত আবেদনেরও বিরাম নেই। কিন্তু কণ্ট্রাক্টটুকু হয়ে উঠছে না আর।

প্রথম প্রথম লিখে সরমাকে দেখাতে চেষ্টা করেছে।—পড়ে দেখ।

পড়ে নীরবে পাণ্ডুলিপি প্রত্যর্পণ করেছে সরমা। নিষ্ফল প্রতীক্ষা। সরমা আর বলে না কিছু।

কেমন লাগল?

তোমাকে এ রোগে পেল কেন আবার, বেশ তো গান নিয়ে ছিলে।

অবজ্ঞা মর্মান্তিক।—তুই আর্টের বুঝিস কি শুনি? অ্যাসিড আর গ্যাস নয়, এর নাম সাহিত্য।

ভুলবশতই পাণ্ডুলিপি খোলা পড়ে থাকে অবিনাশের চোখের সামনে। তার পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যমনস্ক না থেকেও উপায় নেই। পরে ব্যস্ত হয়ে উঠে আসে।—আমার খাতাপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কেন আবার, সবই তো কাজে লাগে তোমার। কোন্‌টা ওটা, শেষের নাটকটা নাকি?

হ্যাঁ, এই নাও। প্রথমটা লিখতে শুরু করো এবার।

মণিময় নিজের দুর্ভাবনায় তন্ময়। খেয়াল করল না। বলল, ক'টা বইয়ের দোকান তো ছাপতে রাজী এক্ষুনি, বলে কপি-রাইট বিক্রি করে দাও—আমাকে কলা দেখাবার মতলব আর কি। ভাবছি দেখে শুনে দিয়ে দেব একজনকে। আমার আবার পড়ে দেখা হয় নি লেখার পর থেকে, ভুলটুল নেই তো কিছু?

কিছু না।

মণিময় আসন নিল তার পাশে। উৎসাহ ঘনীভূত।—আচ্ছা হিরণ্ময়ীর

ডায়লগগুলি একটু বেশি স্ট্রেইট্ হয়ে গেছে, না? মুখের ওপর সত্যি কথা ঝপাং করে বলে দেওয়া…মিল নেই সাধারণ পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে…

আমিও ভাবছিলাম সে কথা। অবিনাশ চিন্তিত।

কিন্তু ওই জন্যেই তো এমন অ্যাট্রাকৃটিভ্ হয়েছে মেয়েটির চরিত্র।

তা তো হয়েইছে। পড়ে বিয়ে করতে ইচ্ছে যাচ্ছিল হিরণ্ময়ীকে, সরমার ভয়ে চুপ করে আছি।

অতঃপর একজনের মারমুখী বাক্যবাণ এবং আর একজনের বোবা অভিব্যক্তি। সরমা মুখে আঁচল গুঁজে পাশের ঘরে চলে আসে।

কিন্তু সম্প্রতি তার লেখা নিয়ে পরিহাসের দুঃসাহস সরমা এমন কি অবিনাশেরও নেই। বছর দুই ঘোরাঘুরির পর সত্যিই একটা নাটক ছাপা হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যে বিবর্তনের ছাড়পত্র। ওর ভয়ে কথায় কথায় অবিনাশের কাব্য আওড়ানোও বন্ধ।

সম্প্রতি এর চেয়েও বড় সমস্যা উপস্থিত। তার লেখা আর একটা সদ্য-সমাপ্ত নাটক কপি করে দিতে হবে। নিরুপায় হয়ে সরমা অবসর মত কপি করছেও। কিন্তু বিলম্ব দেখে মণিময়ের ধৈর্য বিড়ম্বিত।

সরমা এবং অবিনাশ সেদিন সবে ফিরেছে সায়েন্স কলেজ থেকে। মণিময় চৌকিতে আধ-শোয়া লেখায় মগ্ন। মেঝেতে বিনু বসে আছে গম্ভীর মুখে। কান্নার সদিচ্ছাটুকু প্রবল। বার দুই ধমক খেয়ে সে চেষ্টা আর করে নি। একজন ছোকরা চাকর ওকে রাখত, সম্প্রতি তার অসুখের দরুন শিশুটি একেবারে নিঃসঙ্গ। সস্প্যানে দুধ রেখে গেছে গয়লা। অমনি পড়ে আছে, কেউ ঢেকে রাখে নি।

ঘরে প্রবেশ করেই অবিনাশ ঘুরে দাঁড়াল। ঠোঁটের ওপর তর্জনী ঠেকিয়ে ইশারা করল, চুপ, লিখছে!

ঘরের চারিদিক দেখে নিয়ে সরমা বিনুর দিকে তাকাল।

শিশুটির ধৈর্য রক্ষা সম্ভব নয় আর। ফুঁপিয়ে উঠল, পিসী, খিদে পেয়েছে।

নাট্যকার তন্ময় তখনো।

সরমা নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ না তুলেই মণিময় আপ্যায়ন করল, শুনবি খানিকটা?

ছেলেটাকে খাওয়াও নি কেন এখনো?

অ্যা—? ধ্যেৎ ছাই, দিলি মুডটা নষ্ট করে। ওই তো দুধ, খাইয়ে দে—ওর খিদে পেয়েছে।

আমার দায় পড়েচে, থাক শুকিয়ে, হাতের কাচে স্টোভ, গরম করে ওকে খাইয়ে তারপর রাজ্যোদ্ধারে বসতে পার' নি ?

মণিময় সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। দুধ খাওয়ানোর মত তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে তার লেখার প্রতি এ অশ্রদ্ধা বৃশ্চিকদাহের মত লাগে। চিন্তিত।—মানুষের সূক্ষ্ম বোধ-শক্তি, শিল্পী-মন, এসবের বোধ করি আর দাম থাকবে না অদূর ভবিষ্যতে। বিনুকে নিয়ে সরমা চলে গেছে তার ঘরে। দুধের প্যান্ এবং স্টোভ হাতে অবিনাশও।

পাশের ঘর। সরমা চৌকিতে বসে। অবিনাশ স্টোভে দুধ জ্বাল দিতে ব্যস্ত। বিনু দ্রষ্টা।

অবিনাশ! মণিময়ের আহ্বান।

আজ্ঞা করুন।

একটা ভালো কন্‌ভেণ্টএর খোঁজ করিস তো, বেশ ট্রেনিং-টেনিং দেয়—

তুমি থাকবে সেখানে ?

না, বিনুকে পাঠাবো···কি বললি ? ফাজলামো হচ্ছে ?

অবিনাশ সামলে নেয় তাড়াতাড়ি, দেখছ দুধ জ্বাল দিচ্ছি, কি বলছ সে কি আর শুনতে পাচ্ছি ছাই! প্যান্ নামাল, বলো এবার—বিনুকে কন্‌ভেণ্টএ রাখবে ?

ওঘর থেকে মণিময়ের পরীক্ষাসূচক ভ্রূকুটি।

আরো নিস্পৃহ শোনায় অবিনাশের কণ্ঠস্বর, অমন দুই-একটা জায়গা তো আমার জানাই আছে।

কি নাম ?

পিকাডিলি চাইলড্‌স্ হোম।

চাইলড্‌স্ হোম্···এই বম্বেতে ?

না লণ্ডনে।—কই সরমা, দুধটা খাইয়ে দাও না ওকে, এখনো বসে কেন ? ত দোষ মণিময়দার, না ? নিজের এদিকে উঠতে বসতে সময় লাগে তিন দিন।

হাসি চেপে সরমা বাটিতে দুধ ঢেলে বিনুর মুখের কাছে ধরল। চোখ পাকিয়ে মণিময় উঠে এলো। অবশ্যম্ভাবী অগ্ন্যুৎপাদন।

ক'দিন তোকে বারণ করেছি এ বাড়িতে ঢুকবিনে ?

আমাকে বলছ ? সকরুণ জিজ্ঞাসা।

তোমার ইয়ার্কির পাত্র আমি, না ? আমি সাবধান করে দিচ্ছি সরমা,

ও যেন এ বাড়ি না আসে আর। খাতির জমাতে হয় তার জায়গা বাইরে আছে।

তারা যে যার অন্য দিকে চেয়ে থাকে। দুধের বাটি নিঃশেষ করে বিনু স্বস্থির হয়ে বসল।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে মণিময় জামা-কাপড় বদলে প্রস্তুত হল। বেরুবে। চায়ের জল চড়াতে গিয়ে সরমার দৃষ্টি পড়ে সেদিকে।—বাইরে যাচ্ছ মানে?

নিরুত্তরে সে মাথা আঁচড়াতে লাগল। কাছে এসে সরমা ঝাঁজিয়ে উঠল আবার, যাচ্ছ কোথায়?

চুলোয়. সর!

সরবার জন্য আসে নি সরমা। সরোষে বলে উঠল, পনেরো দিন ধরে চাকরটার অসুখ, একটা লোক খোঁজ করতে পার নি? ছেলে দেখবে কে, আমায় পড়াতে যেতে হবে না?

ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে যা।

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। রুদ্ধ আক্রোশে সরমা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। অবিনাশ চা ঢালছে পেয়ালায়।

দেখলে কাণ্ডটা?

দেখলাম।

প্রতিবন্ধক নতুন নয়। গত কালও ঠিক একই কারণে পড়ানো কামাই গেছে। সেটাও বড় কথা নয়, কিন্তু আর একজন সমস্ত দায় ওর কাঁধে ফেলে হাওয়ার ওপর ঘুরে বেড়াবে সেটা অসহ্য।

যা হোক কিছু ব্যবস্থা করো, একটু শিক্ষা হওয়া দরকার। কালও পড়াতে যাই নি, আজও হল না। ওদিকে দু দিন বাদে ক্লাসের পরীক্ষা ছেলেটার।

তা ছাড়া দু দিনের অদর্শনে ছটফটিয়ে মরছে ছেলেটার দাদাও। অকৃত্রিম সহানুভূতি অবিনাশের।

ফাজলামো রাখো। সরমা চটে ওঠে।

রাখলুম। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল সে।—ভাবনা নেই, থাকব'খন ছেলে আগলে। ঠাকুর চাকর থেকে পাহারাদার পর্যন্ত কিছু আর বাকি রইল না।

সরমা হেসে ফেলল, কিছুই না?

তা আর না! ডবল তালা লাগানো ও দরজায় সে আমার খুব জানা আছে।

বিন্নুর ওপর চোখ পড়তে সরমা হাসি চেপে গেল। নিরীহ মুখে বলল, কেন বিনু তো ডাকছেই পিসেমশাই বলে…ওতে হবে না?

একদা হাস্যপরিহাসের ফলে বিনুর মুখে এ ডাকই স্থায়ী হয়ে গেছে। অবিনাশ সরমার পড়ার টেবিলের সামনে বসে বলল, ও একটু বড় হলেই বুঝবে-লোকটা চিনির বলদ মাত্র।

আবহাওয়া বুঝে ক্ষুদ্রকায় বিনোদচন্দ্র দু হাত তুলে বায়না ধরল, পিসী, কোলে—

থাম্। ওই ওখানে যা, আমি চললাম ছেলে ঠ্যাঙাতে।

পথে নেমে অনুতপ্ত হল একটু। এমন ঠাট্টা না করাই ভালো ছিল।

মনে মুখে আজ আগল নেই সরমার। কিন্তু কেন নেই? কারণ, অবিনাশের সংসারী রূপটা কল্পনার বাইরে। প্রধান অন্তরায় তার রোগজীর্ণ ভাঙা স্বাস্থ্য। এ অবিনাশ যেমন জানে, সরমাও জানে তেমনি। এবং জানে বলেই নিশ্চিন্ত।

স্বার্থপরতা?

তাই।

আপন অন্তস্তল তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করল সরমা। নিজের সুস্থ সবল পরিপূর্ণতায় আহ্বান না থাকুক আমন্ত্রণ তো আছে। ডাক না দিক সাড়া দেবে। অবিনাশ সেখানে বাইরের মানুষ মাত্র।

অবিনাশকে বাদ দিলে আর যে কোন পরিবেশে নিজের প্রাচুর্যের উৎসটাতে শুকনো টান ধরে যেতে পারে এ ভেবে দেখেছিল কখনো?

না।

পরস্পরকে নিয়ে এ হাস্যকৌতুকে অনেক আগেই ছেদ পড়ে যেত তাহলে।

বিনু গম্ভীর মুখে একখণ্ড কাগজ শতধা করছে। অবিনাশ চেয়ারে বসে। টেবিলে মণিময়ের নাটকের পাণ্ডুলিপিটা পড়ে আছে। পাশে সরমার পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে কপিকরা কতগুলি পৃষ্ঠা গ্রন্থিবদ্ধ।

পাতা ওলটাতে লাগল।

মণিময় ফিরে এলো একটু বাদেই। অবিনাশকে নাটকপাঠে নিবিষ্ট দেখে বিরক্তি দমন করল।

তুই আছিস এখনো দেখছি।

অবিনাশ নিরুত্তর। তন্ময়তার অভিব্যক্তি।

নিজের লেখা পড়তে দেখলে সাত-খুনও মাপ করে থাকে লেখককুল। আক্ষেপ করল, সরমাকে দিয়ে আর কপি করানো হয়ে উঠল না। রোজ একপাতা আধপাতার বেশি এগুবে না···অথচ তাড়াতাড়ি দরকার আমার।

আমিও ধরব'খন। এখন ডিসটার্ব কোরো না, খুব ইণ্টারেস্টিং লাগছে।

মণিময় বিগলিত।—আচ্ছা, আচ্ছা। সরমা সত্যিই আটকে গেল ভেবে ফিরে এলাম। বিন্নুকে ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসল সে।

সহসা মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপল অবিনাশের। সরমার লেখা পাতাগুলির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল কি। মুখে কৌতুকের আভাস। উঠে গম্ভীর মুখে মণিময়ের ঘর থেকে কতগুলি সাদা কাগজ এবং তারই কলম নিয়ে এলো। মণিময় হর্ষোৎফুল্ল আবারও।

অবিনাশের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত সরমার কপি করা হস্তাক্ষরগুলিতে। সেগুলি দেখে দেখে কি লেখে আর ছিঁড়ে দুমড়ে ফেলে দেয় টেবিলের নিচে। কলেজে পড়তে যে বিদ্যায় বহু ছেলেকে জব্দ করেছে, বিব্রত করেছে—অনেকদিন বাদে আজ সেইটুকুরই চপল-সাধনায় নিবিষ্টচিত্ত। ঘণ্টা দুই চলল এমনি লেখা নকলের মুসাবিদা। সমস্ত কাটাছেঁড়ার পর গোটা গোটা মেয়েলী অক্ষরে যে লেখাটুকু সুসমাপ্ত, নিজেই নিঃশব্দে হাসছে সেটা পড়ে।

অবিনাশ, তুমি জানো কত ভালোবাসি তোমাকে, অথচ মুখফুটে আজো তুমি বললে 'না কিছু। এই নরককুণ্ডে পড়ে আছি, এখান থেকে তাড়াতাড়ি আমাকে উদ্ধার করবে তো করো, নইলে চিরদিন দুঃখ করতে হবে। এই শেষবার শেষ কথা বলে দিলাম তোমাকে।—সরমায়।

ভাঁজ করে পকেটে রাখল। পরে চৌকিতে শুয়ে পড়ল সটান। মণিময় উঠে এলো শশব্যস্তে।—কতদূর এগুলি ?

একটুও না। গম্ভীর।

যাঃ!

অমায়িক হাস্যে টেবিল খুঁজল। এক পাতাও কপি করা হয় নি বটে।—হাসি নিবল। কি করলি এতক্ষণ ?

ভাবলুম।

লেখা সম্বন্ধে ?

না, তোমার মত মানুষকে কি করে শায়েস্তা করা যায়, সেই সম্বন্ধে।

মুহূর্তের আত্ম-বিভ্রম। পরে দুই চোখের নিঃশব্দ অগ্নিবিকিরণ। বেরোও বাড়ি থেকে—

সরমা আসুক, তাকে নিয়ে বেরুবো।

তুমি যাবে কি না এক্ষুনি আমি শুনতে চাই ?

তোমার কথায় নয়। পড়ো এটা। সক্রোধে পকেটের চিঠিটা তার গায়ে ছুঁড়ে মারল অবিনাশ।—কপি করতেই বসেছিলাম; কিন্তু কপির ভাঁজে এটা পেয়েও তোমার জন্যে কিছু করব ভাবো ? গায়ে জোর থাকলে আজ—

কি করত সেটুকু অসমাপ্তই থাকল। মণিময়ের মুখে বর্ণান্তর সুপরিস্ফুট। আবার পড়ল চিঠি। সন্দেহের হেতু নেই। তবু টেবিলের কাছে এসে সরমার লেখা কপির পাতা ওলটালো দুই একটা। এ ঘরে এসে গুম হয়ে বসল চৌকির ওপর।

ক্রুদ্ধ প্রতীক্ষা।

সরমা বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে রোষ-কশায়িত নেত্র-সম্পাতন। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সরমা নিজের ঘরে এলো। অবিনাশকে দেখে বলল, আবার হয়ে গেছে বুঝি এক হাত, মারমুখো মূর্তি কেন দাদার ?

অবিনাশ নিরুত্তর। জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখছে।

মণিময় ফেটে পড়ল চৌচির হয়ে, বলি পড় তো সায়েন্স, এসব নাটক কিসের ?

সরমা ঘুরে দাঁড়াল।

এটা নরককুণ্ড, এখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে হবে, কেমন ?

কি বকছ যা তা ?

যা, তা ? বলিহারি তোমার নজর ! ওই রোগা-পট্‌কা হাড়গিলে চেহারা—

দু ঘণ্টা টিউশনএর পর মেজাজ এমনিতেই চড়া। বলল, রাগিও না বলছি এখন, কি হয়েছে ?

কি হয়েছে ! এটা কি ?

চিঠি এলো সরমার হাতে। পড়ে বিস্ফারিত। নিজে লেখে নি জানে। কিন্তু…

মণিময় হুঙ্কার ছাড়ল আবার, আমি জানতে চাই এসবের মানে কি ? যেখানে খুশি যাও, নরককুণ্ডে পড়ে থাকতে কে তোমাকে মাথার দিব্বি দিয়েছে ?

সরমা হতভম্বের মত তাকাল অবিনাশের দিকে। কি ব্যাপার?

ঠাট্টা বিদ্রূপের মত শোনায় অবিনাশের কণ্ঠস্বর। কেন, তুমি লেখো নি?

চিঠির দিকে চেয়ে সরমার বিভ্রম বাড়ে আরো।

এটা···আমি···মরনে···! দেখো, চালাকি কোরো না, আমি কখন লিখলুম?

চৌকি থেকে নেমে দাঁড়াল অবিনাশ। জানাজানি হয়েছে বলে যখন এত ভয় তোমার, থাকো এই নরককুণ্ডেই, আমি চললাম। ছদ্ম-গাম্ভীর্যে দ্রুত প্রস্থান।

সরমা আবারও পড়ল লেখাটুকু। ঘুরে দাঁড়াতে চোখ পড়ল টেবিলের নিচে রাশিকৃত কাগজ-কুণ্ডলীর ওপর। টেনে এনে খুলে খুলে দেখল, একটার পর একটা কি রকম মক্স করা হয়েছে তার লেখা। মণিময়ের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

মণিময় বিমূঢ়। এমন করে নকল করেছে তোর লেখা?

তাই তো দেখছি, আমি সুদ্ধু ভড়কে গিয়েছিলাম।

হুঃ। ভালো চাস তো ওকে আর ঢুকতে দিবিনে বাড়িতে। এই লেখা জাল করেই ও দাগী হবে একদিন বলে রাখলুম।

সরমা আর কথা না বাড়িয়ে ট্রাঙ্ক খুলে চিঠিটা রেখে দিল ডালার খুপরিতে। বলল, দাগী যদি হয়ই কখনো, নমুনাটা থাক···।

॥ ৩ ॥

সঙ্কট সবচেয়ে বেশি চারুদেবীর। সংসারক্ষেত্রে গোয়েন্দাগিরি সুখকর নয় তেমন। একদিকে ছেলের জন্য দুর্ভাবনা অন্যদিকে বিপিন। সন্ধ্যা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত সকলের অগোচরে পাহারা দিয়েই কাটে। ফলাফল প্রতিকূল। সমাধানও দুরূহ।

সরমার পর পর দুদিন কামাই হয়ে গেল আবার। বিনুর তত্ত্বাবধানের ভার সেদিনও অবিনাশের কাঁধে চাপিয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে বেরিয়ে পড়েছিল মণ্টুকে পড়াতে।

বিধি অপ্রসন্ন সেদিন।

বইখাতা খুলে মণ্টু পড়তে বসে গেছে আগেই। শিক্ষয়িত্রীর সান্নিধ্যে অন্যমনস্কতার জেরটুকু এমনি বাড়তি খেটে পুরিয়ে রাখতে হয়। পরীক্ষা দেওয়া এবং পাশ করা দুই-ই অনিবার্য প্রয়োজন এবার।

চারুদেবী ঘরে প্রবেশ করলেন। পাঠে বেশি মনোযোগ দেখলে মেজাজ আরো দ্রুত বিগড়ে যাচ্ছে আজকাল।

তোর মাস্টারনী দুদিন আসে নি কেন রে?

জানিনে।

আজও আসবে না?

কি করে বলব।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বুক্‌সেল্‌ফ-এ সাজানো বইগুলি নিরীক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ। —এই মোটা মোটা সব বই পড়াতে পারে মেয়েটা?

বহুদিন একই প্রশ্নের তাৎপর্য অজ্ঞাত নয় মণ্টুর। মায়ের মেজাজ চড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করল আর একটু।—এসব তো জল-ভাত তাঁর কাছে।

জল-ভাত তো তুই দু-দুবার ফেল করলি কেন রে হতভাগা? একটা মেয়ে তোকে পড়াচ্ছে—লজ্জা করে না? বিপিনকে বল্ কোন পুরুষ মাস্টার রেখে দেবে।

যে জন্যেই হোক মায়ের সুনজর নেই তার শিক্ষয়িত্রীর ওপর মণ্টু বোঝে। বলল, তুমি যাও তো এখান থেকে, উনি এসে পড়বেন এক্ষুনি।

এসে মাথা নেবে আমার! যা পছন্দ করিনে কোন কালে—

লঘু পদধ্বনি শোনা গেল বাইরে। চারুদেবী পাশের ঘরে আশ্রয় নিলেন।

কাল বিলম্ব না করে কর্তব্য শুরু করে দিল সরমা।—ফিজিক্স কি কি পরীক্ষা হবে?

হিট, লাইট, ভ্যলটাইক্ ইলেকট্রিসিটি।

কেমিস্ট্রি?

মেটালস্।

আচ্ছা, তুমি লাইট্ থেকে রিফ্র্যাক্টিভ্ ইন্‌ডেক্সের অঙ্কগুলো কষো, আমি মেটাল্‌স-এর প্রপার্টিগুলির একটা কম্প্যারেটিভ্ চার্ট তৈরি করে দিচ্ছি।

দুজনেই তারা খাতার দিকে মনোনিবেশ করল। মণ্টুর মা আড়ালে দাঁড়িয়ে।

একটু বাদেই পাঠ বিস্মৃত হল মণ্টু। ভালো লাগে পার্শ্ববর্তিনীর এ নিবিষ্টতা।

দুর্যোগ আসন্ন সরমা জানত না। একই ব্যাপার চার মাস ধরে লক্ষ্য করে আসছে, আজই বা এমন ধৈর্য-বিচ্যুতি ঘটল কেন? সহসা বিরক্তিতে কান গরম হয়ে গেল—খাতা ফেলে মণ্টু তার মুখের দিকে চেয়েই আছে।

হচ্ছে না?

মণ্টু সচকিত।—হচ্ছে।

কিছুক্ষণ…। আবারও পেন্সিল থেমে যায় মণ্টুর হাতে। পুনরায় দৃষ্টি বিনিময়। কিন্তু মণ্টুর খেয়াল নেই এবার। সরমা লিখতে লিখতে আড়চোখে বারকতক লক্ষ্য করল তাকে। হঠাৎ তার কানে হাত দিয়ে মাথাটা ফিরিয়ে দিল খাতার দিকে।—চোখ দুটো ওদিকে দাও, পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে তাহলে।

মণ্টু চেয়ে থাকে হতভম্বের মত।

অঙ্ক পারচ না?

মণ্টু নির্বাক।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে একটা হাত গালের ওপর উঠে আসে চারুদেবীর। দৃশ্য কল্পনাতীত। অতঃপর নীরব থাকা সম্ভব নয় কোনমতে। সাত পাঁচ না ভেবেই স্বব্যবস্থায় এগিয়ে এলেন। ছেলেকে আদেশ দিলেন রুক্ষকণ্ঠে, ভেতরে যা—!

হুকুমের ভয়ে না হোক ক্ষণকালের জন্যও এ মর্মান্তিক লজ্জা থেকে ছাড়া পেয়ে বাঁচে মণ্ট। দ্রুত প্রস্থান করল।

চারুদেবী ঘুরে দাঁড়ালেন।—অতবড় ছেলে, কলেজে পড়ে, তার কানে হাত দাও তুমি কি বলে ?

এমন নাটকীয় যোগাযোগের জন্য কে আর প্রস্তুত ছিল। সরমার বাক্‌স্ফুরণ হল না সহসা।

বাপ-দাদার আমল থেকে এতটুকু আঁচড় লাগেনি ওর গায়ে, আর তুমি বাইরের মেয়ে, তোমার হাত উঠল ?

আর কেউ হলে হয়তো বলত, আঁচড়টা লাগা উচিত ছিল অনেক আগেই, বাইরের মেয়ের হাত ওঠার কোন প্রয়োজন হত না তাহলে। সরমা বলতে পারল না কিছু। রাগে, লজ্জায় আরক্ত দেখাল শুধু।

আর পড়াতে হবে না ওকে, মাইনে যা পাওনা হয়েছে মাসকাবারে পাঠিয়ে দেব।

সরমা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।—মণ্টুকে ডাকুন একবার।

কেন, আমি বলছি তাতে হবে না ?

হবে। আপনি একবার ডেকে দিন।

চারুদেবী তার দিকে চেয়ে কেমন যেন ঘাঁটাতে সাহস করলেন না আর।

একদিকের ঘরে মণ্টু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। অবনত, আড়ষ্ট, পাংশু।

তোকে ডাকছে, শুনে আয়।

তুমি এ কথা বলতে গেলে কেন ?

নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না চারুদেবী।—আমি বলতে গেলাম কেন ! আসুক বিপিন, দেখছি তার পর, ভালো চাস তো শুনে আয় আগে কি বলতে চায়।

মণ্টুর পুনঃপ্রবেশ। সরমা একখানা হাত রাখল তার কাঁধে।—কিছু মনে কারো না, আমার অন্যায় হয়েচে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো ভাই, বাঁচার তাগিদে এমনিতেই যেতে বসেচে মেয়েরা, তোমরা ভরসা না দিতে পারো গ্লানি বাড়িও না।

মণ্টু নীরব।

মেটাল্‌স্‌এর চার্ট নিয়ে গেলাম, শেষ হলে ডাকে পাঠিয়ে দেব, পরীক্ষায় কাজে লাগবে ওটা।

অন্যমনস্কের মত হাঁটতে লাগল সরমা। বিপিন চৌধুরীর মোটর ঠিক পাশে

এসে থামতে দাঁড়াতে হল। সহাস্তে বিপিন নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।—এরই মধ্যে ফিরে চললেন আজ?

সরমার দুচোখ দূরের দিকে।

আজ যান নি পড়াতে?

সরমা হাসল একটু। চোখে চোখ রাখল।—মণ্টুর পড়াশুনার জন্য আপনার দুশ্চিন্তার শেষ নেই বিপিনবাবু, না?

তা নয়…দুদিন আসেন নি, আজও চলে যাচ্ছেন এরই মধ্যে, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। মণ্টুর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছি, এবারে চেষ্টা করলেও ফেল করতে পারবে না।…আপনার পড়ানো হয়ে গেছে তা হলে?

হ্যাঁ—

তাড়াতাড়ি এসেছিলেন বুঝি আজ?

না।

তবে?—থাকগে, রাস্তায় আটকে রাখব না, বাড়ি যাচ্ছেন তো? চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে।

আবারও খানিক নীরব থেকে সরমা জবাব দিল, আপত্তি ছিল না, কিন্তু আপনার ছোট ভাইয়ের সামান্য শিক্ষয়িত্রী আমি, মোটর করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার এ আতিশয্যটুকু কেন বিপিনবাবু?

কথাবার্তা সহজ লাগছে না বিপিনের। তবু অন্তরঙ্গ আহ্বান জানালো, আপনি আসুন তো—

সরমা শান্ত মুখে তাকালো তার দিকে। বলতে পারে কিছু এখন। দুকথা শোনাতে পারে। কিন্তু কি লাভ। সামলে নিল, দোষই বা কি ভদ্রলোকের…।

ধন্যবাদ, আমি নিজেই যেতে পারব, নমস্কার।

বিস্ময়াহত মুখে বিপিন দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ দেখা যায় তাকে। বাড়ি ফিরে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করল মণ্টুর পড়ার ঘরে।—আজো তোর টিচার আসে নি মণ্টু?

কৈফিয়তের হাত থেকে অব্যাহতি নেই জানে। মণ্টু জবাব দিল, এসেছিলেন।

পড়া হয়ে গেল এরই মধ্যে? মাথা ধরেছে বললি বুঝি?

মণ্টু নিরুত্তর।

বিপিন তেতে উঠল, পড়ার সময় খালি ফাঁকি, এবারেও পাস করতে হবে না তোমাকে বলে দিলাম.।

মণ্টু ঠাস করে বলে বসল, মা তাঁকে আর আসতে বারণ করে দিয়েছে।

বিপিনের বাক্‌শক্তি যেন লোপ পেয়ে গেল হঠাৎ। বিমূঢ়ের মতো চেয়ে রইল খানিক। সরমার শান্ত মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে।

কেন?

জবাব নেই।

ওপরে এসে হাঁক দিল, কাকীমা!

চারুদেবী ঝিকে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এলেন, ওরে গঙ্গা দাদাবাবুর খাবার ঠিক করতে বল্—

ও মেয়েটিকে আর পড়াতে আসতে বারণ করেছ?

হ্যাঁ বাবা, ও ছেলেকে পাস করানো মেয়েমানুষের কম্ম নয়। একজন পুরুষ মাস্টার রেখে দিস তুই।

মণ্টু বলেছে এ কথা?

মণ্টু বলবে কেন, আমার চোখ নেই? মেয়েলি বুদ্ধিতে সচেষ্ট হলেন তাকে শান্ত করতে।—এতবড় শেয়ার বাজারটা চালাচ্ছিস তুই, তোকে বিজ্ঞান পড়ানো গেল না কত চেষ্টা করেও। আর একটা মেয়ে এত সব শক্ত শক্ত বই পড়িয়ে দেবে!

ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে বিপিনের। কিন্তু ব্যাপারটা আগে জানা দরকার। কাকীমার মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করল একটু।…হুঁ। কি হয়েছে খুলে বলো, নয় তো এক্ষুনি তাকে আবার ডেকে নিয়ে আসব আমি।

তা আর আনবে না! স্বরূপ প্রকাশ করলেন চারুদেবী, আগে তোমার রাত দুপুর হত বাড়ি ফিরতে, এখন সাত তাড়াতাড়ি কাজ ফেলে পালিয়ে আসা চাই বিকেল না হতে। আর ভাই ওদিকে পড়া ফেলে হাঁ করে সারাক্ষণ রূপ গিলবে মাস্টারনীর, এখানে এসব চলবে না আমার বাপু পষ্ট কথা। কইরে গঙ্গা, খাবারটা দিয়ে গেলি দাদাবাবুর—

জল-খাবার নিয়ে গঙ্গাবাঈর আবির্ভাব। ভয়ে ভয়ে টেবিলটা এগিয়ে দিল বিপিনের দিকে। চারুদেবী জল গড়িয়ে ধরলেন সামনে।—মুখ হাত ধুয়ে খেয়ে জিরিয়ে নে আগে।

খাবারসুদ্ধ থালা বাসন ঝন্ ঝন্ শব্দ আছড়ে পড়ল মাটির ওপর। কাচের গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে।

হুড়দাড় পায়ে নিচে নেমে বিপিন মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল আবার।

অনিশ্চয়তার অস্বস্তি আছেই। আবার পারম্পর্যহীন একটানা দিন যাপনের চিন্তা মনোরম নয়। এম্. এস্‌সি পরীক্ষা পর্যন্ত নিরুদ্বিগ্ন ছকটা একরকম ধরা বাঁধাই ছিল। হঠাৎ ওলটপালট হয়ে গেল সব।

বাড়ি ফিরে দেখল অগ্রজ নাটক লিখছে, পাশে বিনু ঘুমিয়ে।

অবিনাশ চলে গেছে। মুখ না তুলেই মণিময় সংবাদটা জানাল। অর্থাৎ, বিনুর জন্যে খুব বেশী সময় আটকে থাকতে হয় নি তাঁকে।

সরমা নিজের ঘরে এসে বসল। চেষ্টা করল ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে। বড় জোর কপালে নেই পরীক্ষা দেওয়া, চাকরি দেখে নিতে হবে আগেই। হোক। মণিময় গত চারমাস সংসার নির্বাহের দায় থেকে প্রায় অব্যাহতি পেয়েছে। এখন কতটা নির্ভর করা চলে তার ওপর জানা দরকার। উঠে এলো।—লেখা থামাও দাদা, কথা আছে।

মণিময় মুখ তুলল।

আমার এম. এস্‌সি পরীক্ষা পর্যন্ত খরচাপত্র সব একা চালাতে পারবে?

এই! অম্লান বদনে ঘাড় নাড়ল সে, খুব পারব, শিগগীরই দেশের মেয়ে নাটকটা সিনেমা হবে, মন্দ টাকা পাব না।

বাজে কথা রাখো, কাল থেকেই খরচাপত্রের ভার নিতে হবে সব, পারবে?

মণিময় ভয় পেল এবার, তোর ওই—ইয়ে—কি হল?

গেছে।

ক'দিন কামাই হল তাই?

হাসি পেল সরমার। না, যা বললাম জবাব দাও। না যদি পারো পরীক্ষা দেওয়া হবে না আমার।

নাটক মাথায় থাকল। উঠে বসল মণিময়।—পরীক্ষা দেওয়া হবে না মানে? এতকাল কোন্ রোজগারটা ছিল তোর শুনি? তখন চালাই নি?

এখন পারবে কি না বলো।

খুব পারব। গম্ভীর।—বাজে খরচ করি তাই, নইলে রোজগার আমার কম নাকি!

ভরসা দিল বটে, কিন্তু সরমা ভরসা পেল না তেমন।

দাদরেই ছোট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে অবিনাশ থাকে। আসবাবপত্রের মধ্যে পুরানো একটা আরাম-কেদারা এবং হাতল-বিহীন ভাঙা একটা চেয়ার। পাশে নড়বড়ে চৌকিটাতে অনন্তশয্যা পাতাই আছে। সরমা মাঝে মাঝে বালিশের ওয়াড় এবং চাদর বদলে দিলে তবে এর সংস্কার ঘটে। অদূরের সেল্‌ফএ গোটাকতক কাব্যগ্রন্থ। চৌকির নিচে ভাঙা তোরঙ্গ এবং কমার্সিয়াল আর্টের সরঞ্জাম।

সরমা ইজিচেয়ারে বসে আছে। অবিনাশ চৌকিতে। টিউশনপর্ব সবিস্তারে শুনল এই মাত্র। নির্বিকার চিত্তে একটা কাগজের ওপর পেন্‌সিলে আঁচড় কাটছে সে। সরমা চেয়ে আছে ওর দিকে।

অবিনাশ বলল, কাজকর্ম মন্দ জুটছিল না, ভেবেছিলাম টাকাকড়ি কিছু জমাব, তোমার পাল্লায় পড়ে সে আর হবার জো-টি আছে! এখন আর ছাত্র খুঁজে কাজ নেই, পরীক্ষাটা হয়ে যাক।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে সরমা বলে উঠল, চুলোয় যাক পরীক্ষা, তার এখনো দেরি ছ-সাত মাস। তোমায় যা বললাম তাই করো—পরীক্ষার ফী যোগাতেও কত টাকা লাগবে জানো?

যা লাগে দেবে এই গৌরী সেন, তোমার ভাবনা কি? ক'টা মাস শ'খানেক করে দিতে খুব অসুবিধে হবে না আমার।

তা হয় না। বিরক্তি বাড়ছে সরমার।

অবিনাশ ভ্রূ কুঁচকে তাকাল তার দিকে, কেন হয় না শুনি? আমার অসুখের সময় হাসপাতালে কেবিনের খরচ পর্যন্ত চালাও যখন, তখন হয় কি করে?

সরমা অবাক।—কে বললে তোমাকে?

তোমার ড্রয়ারের পাস-বই। স্কলারসিপের জমানো পাঁচশ টাকা পুঁজি শূন্যয় এসে ঠেকেছে—বলেছিলাম তখন, এ হয় না সরমা?

বেশ…! সরমা হেসে ফেলল।

খানিক অন্যমনস্কের মতো থেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, একটা কথার সত্যি জবাব দেবে?

মিথ্যে বলে পার পাই তো দেব না, শুনি কথাটা—।

সরমার অনুসন্ধিৎসু দুই চোখ তার মুখের ওপর সন্নিবদ্ধ। আজ এ আবহাওয়ায় যে প্রশ্নটা চকিতে উদয় হল মনে, তা নিয়ে চিন্তার কারণ আগে ঘটে নি কখনো। কিন্তু আজ হোক কাল হোক বোঝাপড়া তো একটা হওয়াই চাই তাদের।

আজ সত্যি করে বলতে হবে কি চাও তুমি।

হাতের পেন্সিল থেমে গেল এবার। মুখ তুলল অবিনাশ।—কি চাই মানে?

মানে ঠিকই বুঝেছ।

অবিনাশ হেসে উঠল।—বেশ, না হয় বুঝেইছি। কিন্তু চাইলেই তো আর সব ঐশ্বর্য উজাড় করে দেবে না। বলে হবেটা কি?

সরমা শুকনো কণ্ঠে জবাব দেয়, ঐশ্বর্যের আছে কি। হাসি বাদ দিয়ে যা বলবার সত্যি করেই বলো।

ও…। ছদ্ম গাম্ভীর্য-মণ্ডিত। তা রক্ত-মাংসের মানুষ যা চায় সবই তো আশা করি আমি।…মুখ শুকিয়ে গেল যে?

একটু ভাবল সরমা। তারপর অনেকটা প্রস্তুত হয়েই যেন বলল, দেখো, আমার ভবিষ্যৎ আমারই, আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে মিলবে বলে মনে হয় না। ও নিয়ে ভাবিনে, বলো তুমি।

অবিনাশ হাসছে মৃদু মৃদু।—জলজ্যান্ত মিছে কথাটা বললে?

অস্বস্তির মতো লাগছে সরমার। মিছে কেন?

উৎফুল্ল মুখে তাকালো অবিনাশ, নয়? ভালো। বরাত এমন প্রসন্ন জানতুম না। উচ্ছল আনন্দে কাব্য করে উঠল, 'উড়ে যাক, দূরে যাক, জীবনের জীর্ণ বিবর্ণ বিশীর্ণ পাতা'। হঠাৎ থামল সে, আমার ছেলেবেলার কথা কিছু জানো না সরমা, না?

সরমা চেয়ে আছে অনুসন্ধিৎসু চোখে।

সোৎসাহে শুরু করল অবিনাশ, যেন মজার গল্প বলছে একটা। পাঁচ ভাই ছিলুম আমরা, আমি বড়। পরের দুটো মরেছে অ্যানিমিয়ায়। পেটের রোগ আর খাওয়ার রোগে যমে টেনেছে তার পরেরটাকে। আর সকলের ছোট যে, সেও বেশিদিন জ্বালায় নি। জন্মাবধি রিকেটে ভুগছিল, একদিন চোখ উলটে দিলে।…পয়সা থাকতেও কি জানি কেন ডাক্তার ডাকতে সাহস করতেন না বাবা। রোগী দেখতে এসে ডাক্তার গালাগাল করতেন তাঁকেই। আমার সাত-আট বছর বয়সের কথাও মনে আছে, রীতিমত ভালো স্বাস্থ্য ছিল মায়ের।…আর, আমার পনের বছর বয়সের সময় মা যখন মারা গেলেন, হাড় ক'টা গুনে নেওয়া যেত শরীর থেকে।

সরমার বিবর্ণ মূর্তির দিকে চেয়ে আনন্দের খোরাক পেল যেন আরো।

বলে গেল, আমার ওপরও যমের নজর আসন্ন জেনে হেসে খেলে সময় দিলুম কাটিয়ে। বুদ্ধি ছিল না এমন নয়, প্ল্যান-টাসগুলো করতে পারতুম হয়ত, মিয়াদের কথাটা ভেবেই সেদিকে মাথা গেল না আর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন সৌভাগ্য কপালে লেখা আমারই! উচ্ছল চপলতায় খল্ খল্ করে হেসে উঠল সে, ঐশ্বর্য তোমার দেহে, ঐশ্বর্য তোমার মনে—কুছ্ পরোয়া নাই—কামনা-কালীয়-দহে আকণ্ঠ ডুব দেব আমি—'বুকের ভিতরে ছুরির মতো, মনের মাঝারে বিষের মতো, রোগের মতো, শোকের মতো, রব আমি অনিবার—!'

শুষ্ক, পাংশু সরমার সমস্ত মুখ। চুপচাপ কিছুক্ষণ।…ভয় দেখাচ্চো?

ভয় যে পেয়েছ সে তো আর মিথ্যে নয়।

সরমা নীরব।

হাতের কাগজ পেন্‌সিল একদিকে সরিয়ে রাখল অবিনাশ। পেন্‌সিলের আঁচড়ে সাদা কাগজটায় সরমার মুখের আদল ফুটে উঠেছে। অনেকক্ষণ অন্যমনস্কের মতো চোখ বুজে বসে রইল সে। চপলতার চিহ্ন মুছে গেছে। মুখে হাসির মতো।

অবিচ্ছিন্ন নীরবতা। সরমার মুখ কোলের কাছে নুয়ে এসেছে প্রায়। অবিনাশ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল আবার।—একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে ফেললাম দেখছি।

সরমা তেমনি বসে।

আশ্চর্য, সায়েন্স-পড়া মেয়ে কেঁদে ফেলবে না কি এর পরে! মুখ তোলো—

সরমা তাকালো এবার।

তারপর? অবিনাশের চোখদুটো হাসছে।

বলো।

মাটি করেছে। সত্যিই কিন্তু বিয়ে করে ফেলতে চাইব এবার। জেনে শুনে যেমন ঘাঁটাতে গেলে!

আমার অন্যায় হয়েছে অবিনাশ।

লক্ষ্মী মেয়ে। মন দিয়ে পড়াশুনা শুরু করে যাও, আর কিছু ভাবতে হবে না।

দেখা যাক—

দেখা যাবে কি, যা বললাম তাই হবে।

আচ্ছা। সরমা হাসল অল্প একটু, আপাতত দাদাই চালিয়ে নিতে পারবে

বলছে। অন্য প্রসঙ্গ উঠতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল একটা সন্তর্পণে।—কিন্তু সবাই তোমরা সরাসরি টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চাও কেন বল তো, সামর্থ্য আমার কম নাকি কিছু?

তোমরা মানে!. একজন তো আমি, আর সব ...?

সরমা বলল, ডাঃ চন্দ্রও ঘুরিয়ে সাহায্যের প্রস্তাবটা তুলেছিলেন এক দিন।

সর্বনাশ! ত্রস্ত-বিস্ময় অবিনাশের, তিনি তো বিবাহিত, আর স্ত্রৈণ বলে সুনামও শুনেছি কলেজে পড়তে!

সরমা হেসে ফেলল।

বাড়ির পথ। সরমা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে বার বার।...অবিনাশ ব্যঙ্গ করেছে। করুক। এতটুকু লাগে নি। কিন্তু অবিনাশ প্রকাশও করেছে নিজেকে। ব্যর্থতার ভয়াবহ মূর্তি। মনের সব কটা তার একসঙ্গে নাড়িয়ে দিল যেন।

বিবাহ সংসার সংসার পালন—এ একটা সহজ নিয়ম। বৈচিত্র্য না থাকুক সুখে দুঃখে এর সহজ পরিণাম!

কর্ম সাধনা জ্ঞান বৈরাগ্য—নিয়মটা বিঘ্নসঙ্কুল। তবু দৃষ্টান্ত আছে অনেক জীবনে। আত্ম-সান্ত্বনায় শান্ত পরিণাম এরও।

কিন্তু তৃষ্ণার্তের সম্মুখে পূর্ণ পানীয়-পাত্র। পান নিষিদ্ধ। তার পরিণাম?

'যৌবনের পরদায় দখিন্-বাতাসের ছোঁয়ার মতো ক্ষণে-ক্ষণে অনুভব করল বাঞ্ছিতের সান্নিধ্য। আমৃত্যু উপবাস বিধিলিপি। তার পরিণাম?

কর্মী নয়, মুমুক্ষু নয়। যেতে হবে কর্ম-পথে, ত্যাগের পথে! তার—?

সাধ আছে, সাধ্য নেই, তার—?

সময় নির্বাচনে ভুল হল বিপিন চৌধুরীর। দু'চারদিন পরে এলে একেবারে খুশি হত না সরমা, একথা জোর করে বলা চলে না। কিন্তু ধৈর্য বলে কিছু কুষ্ঠিতে নেই বিপিনের। গলির বাইরে অপেক্ষা করছিল। দেখা হল।

নমস্কার।...আপনি বিশ্বাস করুন সরমাদেবী, আমার কোন অপরাধ নেই।

তার বলার আগ্রহে কৃত্রিমতা নেই। সরমা মুখের দিকে চেয়ে থাকে স্বল্পক্ষণ।—না।

কি বলছেন?

আপনার কোন অপরাধ নেই।

বিব্রত মুখে বিপিন অপেক্ষা করে একটু। তা হলে—

সরমা শান্ত মুখে জবাব দেয়, তা হলেও মণ্টুকে পড়ানোর অজুহাত নিয়ে আর তো আপনাদের বাড়ি যেতে পারিনে।

অজুহাত বলছেন কেন? আহত প্রত্যাশায় তাকালো বিপিন চৌধুরী।

বিরক্তি বাড়ছে সরমার। একটু থেমে জবাব দিল, তা যদি না হয়, মণ্টুকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন, পড়া বুঝে নিয়ে যাবে।

বিপিন দ্বিধান্বিত। কিন্তু আমারও কিছু কথা ছিল…

সরমা আবারও সোজাসুজি তাকালো তার দিকে। অর্থাৎ, কথা যে আছে সেটা সে জানে। কিন্তু যে মেয়ে পড়াতে যেত মণ্টুকে, তার সঙ্গে আজ অন্তত ওর অনেক তফাত। বলল, আপনার বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, টাকা আছে—কথাও কিছু থাকবে আশ্চর্য কি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কথার বদলে আমিও কিছু বলতে পারি, সেটা শুনতে ভালো লাগবে না আপনার। বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আর আপনাকে কষ্ট দেব না, নমস্কার।

বিপিনের চেষ্টার ত্রুটি নেই তবু। সানুনয়ে বলল, একটু দাঁড়ান…

অন্য সময় আসবেন তাহলে, আমার এগারোটায় ক্লাস।

বিপিন দাঁড়িয়ে। ব্যর্থ, বিমূঢ়! সরমা বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

শেয়ার-মার্কেট বিল্‌ডিংস্‌।

তিন-তলায় ঘরের বাইরে সাইন-বোর্ড ঝুলছে, চৌধুরী অ্যাণ্ড্‌ কোম্পানী, স্টক্‌ অ্যাণ্ড্‌ শেয়ার ডিলার্স।

সেক্রেটেরিয়েট্‌ টেবিলের সামনে বড় গদি-আঁটা চেয়ারে বিপিন চৌধুরী বসে। পাশে ঘনশ্যামবাবু। এক-চতুর্থাংশের মালিক। কাগজপত্র ঘাঁটছেন আর ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা তুলছেন মাঝে মাঝে।

আয়রনের ট্র্যানজাকশান্‌টা ক্লোজ করে ফেলি, কি বলেন? বাজার কিন্তু সুবিধের নয়।

আদিম মানুষের সমস্ত মনোবৃত্তি জাগ্রত বিপিন চৌধুরীর মধ্যে। ভালো-বাসা নয়, মোহ নয়। বস্তুশক্তি দিয়ে শুধু জয় করে নেবার ইচ্ছা।

গানির দর সাত-আটে নেমেছে দেখেছেন? ঘনশ্যামবাবু ব্যবসা ভাবছেন।

কিন্তু সরমা হয়ত বা রাজী হবে না, তখন? অসহিষ্ণু রোমন্থন। হবে নাই বা কেন! শক্তি দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে নিজে হাতে গড়েছে এ বর্তমান। এর দাম দিতে হলে…

গোডাউনটা একবার ইনস্পেক্ট্ করে আসা উচিত কিন্তু। ঘনশ্যামবাবু নাছোড়বান্দা।

জবাবে বিপিন বিরক্ত মুখে একবার মুখ তুলে তাকালো শুধু। ভাবছে।... আর বলবে, দারিদ্র্যটা আভরণ নয়, অভিশাপ। আদর্শের অভিমান নিয়ে দিন চলে না, ধনীর দ্বারস্থ হতে হয় টিউশনএর জন্যে। কথারই যদি দাম, কথাই সে বলবে এবারে।

এ ক'টা সই করে দিন তো। ঘনশ্যামবাবু কাগজ বাড়ালেন।

ভাবছে বিপিন, প্রথম প্রথম অন্য রকম মনে হয়েছিল, সামান্য হাসি ছাড়া কথা নেই মুখে। ভালো লাগত। কিন্তু আজও যে ভালোই লাগলো।...

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, কোন দিকে না তাকিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

প্রৌঢ় ঘনশ্যামবাবু নির্বোধের মতো খানিক বসে থেকে অস্ফুট মন্তব্য করলেন, ছোকরার মাথা বিগড়েছে।

ভাসুরপোর জেদ বিলক্ষণ জানতেন চারুদেবী। ভয়ও করতেন। কিন্তু সেটা এমন আকারে দেখা দেবে ভাবেন নি। দু-চারখানা থালা-বাসন ভাঙবে, চিৎকার চেঁচামেচিতে বাড়ি সরগরম থাকবে দিন দুই—এ জন্যে প্রস্তুতই ছিলেন। এই থমথমে নীরবতায় ভয় পেলেন। ঝোঁকের মাথায় ওই গোঁয়ার ছেলে না করে বসতে পারে এমন কাজ নেই। ছেলেকে বললেন, মেয়েটাকে আবার ডাকলে আসবে না?

না। মণ্টুও তেতে আছে মায়ের ওপর।

তুই জানলি কি করে, একবার গিয়ে বলে আয় না।

মণ্টু সাফ জবাব দিল, পারব না।

চারুদেবী বলতে যাচ্ছিলেন কি, বিপিনকে আসতে দেখে থেমে গেলেন। কয়েক নিমেষ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বিপিন মণ্টুর দিকে তাকালো।—তোর কলেজ নেই?

রবিবার আবার কলেজ কি।

তা বলে পড়াশুনাও বন্ধ নাকি রবিবারে? কারণ থাক না থাক, শাসনের সদিচ্ছা দুর্বার। বলল, এবারে পাস করতে পার ভালো, নইলে টাকা পয়সা আমার শস্তা হয় নি বলে রাগলুম—মায়ের আঁচলের নিচে বসে দিন কাটবে না।

মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল আবার।

অনেকক্ষণ নিরুদ্দিষ্ট ঘোরাঘুরির পরে ডাঃ চন্দ্রকে মনে পড়ল হঠাৎ। সংবাদটা সর্বাগ্রে তাঁকেই জানানো উচিত ছিল। ইতিমধ্যে যদি শুনে থাকেন, কি ভেবেছেন ঠিক নেই। আর একটা সম্ভাবনাও চকিতে উদয় হল মনে। দেখা যাক।

মোটর ছুটল শিবাজী পার্কের রাস্তা ধরে।

বাইরের ঘরে মোটা বইয়ের আড়ালে মুখ ঢাকা চন্দ্র। নিবিষ্ট-চিত্ত। পায়ের শব্দে মুখ তুললেন। হাস্যোৎফুল্ল বিস্ময় তারপর। শেয়ার মার্কেট যে! কি খবর?

ছুটির দিন, এলাম…

বেশ, বোসো বোসো। দেখলেন একটু, ছুটির দিন তো প্রতি সপ্তাহে একটি করে আছে হে, কখনো মনে পড়ে না তো? খবর সব ভালো? ব্যবসায় তো লাল হয়ে উঠেছ শুনতে পাই, আমরা বই ঘেঁটেই গেলাম।

বিপিন হালকা জবাব দিল, তোমরা কি আর চাও কিছু, মহাদেবের মতো সোনার বদলে ছাইই অলঙ্কার তোমাদের।

থাক, তুমি কবিত্ব শুরু করলে আর বাকি থাকবে না কেউ। হাঁক দিলেন, অপর্ণা!

শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে অপর্ণা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ডাঃ সমাদ্দার ভিন্ন আর কারো সামনে ডাক পড়ে না বড় একটা।

চন্দ্র ডাকলেন, এসো, ভেতরে এসো। আমার ব্রোকার বন্ধুর গল্প করতাম, ইনি—। এখন একাই একটা আস্ত শেয়ার মার্কেট। ছুটির দিনে পথ ভুলে এসে পড়েছে…পড়েছেই যখন একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে হয়।

অন্তরঙ্গ-স্বরে বিপিন বলল, মোহিনীদার কথা শুনবেন না বৌদি, লোকের নামে বাড়িয়ে বলাই ওঁর অভ্যাস।

অপর্ণা তেমনি জবাব দিল, কি করে জানবো, পড়ার বই ছাড়া কারো সঙ্গে যে আলাপ আছে তাই তো জানতুম না।

আজ জানলে তো? হাসিমুখে চন্দ্র তাকালেন বিপিনের দিকে।—বিপিন, এঁর গান সম্বন্ধে তোমাদের কি বলেছিলাম বলে দাও তো।

অপর্ণার গানের সুখ্যাতি বিপিন যথার্থই শুনেছে আগে। এবং রূপেরও। জবাব দিল, বলেছিলে…চমৎকার গলা, কিন্তু ওঁর গান থেকেও ওঁকেই বেশি পছন্দ তোমার।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে তাকালেন চন্দ্র।—ইউ লায়ার! এই বলেছিলাম?

অপর্ণা স্মিতহাস্যে টিপ্পনী কাটল, উনি ভুলে গেছেন, তুমি বলেছিলে মাইক্রোস্কোপ বেশি পছন্দ।

সম্মিলিত হাসি।

বসুন, চা দিতে বলি। অপর্ণা ফিরে গেল।

সংসারের আনন্দরূপটা বিপিনের বুভুক্ষু মনে তৃষ্ণা আনলে। একটা জ্বালার মতো অনুভূতি বিমনা করে দিল তাকে। অভাব তো তারও কিছু নেই, অথচ জীবনের কতগুলো দিন বৃথাই ব্যয় করে ফেলেছে।

তারপর আর কি খবর বলো। চন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন।

খবর ভালোই।

ও মেয়েটি পড়াচ্ছে কেমন তোমার ভাইকে?

বিপিন সহসা জবাব দিয়ে উঠতে পারে না কিছু।

চন্দ্র বলে গেলেন, অমন ভালো মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না হে, মণ্টু এবার ভালো রেজাল্ট্ করে যাবে দেখো'খন।

দ্বিধা কাটিয়ে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এসেছেও এই জন্যেই। কিছু বলতে। কিছু প্রকাশ করতে। তাই খবরটাই প্রথম দিল সরাসরি। বলল, এঁর সম্বন্ধেই তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল মোহিনীদা। মণ্টুকে আর পড়াচ্ছেন না উনি।

সে কি! চন্দ্র অবাক।

কাকীমার ঠিক পছন্দ নয় মেয়ে টিচার তাঁর ছেলে প[illegible]। নিষেধ করে দিলেন হঠাৎ।

শুনে চন্দ্র স্তব্ধ হয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। পরে আস্তে আস্তে বললেন, এমন হতে পারে জানলে তাকে পাঠাতুম না তোমাদের বাড়ি। সী ইজ্ নিডি···বাট্ সি ইজ্ ওয়ান্ ইন্ এ থাউজেণ্ড।

অপর্ণা ঘরে প্রবেশ করল। পিছনে বেয়ারার হাতে চায়ের সরঞ্জাম। চন্দ্রর প্রশংসা-বাণী কানে গেছে। বেয়ারাকে বিদায় দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কার কথা বলছ? ছদ্ম-ভীতি, আমি নয় তো?

আমার ছাত্রী।

সরমা ব্যানার্জী?

হ্যাঁ।

অপর্ণা মুচকি হাসল একটু, তাই এত উল্লাস!

এ সংবাদ শোনার পর বিদ্রূপ তেতো লাগল। বিপিনকে শোনাবার জন্যই চন্দ্র বলে বসলেন, হবে না কেন, তোমাদের মতো শাড়ি গাড়ি গান বাজনা নিয়ে তো তোর দিন কাটে না—

বিব্রত হলেন পরক্ষণে। এর জের সামলাতে হবে। অপর্ণা বিস্মিত নেত্রে একবার তাকালো তাঁর দিকে। পরে পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে নিঃশব্দ চলে গেল ঘর থেকে।

বিপিন বলল, রাগিয়ে দিলে তো বৌদিকে?

চন্দ্র হাসলেন একটু, যাকগে···কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাকে আর কি করতে বলো তুমি?

আমি বাড়ি থাকলে এমনটা হত না ঠিক।

ঈষৎ ক্ষোভে চন্দ্র বললেন, কিন্তু আর তো তাকে বলতে পারিনে ও বাড়ি গিয়ে আবার পড়াও তুমি।

একটু থেমে বিপিন সোজাসুজি অভিপ্রায় ব্যক্ত করে ফেলল।—আমি তোমার কাছে অন্য সুপারিশ নিয়ে এসেছি মোহিনীদা।···তাকে বরাবরকার মতোই আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে চাই।

চন্দ্র অবাক খানিকক্ষণ। পরে হেসে উঠলেন সশব্দে। এই ব্যাপার! তা, আমি যে করি মাস্টারি, ঘটকালি তো করিনে!

তোমাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

চন্দ্র ভাবলেন একটু। সদিচ্ছাটা সরমাকে জানিয়েছ?

না।

তাকে বলো। ছেলে হিসেবে তো এ বাজারে রত্ন তুমি, আমার মতামত কিছু চায় তো···। হঠাৎ থেমে গেলেন, কি যেন মনে পড়তে অন্যমনস্ক হলেন একটু। জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, অবিনাশের সঙ্গে আলাপ নেই তোমার, না?

না, কে তিনি? বিপিন সচকিত।

চন্দ্রর চিন্তাস্রোত ঘুরে গেল। কি ভেবে জিজ্ঞাসা করেছেন নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় খুব। অল্প হেসে বললেন, চিনলে ভালো করতে···যাক, সরমার দাদা আছেন শুনেছি, তাঁর কাছেও কথাটা তুলে দেখতে পারো।

বিপিন চলে গেল।

পড়ায় মন বসছে না আর। চন্দ্র বই রেখে দিলেন। এ সম্ভাবনার কথাটা

ভাবা উচিত ছিল। বিপিন বাল্যবন্ধু। শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে। সানন্দে এ ব্যবস্থায় অগ্রণী হতেও বাধা ছিল না…যদি না, মাঝখানে আর একজনকে এমন করে জানতেন তিনি। বা চিনতেন এমন করে। বিপিনের তুলনায় সেই মানুষটার নেই কিছুই—রূপ, স্বাস্থ্য, অর্থ। কিন্তু সমস্ত রিক্ততা সত্ত্বেও যে মানুষ পরিপূর্ণ, অবিনাশ তাদেরই একজন। চন্দ্র বিমনা হয়ে পড়লেন।

দেয়াল-ঘড়িতে চোখ পড়তে সম্বিৎ ফিরল। ছুটির দিনে সময়ে স্নানাহারের জন্য অপর্ণার তাগিদ আসার কথা। কিন্তু তার সাড়াশব্দ নেই। মুষড়ে গেলেন, গোলযোগ নিজেই সৃষ্টি করে রেখেছেন।

অপর্ণা শুয়ে আছে ইজিচেয়ারে। অভিমান দুরপনেয়।

সায়েন্স-পড়া মানুষটির কণ্ঠস্বরে নিঃসৃত হল গদ্যাকারের দুটি কথা, রাগ করেছ?

অপর্ণা সোজা হয়ে বসল, না।

কিঞ্চিৎ রসিকতার স্পৃহা দমন করতে পারলেন না চন্দ্র। বললেন, রাগলে যদি এমনটি দেখায়, রোজ একবার করে রাগিয়ে দেওয়াই উচিত তোমাকে।

ব্যর্থ চেষ্টা। রুক্ষ দৃষ্টি অপর্ণার।—পাঁচ বছরের খুকিটি পেয়েছ আমাকে?

না, সাতাশ বছরের। হল কি বলো তো, তোমার সঙ্গেও ওজন করে কথা বলতে হবে সব সময়?

অপর্ণা উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। তিনি বাধা দিলেন, আমার সত্যিই অন্যায় হয়েছে অপর্ণা।

এরই অপেক্ষায় ছিল। ঘুরে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, সত্যিকারের দুঃখটা প্রকাশ করে ফেলেছ রাগের মাথায়, এই অন্যায়? শাড়ি গাড়ি গান বাজনা নিয়ে দিন কাটবে আমার, তোমার মাইক্রোসকোপের তথ্য আমি বুঝতে চাইব না কোন কালে—এ তুমি আগে জানতে না?

জানতুম। সহাস্যে জবাব দিলেন চন্দ্র, গান বাজনার বদলে তুমি মাইক্রোস-কোপের তথ্য বুঝতে চাইলে পাঁচ ডিগ্রী জ্বরের মতো লাগত।

ছোটখাটো গোলযোগে আপসের এ প্রয়াস নতুন নয়। তা ছাড়া একেবারে মিথ্যেও বলেন নি। সরমার প্রসঙ্গে অপর্ণার প্রতি ব্যঙ্গোক্তিটা সাত-পাঁচ না ভেবেই করে ফেলেছেন। নইলে তার গান বাজনা রাগ অভিমানে অভ্যস্ত তো বটেই, ভালোও লাগে।

॥ ৪ ॥

বিপিন চৌধুরীর সঙ্কল্প অটুট। শেষ না দেখে থামবে না। সেদিনের সাক্ষাতে সরমার দিক থেকে সহজ আহ্বান মাত্র থাকত যদি, মেজাজ চড়ত না এতটা। চন্দ্রের কথা মনেও পড়ত না হয়তো। কিন্তু হল বিপরীত দাঁড়াল। অজ্ঞাত অবিনাশের নামটা কৌতূহলোদ্দীপক। অস্বস্তিকরও। শান্ত প্রতীক্ষা সম্ভব নয়, লাগাম-ছাড়া দুরন্ত বাসনায় অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত দুঃসহ। মোটর ছুটল দাদরের দিকে। যান-বাহন-পরিকীর্ণ রাজপথে স্পীডোমিটারের কাঁটা চল্লিশের দাগ ছুঁয়েছে।

কাকে চান? মণিময় লেখা থামাল।

সরমাদেবী বাড়ি আছেন?

না।

ফিরতে দেরি হবে?

জানিনে, কি দরকার বলে যেতে পারেন।

তিনি আসতে বলেছিলেন আমায়—

বসুন তাহলে। মণিময় কলম তুলে নিল। মানুষটা বসবে কোথায়, মেঝেয় না তার ছড়ানো কাগজপত্রের ওপর, সে ভাবনাও নেই।

আচ্ছা, বাইরে গাড়িতেই অপেক্ষা করছি আমি—

গাড়ির কথা কানে যেতে মণিময় আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিল একবার। গাড়ি থাকা সম্ভব বটে। তক্তাপোশের ধার থেকে কাগজপত্র সরিয়ে নিল।—এখানেই বসুন, মিছিমিছি বাইরে আবার কেন। সরমা বলে গিয়ে থাকলে এক্ষুনি আসবে।

আহ্বান অবহেলার নয়। আসন গ্রহণ করল বিপিন চৌধুরী।—আমি আজই আসব উনি জানেন না অবশ্য…আপনি তাঁর দাদা?

হ্যাঁ, আপনি?

আমার নাম বিপিন চৌধুরী।

দ্রুত তালের আলাপ। শেয়ার বাজারের দালালির দক্ষতা এ ক্ষেত্রেও কাজে লাগে।

আপনি লেখেন?

একটু আধটু।

সশ্রদ্ধ অভিব্যক্তি বিপিনের।—দেখুন তো কি অন্যায়, সরমাদেবী কোন দিন বলেন নি। ভালো লেখকের যে কত অভাব আজকাল, অথচ হাতের কাছে আপনি এমন···নামটি কি আপনার?

নাম বলল।

চিন্তাপ্রচ্ছন্ন।—শুনেছি হয়তো, ঠিক মনে পড়ছে না। কি লেখেন, উপন্যাস?

নাটক। উপন্যাসের দলে আর ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি।

আগ্রহাতিশয্যে পকেট থেকে নোট বই হাতে উঠে আসে বিপিনের।—বইয়ের নাম বলুন, আজই কিনে নেব—না না কম্‌প্লিমেন্টারি চাইনে, ওই এক রোগ আমাদের, সবার আগে বই কিনে কোথায় লেখকের সম্মান বাড়াবো তা নয়, কম্‌প্লিমেন্টারি চেয়ে নিয়ে বাহাদুরি করা চাই অন্যের কাছে। সামাজিক নাটকের আইডিয়া তো এদেশে প্রায় নতুন বললেই চলে—

স্তুতিকলায় পাথর ভেজে। মণিময় সামান্য মানুষ। অতঃপর 'দেশের মেয়ে' চিত্র-রূপায়ণের সদিচ্ছায় বিপিনের দ্বিগুণতর উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন। কল্পিত চিত্র-প্রযোজক-বন্ধুর অকৃত্রিম সহযোগিতার আশ্বাস দানে মুক্ত-কণ্ঠ।

আবহাওয়া অনুকূল। প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হল।—এমনিতেই আজ আপনার সঙ্গে আলাপের ইচ্ছে ছিল, এখন তো দেখছি উঁচু দরের সাহিত্যিক আপনি। আমার ইয়ে···সমস্যাটা ভালো বুঝবেন বোধ হয়···।

মণিময় জিজ্ঞাসু।

এই, বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম আর কি—

মণিময় অবাক।—বিয়ে! কিন্তু বিয়ে তো আমি করব না আর।

বিপিন মনে মনে তাকে জাহান্নমেই পাঠাল একবার।—আমি আমারই কথা বলছি।

সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবতে চেষ্টা করল মণিময়। নিজের ঝোঁকে থাকে, আসলে নির্বোধ নয় মানুষটা। অনুমানে ঠিকই বুঝে নিল তার সমস্যা।

এই ব্যাপার···। সামান্য কথাটা তোলবার জন্যে এতক্ষণ কষ্ট করলেন বসে? সরমাকে বলেছেন?

—না।

বলুন তাকে।

পারি, কিন্তু আপনি আছেন মাথার ওপর—

না মশাই, ওর মাথার ওপর কেউ⋯হঠাৎ স্মরণ হল কি,—অবিনাশকে চেনেন আপনি ?

আবার ধাক্কা খেল বিপিন। নাম শুনেছি, কে বলুন তো তিনি ?

থার্ড-ক্লাস্ লোক। সরমার বন্ধু। কাউকে দিয়ে যদি তুলতে চান কথাটা, একমাত্র মানুষ সে। তার কাছে যান। আমি বলেছি ভাববেন না যেন।—

কি করেন ?

ঘাস কাটেন। কমার্সিয়াল আর্টিস্ট, বছরে সতের বার অসুখে ভোগে বলে চাকরি গেছে। এখন বাড়ি বসেই কাজ করে শুনেছি।

অবিনাশের প্রসঙ্গে চন্দ্রর শেষের হাসিটুকু মনে আছে বিপিনের। মণিময়ও যথার্থই পথ দেখালো কি পথের সন্ধান দিল বোঝা দুরূহ। লেখক জাতটার ওপরেই সে চটে উঠল, হেঁয়ালি ছাড়া সবেতে শূন্য-কুম্ভ।

নিজেই তিনি বিবাহ-প্রার্থী নন্ তো ? সশঙ্ক জিজ্ঞাসা।

মণিময় হেসে জবাব দিল, বোধ হয় না।⋯একবার সে মুখ ফুটে বললে এতদিনে তিনবার বিয়ে হয়ে যেত।

অথৈ জল। থার্ড-ক্লাস্ লোক, ঘাস কাটে—সরমার বন্ধু। মুখ ফুটে বললে এতদিনে তিনবার পর্যন্ত বিয়ে হতে পারত। হয় নি, অর্থাৎ মুখ ফুটে সে বলে নি কখনো। সব মিলিয়ে সব কিছুই তেমনি গোলমেলে।

গোঁয়ার মণ্টুর শান্তি নেই।

বিগত ক'টা দিনে তারও মানসিক জগতে বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটে গেছে। তার ভয় নেই মায়ের মতো। দুশ্চিন্তা নেই বিপিনের মতো। কিন্তু বিক্ষোভের মাত্রা কম নয় লেশমাত্র। মায়ের তরফ থেকে সরমাকে ফিরিয়ে আনার অনুরোধে আগুন হয়েছে। জ্যেষ্ঠের তিরস্কারে মেজাজ বিগড়েছে। আর আত্মতাড়নায় অহর্নিশি মন জ্বলেছে। জ্বলছেও।

কর্তব্য স্থির অবশেষে। ছুটির সময় সায়েন্স কলেজের গেটে হাজিরা দিল। এক দিন দু দিন তিন দিন কিন্তু সঙ্কল্প দোদুল্যমান। দূর থেকে সরমাকে দেখামাত্র কণ্ঠতালু শুকিয়ে তৃষ্ণার উদ্রেক হয়েছে কেমন। বাড়ি ফিরে জলের বদলে বিবেকের চড় খেয়েছে গোটাকতক।

মরার বাড়া যাতনা কাপুরুষতার গ্লানি। মণ্টু মরীয়া। শীতকালের সকালে

জল-ভীরু স্নানার্থীর সহসা ঝপাঝপ জল ঢেলে ফেলার মতো সেও একদিন সপাসপ হাজির সরমার বাড়ি।

বিন্নুকে বিছানায় বসিয়ে সরমা হাসিমুখে এলো তাড়াতাড়ি।—কি আশ্চর্য, তুমি? এসো এসো। হাত ধরে তাকে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, বোসো।

মণ্টু বসল গম্ভীর মুখে। সরমা তার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করল একটু। পরে হাসি গোপন করে স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়ালো।

আমি চা খেতে আসি নি।

সরমা সকৌতুকে তাকে নিরীক্ষণ করল আবার।—কেন এসেছ?

মণ্টু অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে।

সরমা আবার বলল, এলে একটা কিছু অনুরোধ করবে বলে অথচ ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন আমিই আসামী। এদিকে ফিরে বসতে পার, এখন আমার দিকে চাইলে রাগ করব না।

কানের কাছটা লাল হয়ে ওঠে মণ্টুর।

পড়াশুনা হচ্ছে ভালো?

না।

কেন?

আপনি যদি না পড়ান, পড়া ছেড়ে দেব আমি।

ও বাবা! কিন্তু আমি তো ইচ্ছে করে পড়ানো বন্ধ করি নি তোমাকে?

মণ্টু নীরব ক্ষণকাল, আমাদের বাড়ি আর কক্ষনো কোন অসম্মান হবে না আপনার।

সরমা মুখ টিপে হাসল তার দিকে চেয়ে।—কথাটা কি তোমার না আর কারো?

আর কেউ জানে না আমি এখানে এসেছি। মা অনেকবার তাগিদ দিয়েছেন আপনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। তা ছাড়া দাদা সেই থেকে রেগে আগুন।

ওই জন্যেই বুঝি এসেচ?

না, আমার অন্যায় হয়েছে। আপনি না এলে আমি সত্যিই পড়া ছেড়ে দেব!

সরমা ভাবল একটু। এক পেয়ালা চা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আমার কোন রাগ নেই তোমাদের ওপর। বোঝবার যদি কিছু থাকে, এসে বুঝে নিও, খুব খুশি হব।

কিন্তু মণ্টু খুশি হল না।

সরমার মায়া হল কেমন। বলল, তুমি পড়াশুনায় অবহেলা করছ শুনলে ভয়ানক রেগে যাব কিন্তু। এম. এস্‌সি পর্যন্ত একবারে পাস করে নাও ভালো করে। তারপর একসঙ্গে আমরা রিসার্চ করব কোন ভালো ল্যাবরেটারিতে। কেমন হবে বলো তো ?

মণ্টু হাসিমুখেই বিদায় নিল শেষ পর্যন্ত।

অবিনাশের দোর-গোড়ায় মোটর থামল। আগন্তুক বিপিন চৌধুরী। অবিনাশ-সন্দর্শনে বিস্ময়ের উদ্রেক হল সত্যিই।

আপনি অবিনাশবাবু ?

হ্যাঁ, বসুন—আপনি ?

বিপিন বসল কাঠের আধময়লা চেয়ারে। অনুসন্ধিৎসু। মণিময়ের বর্ণনা মিলছে, থার্ডক্লাস···ঘাস কাটে···। কিন্তু সরমার বন্ধু এবং তার পরেরটুকু মেলানো শক্ত।

আমি একজন শেয়ার ডিলার—একটা বিজ্ঞাপনের ডিজাইন্‌ এঁকে দিতে হবে। পকেট থেকে নমুনা বার করল।

অবিনাশের মুখে ভাবান্তর নেই কোনো। কাগজটা হাতে নিয়ে দেখল একবার।

হবে।

লেটারিং ঠিক এমনি হওয়া চাই।

অবিনাশ হাসতে লাগল মৃদু মৃদু। জবাব দিল, হাতের লেখা দেখলে আপনার নাম সই করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে আসতে পারি। লেটারিংএ গলদ থাকবে না।

—বেশ। অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায় বিপিনের হাসি-খুশিতে। আপনি এ লাইনে কাজ করছেন কতদিন ?

অনেক দিন। আসল কথাটা বলুন এবার।

বিপিন তাকালো। নিরীক্ষণ করল। টাকা ? সে আপনি যা চান তাই পাবেন।

প্রচ্ছন্ন কৌতুকে অবিনাশ চেয়ে থাকে স্বল্পক্ষণ। আর তাহলে কোন কথা নেই আপনার ?

বিপিন জিজ্ঞাস্থ। মানে—?

মাপ করবেন। আপনার আপিস বড়ি-বন্দরে, ছ'মাইল পেট্রোল খরচা করে এসেছেন বিজ্ঞাপনের লেটারিং আঁকাতে আমার হাত-যশ শুনে, বুঝতে পারি নি।

বিপিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে তাকে।—কাস্টমারের সঙ্গে এ কোন্ দিশি আপনার?

খাঁটি দিশি। অবিনাশ গম্ভীর।—বাজে বকাটা মুদ্রা-দোষ আমার, অপরাধ নেবেন না। আচ্ছা নমস্কার, আপনার অর্ডার কালই পাবেন।

থার্ড-ক্লাস লোকই বটে; মুখ ফুটে বললে সরমা যাকে তিন-বার পর্যন্ত বিয়ে করত, মণিময়ের মতো চল্‌তি ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসের কেউ সে হবে না, জানা কথা। ছলাকলা পরিহার করে সোজাসুজি সম্মুখীন হওয়াই সমীচীন। ঈষৎ হেসে বিপিন বলল, আমি কেন এসেছি বুঝতে পেরেছেন?

অবিনাশ জবাব দিল, ভেবেছিলাম পেরেছি কিন্তু সেটা তো দিশি তামাশার মত জলো লাগল। মণ্টু, অর্থাৎ সরমা যাকে পড়াতো তার দাদা তো আপনি?

জবাবে উচ্চহাস্যে ঘর সরগরম করে তুলল বিপিন। পরে বলল, শেয়ার বাজারের দালালি জানা আছে, বিয়ের বাজারের সুপারিশও একই বিদ্যেয় চালাতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনলুম। হ্যাঁ, আমি মণ্টুর দাদা, আমার নাম বিপিন চৌধুরী।

কিন্তু আমার কাছে সুপারিশ কিসের?

আমাকে দেখেই আপনি এতটা জেনে বসে আছেন আর এটুকুই জানতে বাকি?

অবিনাশ সহাস্যে বলল, তা নয়—কিন্তু আমি তো আপনার পাত্রী নই মশাই!

বিপিন মনে মনে বলল, গলায় দড়ি দিতে হত তাহলে। পাত্রী নয় জানে, কিন্তু আর কিছু কি না সেটাই জানা দরকার। বলল, ডাঃ চন্দ্র আপনার নাম করলেন, সরমার দাদাও আপনার কথাই বললেন···আপনার সুনজর থাকলে নাকি আর আটকাবে না।

অবিনাশ হাসছে।—নিজের এমন অদ্ভুত প্রতিপত্তি জানতুম না। সাদা কথায় আপনি সরমাকে বিয়ে করতে চান আর আমাকে সেজন্যে তদবির করতে হবে, এই না?

গরজ বিষম বালাই। ক্ষুদ্র জবাব দিল, আপনার অনুগ্রহ।

কয়েকটা চিন্তার রেখা মিলিয়ে গেল তড়িতে। একটু নীরব থেকে অবিনাশ শান্ত মুখে বলল, আমি বলে দেখতে পারি এই পর্যন্ত···কিন্তু গোটাকতক কথা তাহলে জিজ্ঞাসা করা দরকার।

বলুন।

মাসে রোজগার কত আপনার ?

চার পাঁচ হাজার। ঘরের ভিতরটা বিপিন ভালো করে দেখল আবার। মূর্তিমান দারিদ্র্য। সীমাতীত মনে হয় স্পর্ধা।

সান্তাক্রুজে নিজেদের বাড়ি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।···মেরিন-লাইনসএও জমি দেখছি, আর ব্যাঙ্কের পাস্ বইও আছে গোটাকতক, বলেন তো পাঠিয়ে দিতে পারি।

অবিনাশ ততোধিক শান্ত।—ছবি আঁকা পেশা, মনের কথা এমনিতেই একটু-আধটু বুঝতে পারি, বিদ্রূপের চেষ্টা পণ্ডশ্রম আপনার।···সরমার বরাবরকার ইচ্ছে বিজ্ঞানে সত্যিকারের কিছুতে কাজে লাগবে ও। এতে আপনার দিক থেকে বাধা আসবে না কখনো ?

না।

বেশ। তেমনি নিস্পৃহ ঠাণ্ডা গলায় অবিনাশ বলল আবার, আপনার পাস্ বইয়ের জোর থাকে তো বাড়িতে একটা ল্যাবরেটারির মতো করে দেবেন ওকে। আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না···তবে, যে যাই বলুক, তার নিজের মতামতই সকলের বড়, এ আপনিও জানেন বোধ হয়। শিগগীরই ছুটি হয়ে যাবে ওদের, তখন তুলব কথাটা।

বিপিন গাত্রোত্থান করল, আজ আসি তাহলে, নমস্কার।

নমস্কার। অবিনাশ বিজ্ঞাপনের নমুনাটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে।—এটা নিয়ে যান।

মোটরে বসে বিপিন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল বিজ্ঞাপনের নক্সা।

ান্ত হল মণিময়ের শবরীর প্রতীক্ষা। চলচ্চিত্র প্রযোজকের পাষাণ প্রাণও ভিজল শেষ পর্যন্ত। স্টুডিও থেকে ডাক এসেছে। ওদিকে রেকর্ড কোম্পানিতে হাজিরা দেওয়াও আশু প্রয়োজন। কিন্তু বেরুবে কি, সরমার দেখা নেই—ছেলে একা থাকে বাড়িতে। ঠিক করল, কাজটা হলে ওকে কনভেন্ট এ পাঠিয়ে দেবেই।

সরমা ফিরল, সঙ্গে অবিনাশ। আল্‌না থেকে তাড়াতাড়ি একটা জামা টেনে নিয়ে রাগে গজগজ করে উঠল মণিময়।—এতক্ষণে সময় হল তোর, একপা' নড়তে পারছিনে আমি—

এবার যাও।

এবার যাও, একবার বেরুলে আর—

ঘাট হয়েছে, থামো। গান গাইতে পারবে এক জায়গায়?

এবার মণিময়ের বিস্ময়ের পালা। গান সে ভালোই গায় এবং বাইরে সুনামও আছে। কিন্তু সরমার কাছে উৎসাহ পায় নি কোন দিন। অবিনাশের বাহবা বরং জুটত অনেক।

কোথায়? কি অকেশান?

সায়েন্স কলেজে। ডাঃ সমাদ্দারকে রিসেপশান দেবে সব কলেজ আর য়ুনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা। যাবে নাকি? বিনুকে অবিনাশের কাছে রেখে যাব'খন?

আচ্ছা।—মেজাজ এক মুহূর্তে ভালো হয়ে গেল। অবিনাশের দিকে তাকালো সে, আসবি নাকি, স্টুডিও তো দেখিস নি কখনো, চল্।

অবিনাশ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল, থাক দাদা, শুভ কাজে যাচ্ছ, আমাকে ডাকাও যা বেরুবার মুখে অযাত্রা স্মরণ করাও তাই। প্রার্থনা করি তোমার প্রডিউসারের যেন সত্যিই ভীমরতি ধরে এবার।

সমস্যাভাবে গতানুগতিক বোঝাপড়া স্থগিত থাকল। দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হল সে।

পিতার সান্নিধ্যে বিনু নির্বাক শ্রোতা এবং দ্রষ্টা। সতেজে ঘোষণা করল এবার, আমি পিসেমশাইর কাছে থাকব না। তাকে অবিনাশের কাছে রেখে যাবার কথাটা মনে করে বসে আছে।

সরমা বসল তার পাশে, কেন পিসেমশাই কি করেছে ?

সে একই কথার পুনরুক্তি করল, থাকব না।

অবিনাশও বসল চেয়ার টেনে। বলল, দেখ সরমা, ও ডাকটা ওকে ছাড়াও। শুনতে আমার ভালোই লাগে কিন্তু ওর সত্যিকারের পিসেমশাই যিনি আসছেন, শুনলে হার্ট ফেল করবেন।

বাজে কথা রাখো, বেলা হল, কি করবে এখন ?

উঠছি। অবিনাশ হাসছে মুখ টিপে।—কিন্তু কথাটা বাজে কেন হল, ও বেচারীর আশা ভরসা সত্যিই নেই নাকি ?

সরমা অন্যমনস্কের মতো বিনুর মাথার চুলগুলি নাড়া-চাড়া করে কিছুক্ষণ জবাব এড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়।—অবেলায় আর বাড়ি গিয়ে রান্না চাপাতে হবে না, যা আছে দুজনের হয়ে যাবে একরকম করে। এসো।

পাশের ঘরে চলে গেল। অবিনাশ আপত্তি করল না। করলেও ফল হবে না জানে।

দুটো থালায় ভাত বেড়ে নিয়েছে সরমা। অবিনাশ দাঁড়িয়ে দেখল একটু।

বোসো।

বসছি। ওর দিকে চেয়ে ছিল অবিনাশ। একটু যেন গম্ভীর দেখাচ্ছে। বিপিন চৌধুরীর আবেদন যথা সময়েই পেশ করেছিল। শোনা মাত্র সরমা যদি বাতিল করে দিত, কথা থাকত না। কিন্তু সরমা তা করেনি। চুপচাপ শুনেছিল। আর শুনেও চুপ করেই ছিল। থালায় ভাতের পরিমাণ দেখে নিয়ে অবিনাশ স্বভাব-সুলভ হালকা গলায় বলল, ভাগ জিনিসটা ঠিকমত ভাগ না হলে অবশিষ্ট থাকে কিছু। হিসেবে থাকে থাকুক, ভাতের বেলায় নৈব নৈব চ। দেবার বেলায় দেবে বেশি অথচ ক্ষিধের জ্বালায় মনে মনে নেবে বেশি আমার রোগা শরীরে এত সইবে না। ভাত কমাও।

বকবক না করে বোসো এখন।

এবারে অবিনাশ বেশ ঘটা করে ওকে দেখল যেন আর এক দফা। তাতেও কাজ হল না দেখে ছদ্মগাম্ভীর্যে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে তৎপর হল সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বক্তৃতার সুরে বলল, দেখো, এই যে মেজাজটা তোমার ভালোই ছিল এতক্ষণ, অথচ বিগড়ে গেল ঝট্ করে, আর তার দায় গিয়ে পড়ল বিনুর পিসেমশাই নির্বাচনের ওপর, সেটা মিথ্যে না হলেও ঠিক সত্যি নয়। পাকযন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় মনোযন্ত্রের বিকৃতি সর্বজনবিদিত। অতএব, হে অন্নদা—

খানিকটা অন্নব্যঞ্জন তোলো তোমার থালায়, নইলে অরীয়া হয়ে আমি তাণ্ডব নৃত্য শুরু করব।

সরমা হেসে ফেলল। বলল, আঁকা ছেড়ে থিয়েটারে ঢুকে পড়ো সং সেজে। দিচ্ছি কমিয়ে বাক্যবাগীশ, বোসো।

অবিনাশের মুখে অবিচ্ছেদ্য গাম্ভীর্য। আসন-পিঁড়ি হয়ে ভারী গলায় বলল, অগ্নিভাষিণী, তোমার রসনা সহ্য হয়, কিন্তু সঙ্গের ওই হাস্যচ্ছটাটুকু নয়। রাগ ভুলে ও মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতে পারি।

সরমা ভাতের বদলে আঁচল তুলে দিল মুখে। দুই চোখ ওর মুখের ওপর। —থাকো না, কে বারণ করেছে।

সহাস্যে আহারে মনোনিবেশ করল তারা। কিছুক্ষণ বাদে অবিনাশ বলল আবার, বাজে কথাটার আলোচনা শেষ করে নেওয়া যাক এবার তাহলে, মাথা ঠাণ্ডা রেখো।

তোমাকে কি ভদ্রলোক দালাল রেখেছেন নাকি?

দালালি একটা পাব নিঃসন্দেহ, তবে সেটা কোন্ তরফ থেকে জানা নেই। —তোমার বক্তব্য কি?

সরমা নিরুত্তর।

মাস্টারী ঢংএ অবিনাশ বলল, দেখো, সবারই জীবনে প্রোগ্রাম থাকে একটা। তোমারও আছে—

যেমন? সরমাও চেষ্টা করছে সহজ হতে।

এবারে আর ঘোরপ্যাচের মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি জবাব দিল অবিনাশ, যেমন ধরো, এম. এস্‌সি পাস করবে, তারপর সমাদ্দারের ল্যাবরেটারিতে জায়গা পাও যাবে, নয়তো চাকরি করবে কোন কলেজে, সুযোগ পেলে বাড়ি বসেও কিছু গবেষণা করতে পারো। অন্যদিকে কর্তৃত্ব করবে একজনের ওপর আর ক্রমশ একটা সংসারের ওপর। সব মিলে একটা বড় সার্থকতার আশা আছে মনে, অথচ বলতে পারছ না মুখ ফুটে। কেমন কি না?

সরমা থালা থেকে মুখ না তুলে হাসল একটু।—বলতে বাধা কোথায় শুনি?

বাধা এই পামর।

আহা-গো।...তারপর তোমার প্রোগ্রাম?

অবিনাশ ঈষদ্ধাস্যে তাকে নিরীক্ষণ করল একটু। পরে কয়েক গরাস ভাত মুখে পুরে বলল, সে কি তোমার জানা নেই নাকি?

তা হলেও বলো, মিলিয়ে দেখি।

আহার সম্পন্ন করে অবিনাশ এক ঢোঁক জল খেয়ে নিল। পরে ধ্যানমগ্নের মতো চোখ বুজে বসল পা গুটিয়ে।—তোমারটা পুরোপুরি বললেই আমারটা বলা হবে, দেখো মেলে কি না।…এখন একত্রিশ আমার, আরো বছর তিনেক কাটছে এমনি হৈ চৈ করে এবং কিছু না করে। এর পরে ভালো থাকলে চুপ করে নক্সা আঁকছি ঘরে বসে। অন্যথায় হাসপাতাল। ইতিমধ্যে বিপিনবাবু তোমার কাঁধে ভর করেছেন। তুমি প্রথম প্রথম দেখাশুনা করতে আসছ প্রায়ই, পরে সময় অভাবে মাঝে মাঝে। সঙ্গে স্বাস্থ্যোপদেশ আর হিতোপদেশের ঝুড়ি। তোমার সময় কমছে, কাজেই আমার বাড়ছে। পয়সা কিছু পাচ্ছি কিন্তু থাকছে না। দেহের খাঁচা ঠিক রাখতে মাশুল যাচ্ছে ক্রমাগত। কিন্তু নাছোড়বান্দা আমি, যুদ্ধ করছি অক্লান্ত। বিপিনবাবুকে বাহন করে তোমার ঘন ঘন ষড়যন্ত্র—তদারক এবং সুচিকিৎসার অজুহাতে এসে থাকতে হবে তোমাদের বাড়ি। আমার কাঁধে শনি, সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করব।

খাওয়া ফেলে সরমা চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। অবিনাশ হাসল একটু। চোখ বুজে তেমনি বলে গেল, এরপরে হঠাৎ একদিন ক্লান্ত হয়ে যমরাজার বশ্যতা স্বীকার। বিপিনবাবু এক সপ্তাহ শেয়ার বাজারে লোকসান খাবেন দিবারাত্র তোমাকে সান্ত্বনা দেবার অছিলায়।…তোমার দিন কাটছে বছর কাটছে। একটা দুটো করে অনেকগুলো। কখনো মনে পড়ে আমাকে কখনো বা পড়ে না। তোমার মাধুর্য নিয়ে কল্যাণ নিয়ে বড় হয়ে উঠছে তোমার ছেলেমেয়েরা, সুন্দর সংসার। আমি অপরিচিত তাদের। শেষে তুমিও ভুলবে। বয়সের মাঝ ধাপে পা দেবে একদিন, ছেলেমেয়ের শাসনে পড়ে বিশ্রাম নিতে শুরু করবে মাঝে মাঝে। তেমনি এক অলস সন্ধ্যায় বারান্দার রেলিংএ দাঁড়িয়ে নয়ত ছাতের আলসেতে বসে নিজের পরিপূর্ণতাই অনুভব করছ হয়তো। একটু আনন্দ, একটু গর্ব, একটু ব্যথা—। অতীত প্রদক্ষিণ শুরু হবে অন্যমনস্কের মতো। স্তব্ধ হয়ে দেখবে অবিনাশ হারিয়ে যায় নি একেবারে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করবে তোমার ছেলেমেয়েরা, তাদের মায়ের হল কি আজ! ভাববে, ডাকবে কি ডাকবে না।

অবিনাশ চোখ মেলে তাকালো। খাওয়া পড়ে আছে সরমার, চুপ করে চেয়েই আছে তেমনি। উদ্গত অশ্রুর বাঁধ ভেঙে পড়ে বুঝি।

হাসতে চেষ্টা করল অবিনাশ। মুখ বিকৃত হল শুধু। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল

থানিক। এ কোন্ বুভুক্ষু কাঙাল স্বরূপ প্রকাশ করল নিজের! বেদনায় সঙ্কুচিত সমস্ত মুখ।

উঠল। মুখ হাত ধুয়ে এ ঘরে এলো দুজনেই। সরমা নীরবে বসল চৌকিতে। বিনু ঘুমুচ্ছে।

সরমা—

বলো—

ভাবছ কি—

ভাবচি তোমার ও দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার সইবে কি না।

সরমা!

চোখ রাঙিও না, ভয় পাবার বয়স নেই আর। অন্তর কারো ঘরে আমি গেলে হাড়পাঁজর সুদ্ধু গুমরে উঠবে তোমার এ তুমি গোপন করতে চাও কেন? অহঙ্কার ভালো নয় কিন্তু শোকের অহঙ্কার যে আরো খারাপ।

অবিনাশ ঘরের মধ্যে পায়চারি করল বার দুই। মধ্যাহ্নের গুমটে ঘর ভরে গেছে। আবার এসে দাঁড়াল সামনে। কণ্ঠস্বর রুক্ষতর।

তর্ক আমিও ভালোবাসিনে, তুমিও না—বিপিনবাবুকে কি বলব?

আমার সম্বন্ধে কিছু বলা না বলার মালিক তুমি নও। তাঁর কিছু শোনবার থাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

বিবর্ণ দেখালো অবিনাশকে। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলল, একটু আগে যে ছবিটা তুলে ধরেছিলাম, রিক্ততা আছে কিন্তু তার থেকেও বেশি আছে যা, সেটা শিল্পীর চোখের একটা সুন্দর স্বপ্ন। তোমাকে আমি জানি, আমার ভাঙা স্বাস্থ্য তোমাকে অব্যাহতি দিয়েছে এও তো সত্যি। কিন্তু কোনদিন এ নিয়ে কটাক্ষ করেছি বলে মনে তো পড়ে না।

সরমা রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে, তার মানে?

মানে বুঝে নিও। মৃদু স্পষ্ট কণ্ঠে বলল সে, আর একটা কথা, তোমার করুণার বোঝা হয়ে অবিনাশ থাকবে না কোনদিন, বরং নিজেকে সে সরিয়ে নেবে অনেক দূরে, সেটাই স্বাভাবিক জেনো।

সরমা বসে আছে মূর্তির মতো। অবিনাশ চলে গেছে। বিনু ঘুমুচ্ছে অঘোরে। মধ্যাহ্নের ক্লান্ত স্তব্ধতা।

ভাবছে…

দাহ আছে, আছে ব্যর্থ জীবনের বোবা নিঃশ্বাস, কিন্তু তা বলে 'করুণার বোঝা হয়ে অবিনাশ থাকবে না কোন দিন, বরং—'

ধড়মড় করে উঠে সরমা অগ্রসর হল দরজার দিকে। ভয় পেয়েছে। ভয়ই করে অবিনাশকে। থামতে হল। বিনু একা থাকবে। আবার চৌকিতে গিয়ে বসল।

এ কোন্ অদ্ভুত সমস্যা বোঝে না। স্বামী হিসেবে বিপিন চৌধুরীকে তবু কল্পনা করা যেতে পারে। অথচ এই অস্থিচর্মসার মানুষটার প্রতিও লোভের অন্ত নেই তার। উদ্বেগেরও শেষ নেই। ব্যবধান হয়তো চায়, বিচ্ছেদ সইবে না।

নিজের ঘরে ফিরে বিজ্ঞাপনের নক্সা আঁকায় মন দিল অবিনাশ। মুখভাব নির্লিপ্ত। কাজটা জরুরী। শেষ হল। কাগজে মুড়ে সেটা মালিকের জিম্মায় পৌঁছে দিতে গেল। বিজ্ঞাপন-দাতা মোড়কটা এক পাশে সরিয়ে রেখে বললেন আর একটা অর্ডার আছে খুব আর্জেন্ট, আজই ধরে ফেলুন।

অবিনাশ শান্ত মুখে অপেক্ষা করল একটু, এটার টাকা আজ দেবেন?

দু'চার দিন পরে পাবেন।

অর্ডারও দু'চারদিন পরে পাঠাবেন।

ফিরে চলল অবিনাশ। ভদ্রলোক প্রথমে বিস্মিত, পরে ক্রুদ্ধ। কিন্তু স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ ভালো করে যে, পাবিলিসিটি এজেন্টের তার ওপর রাগলে চলে না। তাছাড়া পারিশ্রমিক প্রদানেও এই প্রথম বিলম্ব নয়।

শুনুন, নিয়ে যান টাকা—।

অবিনাশ ফিরল।

এই নিন, টাকার দরকার খুব, মুখে বললেই হত। এইটে নতুন অর্ডার।

কিছু না বলে কাগজপত্র গুটিয়ে নিরুদ্দিষ্টের মতো পথ চলতে লাগল অবিনাশ। মধ্যাহ্নের নির্জনতা কমে আসছে। যান-বাহন লোক-চলাচল সব কিছুই চেয়ে চেয়ে দেখছে সে। চোখে অনর্থক আগ্রহ। কিন্তু বিস্মৃতির খোরাক যোগাতে পারল না কোন বাহ্য বস্তু।

বেলা গড়িয়ে গেল।

বাড়ির কাছে এসে অবিনাশ অবাক। বন্ধ-দরজার সামনে বিজ্ঞাপনের সেই ভদ্রলোকটি অপেক্ষা করছেন। অনতিদূরে সরমা দাঁড়িয়ে।

ঘরের তালা খুলে অবিনাশ ভদ্রলোককে ডাকল, আসুন। পরে তাকালো সরমার দিকে, এসো।

দ্বিতীয় আহ্বান শুনে ভদ্রলোক থমকালেন একটু। পথের ধারে একজন সুদর্শনীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হচ্ছিলেন। আর, এভাবে এতক্ষণ অপেক্ষা করাটাও বিরক্তিকর মনে হয়নি তেমন।

ঘরে প্রবেশ করে সরমা দূরেই দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। ভদ্রলোকটির উদ্দেশে অবিনাশ প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার বলুন তো?

আর কি ব্যাপার। ভদ্রলোকের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল এবারে।—আপনার মতো দু'চার জনের পাল্লায় পড়লে ব্যবসা ছেড়ে একেবারে পালাতে হবে মশাই। আমার ওখান থেকে বেরিয়েছেন তো তিন ঘণ্টা আগে?

অবিনাশ হাসল, দালালির কাজ করেও এমন মাথা মোটা আপনার। তিন ঘণ্টার কৈফিয়ৎ চাই না অন্য কোন কাজ আছে?

জবাবে গম্ভীর মুখে তিনি কাগজের মোড়ক খুলে দুপুরে আঁকা নক্সাটা বার করলেন।—কি হয়েছে এটা?

অবিনাশ বিস্মিত।

লেটারিংএ পাকা হাত জেনে, না দেখেই টাকা দিয়েছি, নতুন অর্ডার দিয়েছি, এতটা বিশ্বাসের পরে এই! আসলটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন তো একবার?

অবিনাশ মিলিয়ে দেখল। চকিতে সরমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একটা। নিজের আঁকা নক্সাটা তিন চার টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে পকেটে হাত দিল।

টাকা ফেরত নিন, আর এই আপনার নতুন অর্ডার।

ভদ্রলোক থমকে গেলেন, ভুল হয়নি বলতে চান?

হাসল সে।—হয়েছে। কিন্তু কি আর করব বলুন, লেটারিংএ আমাকে অভ্রান্ত জানা অথবা কাজ না দেখে টাকা দেওয়া এর কোন পরামর্শই আমি দিই নি। ভুলের জন্য দুঃখিত, দ্বিতীয়বার বিশ্বাসের দাবি আর করব না। আচ্ছা আসুন—

বিজ্ঞাপনদাতা আড়চোখে একবার সরমার দিকে তাকালেন। মনে মনে যাই বলুন, মুখে হৃদ্যতা প্রকাশ পেল।—মেজাজ আপনার সেই থেকে বিগড়ে আছে দেখছি। টাকা ফেরত নিতে আসি নি আর বিশ্বাসও ঠিকই করব। এখন অনুগ্রহ করে কালকের মধ্যে আবার এটি করে দিয়ে আমাকে বাঁচান। নতুন অর্ডারটার দিকেও একটু নজর দেবেন। চলি, কেমন?

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। শয্যায় দেহ এলিয়ে দিল অবিনাশ। সরমা কাছে এসে বসল হাতল-বিহীন চেয়ারে।

বলবে কিছু—?

না, এমনি এলাম। সরমা ঝুঁকে মেঝে থেকে ছেঁড়া নক্সার টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিজের মনেই মিলিয়ে দেখতে লাগল আসলটার সঙ্গে।

অবিনাশ ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে তাকে। নক্সা মেলানো শেষ করে সরমা মুখ তুলতে বলল, খুশি হয়েছো বেশ, না?

অনেকটা নির্বিকার মুখেই সরমা জবাব দিল, চেষ্টা করছিলাম খুশি হতে, পারলুম না। চেয়ার ছেড়ে কাছে এসে দাঁড়াল, ওঠো—

দৃষ্টি জিজ্ঞাসু অবিনাশের।

আমার সামনেই ধরো এটা আবার, নইলে কালও এই জন্যে কথা শুনতে হবে।

অবিনাশ চুপচাপ কিছুক্ষণ। দেখছে।—ঠাট্টা করছ?

সরমা জোর দিয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ করছি তো ঠাট্টা, ওঠো। তার পরেই হেসে ফেলল মুখের দিকে চেয়ে।—আচ্ছা, তুমি এমন কেন?

অবিনাশের নিস্পৃহতায় ফাটল ধরল না তবু। কেমন?

তার মাথার কাছে বসল সরমা। অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে দু হাতের আঙুলগুলো চালিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে এমন প্রশ্রয় তুমি কেন দাও। ওই জন্যেই তো এতটুকু ভয়ডর নেই, যা মুখে আসে বলে বসি। বাঃ, চোখ বুজলে কি উঠবে না?

চোখ বুজেই শুয়ে থাকে অবিনাশ। নীরব স্বল্পক্ষণ।— আজ সত্যিই ক্লান্ত আমি, কাল ঠিকই আঁকব, তুমি বাড়ি যাও।

চুলের ফাঁকে আঙুল ক'টা থেমে গেল সরমার। দু'চার মুহূর্ত। অসহিষ্ণু ক্ষোভে বলে উঠল, বাড়ি যাও! মতলব আঁটচ মনে মনে আমি বুঝিনে? ও কথা বলে এলে কেন তখন?

চোখ মেলে তাকালো অবিনাশ। মুখে হাসির আভাস। নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়।—যা বলে এলাম, যদি না চাও তাহলে যে জন্যে তখন এমন বিকার ঘটে গেল দুজনেরই তার বোঝাপড়া আগে হওয়া চাই। নইলে মনের কালি যাবে না, আমারও না তোমারও না।

খানিক বাদে সরমা প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, তোমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারি এমন বড়াই করব না আর। মাপ চাইছি।

অবিনাশ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তাকে। গ্লানি মুছে যাচ্ছে একটু একটু করে।

গুড্। তারপর?

বিশ্বাস করো, বিপিনবাবুর সম্বন্ধে সঠিক কোন জবাব নিজেই পাইনি আমি, পেলে জানাবো।

মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট গার্ল। চুলগুলো জোরে টানো।

সরমাও হেসে ফেলল।—ওবিডিয়েণ্ট না হয়ে উপায় আছে! একটু আগে মিছেই বলছিলাম ভয়ডর নেই, তোমাকে যেমন ভয় করি তেমন আর কাউকে নয়।

সহাস্যে উঠে বসল অবিনাশ।—উত্তম, নক্সাটা শেষ করে ফেলি, তুমি বসে দেখো। ব্যাটাচ্ছেলে খুব বড় বড় কথা শুনিয়ে গেল—।

রেকর্ড কোম্পানীতে ভাটিয়া ম্যানেজারের বক্তব্য শুনে মণিময়ের সমস্ত সুর-লোক রোমাঞ্চিত। আগামী সপ্তাহে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা আসছেন গান রেকর্ড করতে। সে গানের সুর অবশ্য মহিলাটির ওস্তাদের দেওয়া। কোম্পানীর উদ্দেশ্য তাঁকে দিয়ে আরো কিছু বাংলা গান রেকর্ড করানো। কথাবার্তা পাকা। অতএব মণিময় যেন অবিলম্বে গোটাকতক বাংলা গান এবং তার সুর-ব্যঞ্জনা ঠিক করে রাখে।

গলা কেমন? মণিময় জিজ্ঞাসা করল।

এক্সকুইজিট্ ।...অ্যাণ্ড্ সি ইজ এ বিউটি ট্যু। ম্যানেজার সকৌতুকে হাসলেন, ইউ হ্যাভ টু গিভ ইওর বেস্ট দিস্ টাইম মিস্টার—।

মণিময় সবিনয়ে জানালো, গান এবং সুর নিয়ে সে প্রস্তুত। আগামী রেকর্ডিংএর দিন সে এসে মহিলাটির গলা শুনে যাবে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই দ্বিতীয় ধাক্কা। স্টুডিওতে এসেছে প্রযোজকের সঙ্গে দেখা করতে। নাম দেশাই, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ। এঁরই পদমূলে অবিশ্রান্ত তৈল সিঞ্চন করে এসেছে এতদিন। মণিময়ের নাটক মুদ্রণের ফলে ছাপা অক্ষরে নাম দেখে প্রযোজকের আস্থা জন্মেছে। সহাস্যে আপ্যায়ন করলেন, সুখবর আছে বাবুজি, বোসো—।

সুখবর কিছু থাকা সম্ভব মণিময় আগেই আঁচ করেছিল। বসল। কম্প্র-বক্ষ, নম্র-নেত্র।

কিন্তু সুখবর একটা নয়, একাধিক।

প্রযোজক প্রথম জানালেন, মিটিংএ সাব্যস্ত হয়েছে এবারে ওর নাটকখানা ধরা হবে।

নববধূর প্রিয় সম্ভাষণের মত লাগে। মণিময় দ্বিধান্বিত তবু।—অনেক মেহেরবাণী...কিন্তু ডিসিশান ফাইন্যাল তো?

ফাইন্যাল, আজই কণ্ট্রাক্ট হবে। প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞাসা করলেন, তার সুরের রেকর্ড বাজারে আজকাল কাটছে কেমন।

ধীরে রজনী, ধীরে। দ্বিতীয় সম্ভাবনায় মণিময় ঘেমে উঠল প্রায়। সবিনয়ে জানালো, ওটাই তার আসল লাইন, এবং আজও কতগুলি অর্ডার পেয়েছে।

প্রযোজক মনোভাব ব্যক্ত করলেন। নিজের বইএর মিউজিকের ভার নিতে মণিময় সাহস করে কি না, একটা চান্স ওকে দিতে তাঁদের আপত্তি নেই, তবে প্রথমবার টাকা অবশ্যই কম হবে, ইত্যাদি।

আহা! এসো এসো বঁধু এসো, আধেক আঁচোরে বোসো, অবাক অধরে হাসো। মণিময় স্বপ্ন-বিহ্বল ক্ষণকাল। সাহস! আত্মস্থ হল।—এ ভার যদি আমাকে দাও মিঃ দেশাই, বই উত্‌রে দেবার দায়িত্ব আমি নেব।

কন্ট্রাক্ট সই হল। ত্ব' হাজার টাকার অগ্রিম চেক্ নিয়ে বায়ু সাঁতরে ঘরমুখে ছুটল সে। চেক্‌টার স্পর্শ বুকে গরম ঠেকছে। প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে শাদা পরদায় নামের আলো। সুরশিল্পী মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়। অলিতে-গলিতে মোড়ে মোড়ে দেয়ালের গায়ে গায়ে বিজ্ঞাপন।

সুরশিল্পী···!

নাট্যকার··।

সায়েন্স কলেজ। ছাত্রছাত্রী এবং অভ্যাগতদের সমাবেশ। মালা গলায় ডাঃ সমাদ্দার মাঝখানে সমাসীন। সামনের সারিগুলির একদিকে ডাঃ চন্দ্র এবং অপর্ণা বসে। দূরে এক কোণে সরমা দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

মণিময় হারমনিয়ামে গানের প্রথমটা বাজিয়ে নিয়ে শুরু করল, 'সব সাঁচ মিলৈ যে সাঁচ হৈ, না মিলৈ সো ঝুঁট—'।

সঘন করতালি। অপর্ণা অস্ফুট মন্তব্য করল, বেশ মিষ্টি গলা তো, ভদ্রলোক কে?

চিনিনে। গান চন্দ্রর কানে গেছে এই পর্যন্ত। অন্যমনস্ক হয়ে ডাঃ সমাদ্দারের কথাই ভাবছিলেন তিনি।

সমাদ্দার উঠে দাঁড়ালেন। মালা খুলে টেবিলে রাখলেন। নড়াচড়া এমন কি দাঁড়াবার ভঙ্গিও উদ্বাস্ততায় চঞ্চল। সভা উৎকর্ণ। কম্পিত কণ্ঠস্বর আসতে লাগল মাইকের মধ্য দিয়ে।

ছেলে মেয়েরা, সবাই তোমরা ভাবছ কাজ থেকে আমি অবসর নিলাম। কথাটা ঠিক নয়। বরং কাজ করবার জন্যেই এখান থেকে ছুটি নিচ্ছি।··· প্রাণটুকু বাদ দিলে দেহের নাম যদি হয় মাটির জড় পদার্থ, তবে ওই জড় পদার্থকে ইচ্ছে মত শক্ত সবল সুস্থ রাখা যাবে না কেন? যাবে। আজ

আমার ডাক পড়েছে সেই সাধনায় যাতে প্রাণ-পুরুষের আবাস এই মানবদেহ সুস্থ সবল থাকবে দীর্ঘকাল। তোমরাও কলেজের পড়া শেষ করে তাড়াতাড়ি এসো আমার ল্যাবরেটারিতে। সত্যিকারের বিজ্ঞানীর ওটাই আসল জায়গা।

সভা ভাঙল। সমাদ্দার চলে গেলেন। সময় নেই। বিপুল উদ্যমের এক পাগলা ঘোড়া যেন অবিশ্রান্ত তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এখনি গিয়ে হয়ত ডুব দেবেন অ্যানাটমি অথবা বায়লজির দুরূহ সমুদ্রে।

গেটের সামনে চন্দ্র এবং অপর্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল সরমার। নমস্কার জানালো হাত তুলে। চন্দ্র বললেন, তোমাকে আমি দু'দিন ধরে খুঁজছি সরমা। ডাঃ সমাদ্দার তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। তাঁর বাড়ি চেনো ?

সরমা ঘাড় নাড়ল। পরে কৌতূহল দমন না করতে পেরে জিজ্ঞাসা করল, কেন স্যার ?

তাঁর কাছেই শুনো, দু'চার দিনের মধ্যেই যেও। অপর্ণা, এঁর নাম সরমা ব্যানার্জী, আমার ছাত্রী।

অপর্ণা সাগ্রহে দেখছিল তাকে। ওর প্রসঙ্গে বিপিনের সামনে চন্দ্রর সেদিনের বক্রোক্তিও ভোলেনি। হাসি মুখে বলল, আপনার কথা অনেক শুনেছি। বলতে ভয় করে···একদিন আসুন না আমাদের বাড়ি ?

সরমা সানন্দে মাথা নাড়ল যাবে। বলল, ভয় কেন ?

ছদ্ম গাম্ভীর্যে অপর্ণা জবাব দিল, আমি শাড়ির গল্প করতে পারি গাড়ির গল্প করতে পারি গান শোনাতে পারি বাজনা বাজাতে পারি—কিন্তু কেমিস্ট্রি ? ও বাবা ! আপনার জায়গা অনেক উঁচুতে।

ঈষৎ বিস্ময়ে সরমা চন্দ্রর দিকে তাকালো একবার। পরে বিব্রত মুখে বলল, ভয় তো আমাকেই পাইয়ে দিলেন দেখছি।

কিছু না, শিগগীরই আসা চাই একদিন। চন্দ্রকে বলল, চলো—

খানিকটা এগিয়ে এসে মন্তব্য করল, মেয়েটি বেশ।

চন্দ্র বললেন, তুমিও বেশ, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে ওর সে ধারণা হলনা বোধহয়।

মাথা খারাপ ভাবলে ?

বিচিত্র কি। আমারই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়।

অপর্ণা গম্ভীর মুখে সায় দিল, ভাবনার কথা, মাস্টার মশাইকে সান্ত্বনা দিতে এসে ছাত্রী না প্রিয় পাত্রী হয়ে দাঁড়ায়।

ছিঃ অপর্ণা!

সেদিনের বক্রোক্তির জের টানতে অপর্ণা মুখে যাই বলুক, ঈর্ষা করেনা কাউকে। তাই ক্ষুদ্র তিরস্কারটুকুও বিঁধল। তাদেরই একজন সে, যারা অপরকে সচেতন রাখবেই নিজের সম্বন্ধে। তার সারাদেহে রূপের ফাগুন, যে কোন পরিবেশে নিজেকে অনুভব করতে পারে প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু এই মানুষটির জীবনে সে একজন মাত্র, একমাত্র একজন নয়। রূপের মূল্য এখানেও মেলে অজস্র, কিন্তু সেই সঙ্গে মেলে আত্মভোলা উপেক্ষা। রূপের মূল্য মেলে— নিষ্ঠুর মূল্য, আর মেলে এমনি শান্ত অনুশাসন। অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া মনের। মানুষটাকে ভালবেসে মুগ্ধ করেছে, ভালবেসেই দগ্ধ করবে।

চন্দ্র ভাবেন শুধু, অপর্ণা এমন ছিল না আগে।

রেকর্ড কোম্পানী। মণিময় যথাসময়ে উপস্থিত। ম্যানেজার তার অপরিসীম ভাগ্যোদয়ের বারতা শুনেছেন। সহাস্যে করমর্দন করলেন।— কংগ্র্যাচুলেশানস্!

মণিময় মাথা নোয়ালো, ধন্যবাদ।

অতঃপর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি, দিন আসবে একদিন আগেই জানতেন, ধান দেখলে চালের বহরটা বলে দিতে পারেন, ইত্যাদি।

সুর বদলেছে। আগে ছিল মুরুব্বিয়ানা, খানিকটা অনুকম্পাও। মণিময় বিস্মিত হয়নি। পরিচিত মহল বিগত ক'টা দিন ধরে তাকে রাতারাতি বিখ্যাত করে তোলার নেশায় মেতে উঠেছে যেন।

ম্যানেজারের মনোভাব স্পষ্ট। সিনেমার গান এখান থেকে রেকর্ড হওয়া চাই, নইলে বোঝাপড়া আছে। নাট্যকার এবং সুরশিল্পীর ডবল ফাংশন যখন, তার কথা কেউ সহজে ফেলতে পারবে না।

মণিময় হাসল। অমায়িক হাসি। অনেক কিছু করতে পারি'র সঙ্গে কি আর করতে পারি গোছের বিনয়।

ম্যানেজার জানালেন, উক্ত মহিলাটি এসে গেছেন, এক্ষুনি গান 'টেকিং' হবে। মণিময়কে সঙ্গে করে নির্দিষ্ট ঘরে এলেন তিনি।

অপর্ণা চন্দ্র বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল বসে। আরো একজনের দৃষ্টির উষ্ণতা উপলব্ধি করে মুখ তুলল একবার। মণিময় চেয়েই আছে। আত্মবিস্মৃত আনন্দ এবং রোমাঞ্চ। ম্যানেজার অত্যুক্তি করেন নি

সেদিন। অপর্ণা চোখের সামনে কাগজ তুলে ধরল। বিরক্তির আভাস। কিন্তু কি মনে পড়তেই আবার তাকালো সোজাসুজি। কোথায় যেন দেখেছে…। মনে পড়ল।

অনতিদূরে রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা। বাদ্য-যন্ত্র পরিবৃত অর্কেস্ট্রা পার্টি প্রস্তুত। অপর্ণার ডাক পড়তে উঠে এলো। দু'চারবার ট্রায়ালের পর জড়তা সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

মণিময়ও খবরের কাগজ টেনে নিল একটা। একটু বাদেই বিশেষ একজন বলে পরিচিত হবে। সুগাম্ভীর্যটুকু দরকার।

হল রেকর্ডিং। বাজানার সরঞ্জাম রেখে অন্য সকলে চলে গেলেন। অপর্ণা পূর্বের আসনে ফিরে এলো। গানের রেশ মণিময়ের কানে লেগে আছে তখনো অন্তত মুখ দেখলে সেরকমই মনে হবে। ম্যানেজারের উৎফুল্ল প্রশ্নে চমক ভাঙল।

হাউ ডু ইউ লাইক ইট্ বাবুজি?

হিট্ করবে। ক্ষুদ্র মন্তব্য করল মণিময়।

ভালো হয়েছে অপর্ণাও উপলব্ধি করতে পারে, তবু খারাপ লাগে না শুনতে।

অতঃপর পরিচয় পর্ব শেষ করলেন ম্যানেজার।…মণিময় বন্দোপাধ্যায় ট্রেইনার, চিত্র নাট্যকার, মিউজিক্ ডাইরেক্টার—।

স্মিতহাস্যে যুক্ত-কর কপালে ঠেকালো অপর্ণা। বলল, সেদিন সায়েন্স কলেজে আপনার গান শুনেছি, খুব ভালো লেগেছে। এত-সব পরিচয় অবশ্য তখন জানতুম না।

তার সলজ্জ গর্বটুকু অপর্ণা উপভোগ করল বেশ। ম্যানেজার কাজের কথা পাড়লেন। এই মাসেই আর একটা সিটিং অপর্ণার, গান এবং সুর মণিময়ের। পাশের ঘরটাই ট্রেইনিং রুম, আজই একটু আধটু দেখেশুনে নিলে মন্দ হয় না। সৌজন্য প্রকাশ করলেন তৎক্ষণাৎ, বাট্ ফার্স্ট রেস্ট্ অ্যাণ্ড্ টী—।

চায়ের ব্যবস্থায় গেলেন তিনি। অপর্ণা বিব্রত মুখে বলল, এখানে বসে গানের সুর শিখতে হবে নাকি?

মণিময় বলল, নোটেশান একটু আধটু দেখে নেওয়া শুধু, আপনার গলায় ও জলভাত।

এ কাজটা বাড়িতে হয় না? এখানে ভারি অসুবিধে হবে আমার। অসুবিধের পরিমাণ অপর্ণার কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট।

বাড়িতে! মণিময় ভাবল একটু, তা হবে না কেন, কিন্তু এখানেই বা অসুবিধে কি? তা'ছাড়া ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড-মিউজিকের সঙ্গে সেট্‌ করতে হবে তো।

সে তো দু'ঘণ্টার কাজ। অপর্ণা হেসে বলল, বুঝেচি, আসল কথা বাড়িতে আপনাকে পাব কোথায়?

চা আসতে রুদ্ধ নিশ্বাসটা মুক্তি পেয়ে বাঁচে মণিময়ের।

বিদ্যুৎ-স্পর্শের মতো অকস্মাৎ একটা পরিকল্পনা মনে জাগে অপর্ণার। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখল লোকটিকে।

মণিময় বিপর্যস্ত।

ভাবছে অপর্ণা। কেমিস্ট্রি বই থেকে একজনের চোখ দু'টো ফিরিয়ে আনার এ সঙ্কল্পটা কেমন···। খুব অবহেলার নয়। সুবর্ণ যোগাযোগ। চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে মুখ তুলল আবার। চোখে কৌতুক-মাধুর্য।

মণিময় বিধ্বস্ত আবারও।

দু'চারদিন দেখলেই আমার গলায় আপনার গান ঠিক হয়ে যাবে বলে যদি সত্যিই মনে করেন, তবে আসুন না এক আধ দিন আমার বাড়ি? আপনার কষ্ট হবে জানি, কিন্তু এখানে বসে শেখা আমার দ্বারা হবে না। পাঁচ-জনের অনবরত যাওয়া আসা, নাঃ সে বড় বিচ্ছিরি···। আসবেন?

পকেট থেকে রুমাল বার করে মণিময় কপালের ঘাম মুছে ফেলল। 'অপর্ণাকে দেখেই বুঝেছে, গান তার শখের খোরাক মাত্র, রোজগারের নয়। অনুমোদন ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা'ছাড়া আমন্ত্রণও সুবাঞ্ছিত। হেসে জবাব দিল, যেতে বলেন একবার কেন দশবার গিয়ে বিরক্ত করতে রাজী আছি।

মনে মনে ভাবে অপর্ণা, সে ভয় নেই এমন নয়। মুখে বলল, খুশি হলাম। ···এই ধরুন সামনের রবিবার সকালে? অসুবিধে হবে?

চন্দ্র নিঃসন্দেহে বাড়ি থাকবেন সেদিন।

মণিময় জবাব দিল, কিছুমাত্র না, আরো আগে হলেও আপত্তি নেই।

ছদ্ম-খুশিতে রাঙিয়ে ওঠে অপর্ণা।—সাহিত্যিকদের বিনয়ের ধাঁচই আলাদা। আমার তো ডবল লাভ, গান শেখাও হবে আপনার মত মানুষকে জানাও হবে। কাব্যচর্চায় আনাড়ি বাধ্য হয়ে স্বীকার করব, নয়ত ধরা পড়ার ভয় আছে। কিন্তু রসাস্বাদনে একেবারে অপটু একথা মানতে রাজী নই, মোটা তর্ক জুড়ে দিয়ে আপনাকে রাগিয়ে দিতে পারি পর্যন্ত। হাসির ঝলকে নিজেই উছলে উঠল

অপর্ণা। ছোট দম ফেলে বলল, যাক্, রবিবার থেকেই শুরু করুন, নিষ্ফলা বার সবদিকে সুদিন।—আচ্ছা, কি বই প্লে হচ্চে আপনার?

দেশের মেয়ে। মণিময়ের চোখ মেলে তাকানো দায়।—সবে স্টার্ট পেয়েছি একটা, এরই মধ্যে এমন করে বললে লজ্জায় মারা যাব।

মনে মনে সায় দিল অপর্ণা, আধমরা তো করেই এনেছি, বাকিটা দেখা যাবে ধীরে সুস্থে। হেসে বলল, চলুন, সঙ্গে গাড়ি আছে, আমার বাড়ি চিনে নেবেন, তারপর ড্রাইভার পৌঁছে দেবে'খন আপনাকে।

কতগুলো দিন গেছে এর পরে। অপর্ণা উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করেছে কিসের। ব্যতিক্রমটুকু চন্দ্রর চোখে পড়ার কথা। কিন্তু পড়েনি। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল, খুশিতে যেন উপচে উঠেছে অপর্ণা। ঘরের মানুষের তাও চোখে পড়ার কথা। কিন্তু পড়েনি।

এই নির্লিপ্ততা অপর্ণা চেনে। এর পর হঠাৎ একদিন সচকিত হয়ে উঠবেন। সচেতন হবেন। দিন কতক ওর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগের পালা। তারপর বই ফেলে কাজ ফেলে কাছে আসবেন। কাছে টানবেন। এতটুকু ব্যতিক্রমও চোখ এড়াবে না তখন। অপর্ণা অনেককাল এরই জন্য অপেক্ষা করেছে, দিন গুনেছে। তারপর একটা প্রতিবাদ শুরু হয়েছে ওর ভিতরে ভিতরে। ঘড়ায় তোলা জলের সঙ্গে দুর্দম পিপাসিতের যেটুকু সম্পর্ক, দিনে দিনে সেটাই যেন বড় হয়ে উঠেছে অপর্ণার চোখে।

কিন্তু এই প্রথম বোধ করি মানুষটার বিগত কটা দিনের এই নির্লিপ্ততা বিনা ক্ষোভে বরদাস্ত করে গেল অপর্ণা। প্রায় নিশ্চিন্তে কাটালো। অন্যথায় ওর এই ক'টা দিনের প্রতীক্ষার তাড়না এবং আজকের এই খুশির বিড়ম্বনা দুই-ই অসময়ে ধরা পড়ে যেত।

অপর্ণা প্রস্তুত হল।

ইজিচেয়ারে শুয়ে চন্দ্র বই পড়ছিলেন। পাশের ঘরে অপর্ণার গলায় পরিচিত গানখানা শুনে কান পাতলেন। কিন্তু অবাক পরমুহূর্তে। অপর্ণা এ ঘরেই দাঁড়িয়ে। বইএর আলমারি ঘাঁটছে।

কি ব্যাপার?

কি? অপর্ণা বই হাতে ফিরে দাঁড়াল। নিস্পৃহ।

গাইছে কে ও ঘরে?

গ্রামোফোন।

আশ্চর্য তো, অবিকল তোমার মত, তোমারই ওই গানটা!

হুঁ। হাসি চেপে অপর্ণা চলে এলো। বক্র কটাক্ষে এ ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রেকর্ডখানা উল্টে দিল। পরে পড়তে বসল গম্ভীর মুখে। এ গান-খানাও চন্দ্র বহুদিন শুনেছেন অপর্ণার মুখে। দু'টোই বিশেষ প্রিয় গান তাঁর। বিস্ময়ের ধাক্কায় বিজ্ঞানের বই বন্ধ করতে হল। এ ঘরে এসে দাঁড়ালেন। গ্রামোফোনের পাশে বসে গম্ভীর মনোযোগে মাসিকপত্রর পাতা ওলটাচ্ছে অপর্ণা। গ্রামোফোন থামিয়ে রেকর্ডটা তুলে নিলেন তিনি। দু' দিকেই নাম লেখা, অপর্ণা চন্দ্র।

নির্বাক বিস্ময়।

অপর্ণা হেসে ফেলল। চন্দ্র বসলেন তাঁর চেয়ারের হাতলে।—হোয়াট্ এ সুইট্ সারপ্রাইজ! অ্যাঁ? কবে হল? কখন হল? কি করে হল?

অপর্ণা জবাব দেয়, রেকর্ড-কোম্পানীর লোকও তোমার মতই অবাক, এত-দিন হয়নি কেন, কি করছিলাম, কার পাল্লায় পড়েছি?

এক হাতে গ্রামোফোন রেকর্ড, আনন্দাতিশয্যে অন্য হাতে প্রবল আকর্ষণে অপর্ণাকে একেবারে কাছে টেনে আনলেন চন্দ্র। চড়া হাসিতে ঘর সরগরম। বলে উঠলেন, আমি সত্যিই যাচ্ছেতাই একটা, আমার স্ত্রীর এই কাণ্ড অথচ আমিই জানিনে!

অপর্ণার খুশি ধরে না। তাঁর হাত ছাড়িয়ে উঠে ড্রয়ার খুলে চেক বার করল একটা।—দেখো, এ টাকাটা অ্যাডভান্স করেছে আপাতত। চারটাকা দাম করেছে রেকর্ডটার, বাজারে ভালো কাটবে শুনছি।

খুশি হয়ে মাথা নাড়তে গিয়েও চন্দ্র থেমে গেলেন হঠাৎ। হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল। আনন্দের চিহ্ন বিলীন।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অপর্ণা। কি হল?

কিছু না।

ফিরে এসে চন্দ্র বই নিয়ে বসলেন আবার। অপর্ণাও উঠে এসেছে। নিরীক্ষণ করে দেখল একটু। ঈষদুষ্ণ প্রশ্ন করল, ব্যাপারটা খুলে বলোই না?

চন্দ্র জবাব দিলেন, যত আনন্দ হয়েছিল রেকর্ডে তোমার গান শুনে, ততটা খুশি হবার তেমন কোন কারণ নেই।

কেন? অপর্ণা বিস্মিত। বিরক্ত।

একটু থেমে চন্দ্র জবাব দিলেন, ওই গালার চাকতিটা বারোয়ারি সম্পত্তি

এখন, চারটে করে টাকা ফেলে দিলেই পাওয়া যাবে। রাস্তায় পানের দোকান থেকে রাতে নাচের আসর পর্যন্ত যার খুশি যতবার খুশি, খেয়াল মেটাতে বাধ্য ওটা।

শুনে গা জলে যায় অপর্ণার। ধৈর্য সংবরণ করল তবু, আর নিজেরা যখন অন্যের রেকর্ড কিনে আনি ?

খানিক চুপ করে থেকে চন্দ্র তেমনি শান্তমুখে বললেন আবার, নিজের স্ত্রী বলেই সত্যটা চোখে পড়ল। দেখো না, দুটো গানই এত ভালো লাগত আমার অথচ এখন আর তেমন লাগবে না। তোমারও হয়ত আর ও দুটো গাইতে ইচ্ছে করবে না। ওর স্যাংটিটি গেছে।

পড়ায় মন দিলেন। নির্বাক রোষে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে অপর্ণা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটু বাদে ওপর থেকে নিচের কঠিন মাটিতে একটা কিছু ভাঙার শব্দ শুনে চন্দ্র আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। ভিতরের গম্ভীর মাস্টারটি সভয়ে অন্তর্হিত। ওর এতবড় আনন্দটা এমন করে ভেঙে না দিলেই হত…। উঠে বাইরের রেলিংএ দাঁড়িয়ে দেখলেন, রেকর্ডটা ভেঙে ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে। এ ঘরে এসে দাঁড়ালেন। অপর্ণা সেলাই নিয়ে শুয়ে পড়েছে।

চন্দ্রর হঠাৎ গোঁ চাপল কেমন। বললেন, দেখো অপর্ণা, একটা কথা তোমাকে অনেকদিন বলব ভেবেছি, এত রাগ থাকা ভালো নয় মেয়েদের, আর সেটা আমার পছন্দও নয়।

ছিটকে উঠে বসল অপর্ণা, তোমার পছন্দ নিয়ে আমাকে চলতে হবে ?

তাই তো জানতুম। আমার বদলে ওই যে দুধ দেয় গয়লা তার পছন্দ মতো চললে ভালো বলবে না কেউ।

জবাবে অপর্ণা চোখ দিয়ে আগুন ছড়ালো। তারপর সেলাই হাতে শুয়ে পড়ল আবার।

ওটা রাখো এখন, মাথা ঠাণ্ডা হোক, নইলে সেলাইয়ের বদলে হাতে ছুঁচ ফোটানো সার হবে। রেকর্ডটা ভাঙলে কেন ?

আমার খুশি।

তোমার খুশি দেখে মনে হচ্ছে পারলে আমাকে সুদ্ধু ভাঙো ওমনি করে। আচ্ছা…এ তো আর গলার গান নয় তোমার, কলের গান—দেখি ক'টা ভাঙতে পারো। চন্দ্র বেরিয়ে এলেন।

অধরপ্রান্তে সারি সারি দাঁতের দাগ পড়ে গেল অপর্ণার।

রবিবার। যথাসময় মণিময় বাইরের ঘরে উঁকি দিল। সেটি'তে আধশোয়া মানুষটির মুখ বইএ ঢাকা। বারকতক পা ঘষা এবং কাশির শব্দেও চেতনা নেই।

শুনছেন ?

দেখুন—

রবিবার নিষ্ফলই যায় বুঝি।—শুনছেন ?

চন্দ্র সোজা হয়ে বসলেন। ভেতরে আসুন, কাকে চান ?

মিসেস্ অপর্ণা চন্দ্র এ বাড়ি থাকেন ?

চন্দ্র নীরব এক মুহূর্ত। থাকেন, আপনি ?

আমি মানে···আমার আসার কথা ছিল। অনুগ্রহ করে খবর দেবেন একবার···আমার নাম মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্র সকৌতুকে নিরীক্ষণ করলেন একটু। চাকরকে ডেকে আদেশ দিলেন অপর্ণাকে সংবাদ দিতে।—আপনাকে কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে। কোথায় বলুন তো ?

মণিময়ের অস্বস্তি কাটেনি তখনো। জবাব দিল, কোনো গানের আসরে যদি দেখে থাকেন—

গান! হ্যাঁ হ্যাঁ—ডাঃ সমাদ্দারের ফেয়ারওয়েলে আপনিই তো সায়েন্স কলেজে গেয়েছিলেন ?

মণিময় ঘাড় নাড়ল।

আপনাদের আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে জানতুম না তো! অপর্ণার ভারী ঝোঁক এদিকে, ভালো কাউকে গাইতে শুনলে কথা নেই। বসুন দাঁড়িয়ে কেন।

বাইরে থেকে কথাগুলো কানে গেল অপর্ণার। মণিময়ের জবাবও। —আমারই সুরে ওঁর নেক্স্ট গান রেকর্ড হবার কথা, কোম্পানীর স্টুডিওতে সুর ঠিক করে নিতে উনি লজ্জা পেলেন, তাই···। আপনি মিঃ চন্দ্র ?

অপর্ণা ঘরে প্রবেশ করল। ছোট্ট নমস্কার করে বলল, এসেছেন তা হলে, আমি ভাবলাম ভুলেই গেলেন।

চন্দ্র সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, তুমি ভাবলে কি বলো তো— একের পর এক আমাকে অবাক করে দিয়ে হার্টের রোগ ধরাবে নাকি ? সেদিনের এতবড়

খবরটা হঠাৎ পেলাম, আর এ সুখবরও দিব্বি চেপে গেছ!—এবার এমন রেকর্ড করিয়ে দিন মণিময়বাবু যেন আমি সুদ্ধু ফেমাস হয়ে উঠি।

মানুষটার নিরুদ্বিগ্ন হাসি দেখে অপর্ণা ভ্রূ-কুঁচকে তাকালো। পরে তেমনি হালক জবাব দিল, তা হতেও পারো। এঁর কাছে আমি গান শিখব ঠিক করেছি, অবশ্য ইনি যদি শেখান।

চন্দ্র সায় দেন তৎক্ষণাৎ, যদি আবার কি, রাজী না হলে তুমি ছাড়বে না মোটে।

অপর্ণার আহ্বানে মণিময়ের চেতনা ফেরে।—ওপরে চলুন!

মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে দাঁড়ায় সে। নিজের অজ্ঞাতে একবার শুধু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, বিশালকায় মানুষটি আবার আগের মতই পাঠমগ্ন।

কিন্তু ওপরে এসে অপর্ণার ব্যবহারে ভড়কে গেল কেমন। একটু আগের হাসিখুশির আতিশয্য স্তিমিত। তাকে বসতে দিয়ে সেও বসল অনতিদূরে। ঘরের এক কোণে গানের সরঞ্জাম। কিন্তু সেগুলো নিয়ে আসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

বেয়ারা চা নিয়ে এলো। কর্তব্য সম্পাদনের মত গম্ভীর মুখে পেয়ালায় দু'চারটে চুমুক দিয়ে মণিময় বলল, তা হলে বসা যাক—। নোটেশান পরে দিচ্ছি, গানের বাণীটা দেখে নিন আগে।

পকেট থেকে গানলেখা কাগজ তার হাতে দিল।

অপর্ণা নিঃশব্দে পড়ল সেটা।—বেশ। এক ঝলক হেসে পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এলো যেন।—চা শেষ করুন আগে, পরে আপনার দুই-একখানা গান শুনব। ওই জন্যেই আপনাকে বাড়ি নিয়ে আসা নইলে রেকর্ডে গান-টান আর দেব না আমি।

সে কি!

নাঃ, ভালো লাগে না।

মণিময় হতভম্ব। মনে হল অনেক উঁচু থেকে হঠাৎ বুঝি নিচে পড়ে যাচ্ছে। মস্তিষ্কে গোলযোগ আছে কি না এ সন্দেহও জাগল একবার।

কণ্ট্রাক্ট সই করেছেন, গান না দিলে রেকর্ড কোম্পানী ছাড়বে কেন?

অপর্ণার রেগে উঠতে এটুকুই যথেষ্ট।—না ছেড়ে তারা করবে কি? কণ্ট্রাক্ট সই করা হয়েছে বলে চুরি করা হয়নি। উঠে বাক্স থেকে হারমনিয়াম এনে রাখল তার সামনে। নিন, আপনার বেলা হয়ে যাচ্ছে।

মণিময় স্তব্ধ। একটা তিক্ত অনুভূতি ধীরে ধীরে সচেতন করল তাকে। নাট্যকার, মিউজিক ডাইরেক্টার—এক ডাকে ছুটে এসেছে। কিন্তু এই মহিলাটির কাছে কোন দাম নেই তার। তবু এও বুঝল, হঠাৎ এ সিদ্ধান্তের মূলে নিগূঢ় কোন হেতু আছেই।

হেসে বলল, সেদিন আপনার আগ্রহ দেখে হাতের কাজ ফেলেই ছুটে এলাম, কিন্তু কে জানত এমন ছেলেমানুষি কাণ্ড! অপর্ণার সবিদ্রূপ দৃষ্টি'তে আত্মবোধ চাড়িয়ে ওঠে আরো।—কিন্তু আপনার অনুরোধ এখন রাখতে পারলুম না। গান শোনাবার জন্য গান গাইবার সময় আমি কমই পাই। তবু, আবার কোথাও গাইতে গেলে আপনাকে আগে খবর দেব, এখন উঠি।

ব্যর্থ গেল না। অপর্ণাকে যথার্থই স্মরণ করতে হল মানুষটি সুগায়ক, সুরশিল্পী এবং নাট্যকার। বিশেষ করে, তার আমন্ত্রিত। অপ্রস্তুত হয়ে বলল, গান না শোনালে ছাড়ছি না, নিশ্চয় আপনি রাগ করেছেন, নইলে এ সময়টার অপব্যবহার হবে জেনেই এসেছেন।

না। মণিময়ের নতুন মর্যাদাবোধের ওজন কম নয়। জবাব দিল, নিজের স্বার্থেই এসেছিলাম। আপনার রেকর্ড হিট্ করবে সেদিনই জানি। আশা ছিল, তেমন সুর তুলে দিতে পারলে আপনার গলায় আমার গান বাজার গরম করে দেবে। ভাবল একটু। চেষ্টা-চরিত্র করে আরো লোভনীয় একটা প্রস্তাব নিয়ে উড়তে উড়তে এসেছিল। সেই টোপটাও ফেলল প্রায় নিস্পৃহ মুখেই। বলল, তা'ছাড়া ওই এক রেকর্ড শুনেই 'দেশের মেয়ে'র প্রডিউসার এক কথায় রাজী আপনার সঙ্গে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের কণ্ট্রাক্ট করতে। এতটা আশা এবং ব্যবস্থা একেবারে পণ্ড করে দেবেন কে জানত।…কিন্তু হঠাৎ মত বদলালেন কেন বলুন তো ?

কানের কাছটা উষ্ণ ঠেকছে অপর্ণার। গ্রামোফোন রেকর্ডে তার গানের ছড়াছড়ি। তারই কণ্ঠগীতে মুগ্ধ নির্বাক প্রেক্ষাগৃহের শত সহস্র দর্শক। নামের পূজা, যশের অর্ঘ্য। বর্তমানের এই পারম্পর্যহীন একটানা জীবন-যাত্রার সঙ্গে চকিতে তুলনা করে নিল একবার। আতপ্ত অনুভূতি। সোজাসুজি তাকালো মণিময়ের দিকে। হাত বাড়িয়ে বলল, দিন নোটেশান—

রেকর্ডএ গাইবেন ?

হ্যাঁ।

সিনেমার ব্যাকগ্রাউণ্ডএ ?

আপত্তি নেই।

বিনুকে যথার্থই কন্‌ভেন্ট্-এ পাঠিয়ে দিয়েছে মণিময়। সরমা বাধা দেয় নি। পারে যদি চালাতে ভালোই। ছেলেটা মানুষ হবার সুযোগ পাবে। তবু, সে চলে যাওয়ায় মন ভালো ছিল না। মণিময়ও বাড়ি নেই।

ডাঃ সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা করা হয়নি আজও। সেখানেই যাবে স্থির করল। গলির বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবিনাশ আসছে।

কোথায় ? ছদ্ম হতাশা অবিনাশের চোখে মুখে।

সরমা বলল, মেরিন লাইনস্‌এর দিকে। সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, ভুলে গেছি। তোমার তাড়া নেই তো কিছু ?

না। হালকা হেসে অবিনাশ তাকালো তার দিকে, মুখ শুকনো কেন ?

ঈষৎ হেসে সরমাও তেমনি জবাব দিল, যেমন তোমার চোখ—ঘরে গিয়ে বোসো, এই চাবি নাও, আমি শিগগীরই ঘুরে আসছি।

নির্দিষ্ট জায়গায় বিরাট বাড়িটির ভিতরে এসে সরমা জনপ্রাণী দেখতে পেল না। বাইরের দিকে প্রকাণ্ড হল্। সায়েন্স কলেজের মতই ল্যাবরেটারির বিপুল সরঞ্জাম। মাঝে মাঝে এক একটা বড় বড় ডেস্ক্ সাজানো। সরমা সাগ্রহে দেখতে লাগল। কোণের দিকে খাটিয়া পেতে একজন লোক ঘুমুচ্ছে। সম্ভবত দরোয়ান। ডেকে তুলল। সরমাকে দোতলায় উঠে যেতে বলে সে পাশ ফিরে নাক ডাকাতে লাগল আবার।

ডাঃ সমাদ্দার নিবিষ্ট চিত্তে কিসের চার্ট তৈরী করছেন একটা।

ভিতরে আসব স্যার ?

চশমা কপালের ওপর তুলে ভ্রূ কোঁচকালেন তিনি। স্বগত বিস্ময়। অ্যান্ এঞ্জেল ফ্রম্ হেভেন্! এসো—

সরমা ঘরে প্রবেশ করল।

বোসো। দেখলেন একটু। এই···কে যেন তুমি ?

সরমা হেসে ফেলল, চিনলেন না ?

চোখ মুখ কুঁচকে ওকে নিরীক্ষণ করে দেখলেন আবার। হেসে উঠলেন হো-হো শব্দে।—আই উইশ সাম্‌বডি কুড্ ব্লো মাই ব্রেইন্‌স্ আউট, এরই মধ্যে এমন ভুল! তুমি তো সরমা ব্যানার্জী, আমাদের চন্দ্রর চন্দ্র—বোসো, বোসো!

সরমা আরক্ত। চুপ করে বসল তাঁর সামনে।

হাতের কাজ রেখে তার মুখোমুখি বসলেন তিনি।—আমার নতুন রিসার্চএ আসতে চাও?

নিলে তো খুশি হয়ে আসি স্যার।

নো মাই ডিয়ার, নো ফেভারিটিজম্, কাজ জানো?

কাজ না জানুক, এই মানুষটির সঙ্গে কথা কি করে বলতে হয় জানে। জবাব দিল, কাজ করলাম কোথায়, পড়চি তো! বি. এস্‌সিতে ফার্স্ট-ক্লাস পেয়েছিলাম, এম. এস্‌সিতেও পাব আশা করি।

ছাটস্ নো কোয়ালিফিকেশান। তড়বড়িয়ে উঠলেন তিনি, বিনে মাইনেয় খাটতে পারবে? ভেরি ভেরি হার্ড লেবার—?

সরমা নিরীহ মুখে পাল্টা প্রশ্ন করে, ঘরের বৌ-ঝি'দের মত?

হোয়াট্! রাগতে গিয়ে হেসেই ফেললেন পরক্ষণে।

ইউ সিলি গার্ল! সমনোযোগে দেখলেন তাকে।—সত্তর বছরের কুমার আমি, এবার নিজের গিন্নিই করব তোমাকে। এসো আমার সঙ্গে—

হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন সিঁড়ির দিকে। আমার সাবজেক্ট শুনেছ?

সরমা ঈষৎ বিব্রত।—ঠিক জানিনে।

প্রায় ধমকেই উঠলেন যেন সমাদ্দার।—ওঃ তুমি তো খুব রিসার্চ করবে দেখছি। নিচে নামতে লাগলেন, গড়পড়তা ছাব্বিশ বছর পরমায়ু এ দেশের মানুষের, বড় কাজ তারা করবে কখন গো? সময় কোথায়! অথচ কেন বাঁচবে না তারা সত্তর বছর আশী বছর একশ বছর। ভেবে দেখেচ কখনো?

সরমা ভয়ে ভয়ে চুপ করে থাকে। কিছু বলতে যাওয়া নিরাপদ নয় জানে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আড় চোখে দেখে। বৃদ্ধের মুখে উত্তেজনায় মেশা আকুতিটুকু ভারী সুন্দর মনে হয় তার।

ল্যাবরেটারি। দরোয়ান হয়ত ঘুমের মধ্যেও প্রভুর পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। নিদ্রার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বসে আছে। সমাদ্দার রেহাই দেবেন না তবু।—কি বাবা, ঘুমুচ্ছিলে?

সকলের বড় ডেস্কটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, এখানে আমি কাজ করব। পাশেরটা দেখালেন, এটা চন্দ্রর। যতদিন সে না আসে খালি থাক, ক'দিন আর অবাধ্য হবে আমার। সেদিন আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছি—আরে

বাবা, কারখানার টনিক বিক্রির টাকা দিয়েও তোর মত দশটা লোক পুষতে পারি সারা জীবন, চাকরির মায়া কিসের ? কি বলো ?

হাসলে বিপদ, সায় দেওয়াও মুশকিল। ল্যাবরেটারি দেখার আগ্রহে সরমা জবাব এড়িয়ে বাঁচে।

এই ডেস্কগুলি আর সব অ্যাসিস্ট্যান্টদের। চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে কি ভাবলেন তিনি, আর ওই সকলের শেষে সবচেয়ে ছোট ডেস্কটা হবে তোমার। ওখানে থেকে গিন্নির মত সব কাজ এগিয়ে দেবে। তোমার খাওয়া পরা থাকার ভার আমার, এর বাইরে এখন আর পাবে না কিছু। রাজী ?

সরমা হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল। রাজী।

গুড্। এখন ভালো করে পরীক্ষার জন্যে তৈরি হওগে যাও। দু'তিন মাস লাগবে এখানে কাজ শুরু হতে, তখন ডেকে পাঠাব। সাদা-সাপটা বিদায় দিয়ে তুরতর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন আবার।

বিরক্তিতে মণিময়ের গোটা মুখ বিকৃত। হাতে কাগজ কলম। কিন্তু বিছানায় অবিনাশ শয়ান। চক্ষু নিমীলিত। ঠেলতে শুরু করল, এই এখানে ঘুমুচ্ছিস কেন, ওঠ্ !

প্রত্যুত্তরে নাসিকাগর্জন। অগত্যা মেঝেতে বসেই লেখায় মন দিল সে।

সরমা ফিরে আসতে অবিনাশ ধীরে সুস্থে উঠে বসল। এসো, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।

মনোযোগ অপঃসৃত মণিময়ের।—তুই ঘুমুস নি ?

না।

তোকে যে ডাকলুম এতবার ?

শুনেছি।

মণিময় মারমুখী। অবিনাশ নিরীহ মুখে বলল, কি জানি বাবা, না ঘুমুলে এমন রেগে যাবে জানলে ঘুমিয়েই থাকতুম।

মণিময়ের যত রাগ গিয়ে পড়ে সরমার ওপর। গর্জন করে ওঠে, আলাদা বাড়ি দেখছি আমি, ও যদি সেখানে যায় তো খুন হয়ে যাবে বলে দিলাম তোকে।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে তাড়াতাড়ি জামা পরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। সম্ভব হলে আজই অপর্ণাকে স্টুডিওতে নিয়ে যাবে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিকের ব্যবস্থা পাকা করতে।

সরমা বলল, এখন আর ঠাট্টা নয়, নাটক ছবি হচ্ছে, তার ওপর মিউজিক ডাইরেক্টার—কোন কথা সহ্য হবে না। ছেলেটাকে তো সত্যিই দিলে পাঠিয়ে। ...চা খাবে নাকি ?

থাক। সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা হল ?

পাশে বসল সরমা।—শুধু দেখা, তাঁর নতুন ল্যাবরেটারিতে গিন্নির পদে পাকা হয়ে এলাম পর্যন্ত।

অবিনাশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সেদিনের মাপ চাওয়া ভুলে গিয়ে মাথা খারাপ করো না আবার। আর এক জায়গায় ও পদটা যে খালিই থেকে গেল সে সম্বন্ধে ভাবলে কিছু ?

কি জানি বাপু, জানিনে আমি—। এই মুহূর্তে এই কথাটাই তুলবে অবিনাশ, সরমা ভাবেনি। বিরক্ত হল। অন্তত চেষ্টা করল বিরক্ত হতে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা মীমাংসার তাড়নায় সেই থেকে ভুগছে নিজেও। ভেবেছে। ভাবছে। তার এ ভাবনায় এক অবিনাশ ছাড়া আর দোসর নেই কেউ। কিন্তু ওর সঙ্গেই এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার মত এমন অস্বস্তিও আর নেই বুঝি।

নিমেষের স্তব্ধতা। অবিনাশ যথাপূর্ব শান্ত আবার।—খবর দিই বিপিনবাবুকে ?

সরমা নীরব অনেকক্ষণ। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বলো ?

অবিনাশ হাসল।—ইচ্ছে ষোল আনা, অথচ বলাটা চাপাবে আমার ঘাড়ে!

না, তুমি ভেবে বলো। ঈষৎ জোর দিয়ে বলল সরমা।

ভেবেছি। শান্ত মুখে নিজের মতামত ব্যক্ত করল অবিনাশ, মানুষটি একটু আত্মম্ভরী বটে, তবে খারাপ মনে হয় না।

সরমা চকিতে তাকালো একবার তার দিকে। পায়ের একটা আঙুল মেঝেতে ঘষতে লাগল চুপচাপ। পরে আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু আমার যেন কেমন ভয় করছে অবিনাশ...।

ভয়! অবিনাশ অবাকই হল যেন। একটু থেমে হাল্কা করে বলল, তোমার সকলের বড় পুঁজি নিজের ওপর আস্থা, এ যদি হারাও একটা বড় জিনিসই হারাবে।

কথা মাস্টারির মত শোনাবে এর পরে। অবিনাশ উঠে পড়ল। নিজের ছেঁড়া ঝুলির শূন্যতা ভরাতে কোনদিন চেষ্টা করেনি। প্রত্যাশাও ছিল না

কিছুরই। তবু উন্মনা হয়ে পড়ে কেমন। নিরবচ্ছিন্ন ছুটির আস্বাদন একটা। বোঝার মত লাগছে।

দাবির শিকলটা ছিঁড়েছে।

কিন্তু ওর একটা টুকরো যেন আটকে আছে কোথায়। নড়তে চড়তে লাগে।

চন্দ্র সোৎসাহে আপ্যায়ন করলেন, অবিনাশ যে! এসো, এসো—

ঘরের অন্য দু'জন মণিময় এবং অপর্ণা। সাড়া না দিয়ে ঢুকে পড়ে অবিনাশ বিব্রত বোধ করল। কিন্তু তার চেয়েও বেশি অবাক মণিময়কে দেখে। নাট্যকারের মুখেও বিস্ময় এবং সঙ্কটের সুস্পষ্ট ছায়া। গান শেষে গল্পগুজব চলছিল। অপ্রত্যাশিত এই মূর্তিমান বিঘ্ন।

বিস্ময় কাটিয়ে সপ্রতিভ মুখে অবিনাশ বলল, অন্যায় করলাম বোধ হয়, তবু এসে যখন পড়েছি বসবই। কিন্তু মণিময়দা তুমি এখানে?

মণিময় সামলে নিয়েছে সকলের অগোচরে।—আমিও তো তোকে এ কথাই জিজ্ঞাসা করতে পারি।

পারো। তড়বড় করে একটা ফিরিস্তি দিয়ে গেল যেন অবিনাশ। ইনি মাস্টারমশাই, আমার রোগশয্যায় এঁর দিবারাত্র তদবিরে ভয় পেয়ে বলেছিলাম, বৌদি হয়ত রাগ করে মুণ্ডুপাত করছেন আমার—প্রতিবাদে মাস্টারমশাই চোখ রাঙিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, স্বয়ং এসে বৌদির হাতে এক পেয়ালা গরম চায়ের দণ্ড নিতে। হেসে ফেলল, কিছু মনে করবেন না মাস্টারমশাই, মণিময়দা সাহিত্যিক মানুষ, কাব্য করে বললে ভারী খুশি হন।

অপর্ণা আর একদিন একে দেখেছিল আড়াল থেকে। হাসতে লাগল মৃদু মৃদু। চন্দ্র বললেন, এবারে আপনার জবাবদিহির পালা মণি[illegible]বাবু।

রসালো জবাবদিহি করল মণিময়ও। অবিনাশকে উদ্দেশ্য করে বলল, মিসেস্ চন্দ্র যদি তোর মুণ্ডুপাত করে থাকেন, আমার করছেন ডাঃ চন্দ্র। তুই অসুখে তাঁকে আটকে রেখেছিলি, আমি এঁকে আটকে রাখছি গানে। দণ্ডও তোর আমার এক, আমারটা হয়ে গেছে, তোমারটা বাকি, অতএব তুমি বোসো আমি চললাম।

অদম্য উচ্ছ্বাসে অবিনাশ তার পিঠ চাপড়ে বলে উঠল, পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলব এর পরে, আর বোলো না!

চিরাচরিত উষ্ণ ঝাঁজটুকু দমন করতে হল। সম্মানটা বেঁচেছে এখনো, আর মুহূর্ত মাত্র অবস্থানও সুবিবেচনার কাজ হবে না। মণিময় বিদায় নিল।

কলকণ্ঠে এই হাস্য-পরিহাসের পর হঠাৎ যেন লজ্জা পেয়ে গেল অবিনাশ।

অপর্ণাকে বলল, নমস্কার বৌদি, এ উৎপাত দেখে হয়ত বা ভড়কে গেছেন, গাছ থেকেই নেমে এলো নাকি। চেহারাটিও আবার তেমনি কিনা। গম্ভীর।—আমার নাম অবিনাশ, অর্থাৎ বিনাশ নেই—একই ক্লাশে সাত বছর জবাই হয়েছি মাস্টারমশায়ের হাতে, তবু না।

চন্দ্র সহাস্যে প্রতিবাদ করলেন, বাড়িয়ে বোলো না, আমার হাতে মোটে দু'বছর ছিলে তুমি।—ওকে ছেড়ো না অপর্ণা, সত্যিই ও তোমার নামে অপবাদ দিয়েছিল।

বিগত দিনের সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গ একটু যেন অস্বস্তির কারণ। অপর্ণা অনুভব করছে, হাসিমুখে যে ছাত্রকে বন্ধু বলে কাছে টেনে নিয়েছেন চন্দ্রর মত রাশভারী শিক্ষক, সে লোকটি অবহেলার নয়। ভালোও লাগল। বলল, অপবাদের জন্যে না হোক, তোমাকে কাজ আর পড়া থেকে কিছুটা বিশ্রাম দেবার জন্যেও এঁকে মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন করতে আমার আপত্তি নেই।

অবিনাশ সায় দেয় তৎক্ষণাৎ, অপরকে বিশ্রাম দিতে সারা বোম্বাই শহরে এমন আর দু'টি পাবেন না। পরীক্ষার খাতায় গোল্লা বসালেও এই বিদ্যেটির জন্য মাস্টারমশায়ের একটা বড়সড় টাইটেল দেওয়া উচিত আমাকে। থেমে অপর্ণার দিকে তাকালো সে, কিন্তু মণিময়দা ও কি বলে গেলেন, আপনাকে গান শেখাচ্ছেন তিনি?

চন্দ্র জবাব দিলেন, এবার ওঁরই সুরে গান রেকর্ড করবার কথা। তুমি মণিময়বাবুকে চেনো কি করে?

জবাব এড়িয়ে অবিনাশ চোখ কপালে তুলে ফেলল প্রায়।—তাহলে তো বেশ বড় ব্যাপার! চেহারার মত রুচিটাও আমার নীরস নয় বৌদি, একেবারে বাদ যাবো?

অপর্ণা হেসে ফেলল।—দাঁড়ান, সবে তো একদিনের আলাপ, দু'চারদিন যাক আরো তারপর বিবেচনা করব। আসছি—

একটু বাদেই বেয়ারা চা এবং খাবার এনে রাখল টেবিলে। চন্দ্র খাবারের ডিস এগিয়ে দিলেন অবিনাশের দিকে।

মাস্টারমশাই—। কিছু একটা বলবে অবিনাশ, কিন্তু কি ভাবে বলবে সেটাই যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না।

বলো।

একেবারে এমনি আসিনি, কথা ছিল।

চন্দ্র নীরব, জিজ্ঞাসু।

অনেকদিন আগে বিপিনবাবু আমার কাছে গিয়ে হাজির, আপনি নাকি বলে দিয়েছেন, আমার মধ্যস্থতায় সরমার সঙ্গে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা হতে পারে। সরমার অমত নেই দেখলুম, তবু ফিরে ও আমার কাছেই পরামর্শ চাইলে। এখন পরামর্শ দেবার দায় সত্যিই যদি কারো থাকে, সে আপনি।

চন্দ্র চেয়ে থাকেন তার মুখের দিকে। জবাব দিতে হবে ভুলে গেলেন। বিজ্ঞানীর চোখে হয়ত ধরা পড়েছে এমন কিছু যা অবিনাশকে দেখলে বুঝবে না কেউ। অন্যমনস্ক…। ওর জন্য চা ঢালতে গিয়ে শুধু পেয়ালা ছাড়া ট্রের আর সর্বত্রই ঢাললেন চা। বিব্রত মুখে বললেন, এ আবার কি করলাম!

অবিনাশ দেখছিল। অল্প হেসে পেয়ালা পটএর মুখে এগিয়ে দিল।—আপনার কাছে আসার আগে একটা ভয় ছিল মাস্টারমশাই, সহজ হবার তাগিদে পাছে সহজের সীমা ছাড়িয়ে যাই। মিথ্যে সে চেষ্টা করব না আর, চা ঢালার বিভ্রাট দেখেই বুঝেছি আপনার চোখকে ফাঁকি দেব এত বিদ্যে নেই। …তবু, আমার কথা না ভেবে সরমার ভালমন্দ চিন্তা করেই জবাবটা দিন।

মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে অপর্ণা ঘরে প্রবেশ করল আবার। ট্রের ওপর চায়ের ধারা চোখে পড়তে অবাক।

ও কি?

বিড়ম্বিত মুখে চন্দ্র বললেন, পড়ে গেল কেমন—

অবিনাশ বলল, মাস্টারমশায়ের দোষ নেই বৌদি, সাত বছর পড়াবার পরেও চতুষ্পদ-বিশিষ্ট কেউ নই আমি, হাতও আছে দু'টো, এ সব সময় মনে থাকে না। বাধা না দিলে সবটুকু চা-ই উনি ট্রেতে ঢালতেন।

চন্দ্র হাসলেন একটু।

এ আত্ম-বিস্মৃতি অপর্ণা চেনে। একটা রুক্ষ ছায়া নামে মুখে। এ অন্যমনস্কতায় আর একটা নাম জড়িত। বাইরে থেকে এইমাত্র শুনেছে সেই নামটা। অবিনাশকে লক্ষ্য করে টিপ্পনী কাটল, দিন দুপুরে সব অন্ধকার দেখচেন, কি ব্যাপার?

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তাই তো দেখবেন, বিক্রম কি এ মূর্তির কম নাকি—জেনেশুনে আপনি গেলেন কেন ঘর ছেড়ে!

অপর্ণা চেয়েই আছে। সপ্রতিভ রস-সৃজন-পটুতার প্রশংসাই করল মনে মনে।

বুঝলাম।...তারপর, কি নিয়ে কথা হচ্ছিল আপনাদের ?

ওঁর এক বিশেষ ছাত্রীর বিয়ের সম্বন্ধে পরামর্শ করছিলাম।

বিশেষ ছাত্রী কি রকম ?

অবিনাশ বিব্রত মুখে হেসে ফেলল।

ব্যাপার মন্দ নয় তো! হেসে ওঠে অপর্ণাও, ওঁর বিশেষ ছাত্রীর বিয়ের সম্বন্ধে আপনি এসেচেন পরামর্শ নিতে—বিশেষ ছাত্রীটি আপনারও বিশেষ কেউ হন নিশ্চয় ?

অবিনাশ নিরুপায়।—বৌদিকে ওকালতি পাশ করিয়েছেন নাকি মাস্টার-মশাই ?

তাই তো, এমন প্রাণান্ত অবস্থা আপনাদের। একটা ধারালো উচ্ছলতা দেখা দেয় অপর্ণার মুখে।—আচ্ছা, চলুক তাহলে পরামর্শ, বাধা দেওয়া উচিত নয়। আমার আবার কাজ আছে একটু—তার আগে কাউকে পাঠিয়ে দিই ট্রে-টা সরাবে, নয়ত পরামর্শের গরমে ওটা এবার টেবিলে ওলটানো আশ্চর্য নয়।

হাসতে হাসতে চলে গেল। কিন্তু হাসিটা তেমন প্রাঞ্জল ঠেকল না অবি-নাশের চোখে।

অবিনাশ—। ডাঃ চন্দ্র আত্মস্থ হলেন যেন।

বলুন।

বিপিনকে তোমার কাছে যেতে বলেছিলাম যখন, কিছু না ভেবেই বলে-ছিলাম। তুমি রাগ করো নি ?

না।

এ ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয় ?

অবিনাশ সকৌতুকে খানিক চেয়ে রইল তাঁর দিকে। পরে জবাব দিল, একটু আগেই তো বললাম, আমায় বাদ দিয়ে ভাবুন। আর কোন ব্যবস্থার দরকার আছে কি না আপনিই ভালো বুঝবেন, বিপিনবাবুকে তেমন করে জানিনে আমরা।

একটু ভেবে চন্দ্র শান্ত মুখে বললেন, সরমার মত মেয়ে ও বাড়িতে খাপ খাবে কি না বলা শক্ত অবিনাশ।...তবে, বিপিনকে যতটুকু জানি, লোক খারাপ নয়।

অবিনাশ চলে গেল।

চন্দ্র একা বসে চুপচাপ। একটু আগের হাসিখুশির আবহাওয়ায় কেমন যেন বিরস ছেদ পরে গেছে একটা। ভালো লাগছে না। উঠে পায়ে পায়ে ভিতরে এলেন তিনি।

অপর্ণা স্টুডিওতে ফোনে কথা বলছে মণিময়ের সঙ্গে।—আসুন একবার, আপনার প্রডিউসারের সঙ্গে ব্যাক্‌-গ্রাউণ্ড গান নিয়ে আজই আলাপ করতে আপত্তি নেই।…অ্যাঁ? না ভুল বলেছি, হবে সময়—কোন কাজ নেই, আসুন।

চন্দ্রর উপস্থিতি অনুভব করে একটু জোরেই বলল কথাগুলি। রিসিভার রেখে ফিরে দাঁড়াল। দেখল একটু।—শেষ হল পরামর্শ?

হুঁ। আরাম কেদারায় শুয়ে খবরের কাগজ হাতে নিলেন চন্দ্র।

অপর্ণা কটাক্ষে তাকালো আবারও।—কূলকিনারা পেলে কিছু?

চন্দ্র নিরুত্তরে কাগজ পড়তে লাগলেন।

॥ ৮ ॥

বিপিন চৌধুরী আর যায়নি অবিনাশের কাছে। প্রথম সাক্ষাতে খুশি নয়। নিজে থেকে আবার দেখা করতে সম্মানে লাগে। দিন কতক গুম হয়ে কাটিয়ে কাজে মন দিল আবার। শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গোলমেলে কানা-ঘুষা শুনছে কিছু।

ঘনশ্যামবাবু সংবাদ দিলেন, কে একজন অবিনাশ মুখুজ্জে টেলিফোনে খোঁজ করছিলেন একটু আগে।

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত ফাইল থেকে মুখ তুলল বিপিন।

আপনি নেই শুনে জিজ্ঞাসা করলেন কখন পাওয়া যেতে পারে। বললাম, ঠিক নেই।···একবার দেখা করতে বললেন আপনাকে।

কাজ মাথায় থাকল। কোট গায়ে ফেলে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করল বিপিন। সহকর্মী প্রথমে হতভম্ব, পরে বীতশ্রদ্ধ। বর্তমানে তার কার্য-পদ্ধতি মনঃপূত নয় মোটেই।

সাত মাইল পথের ব্যবধানটুকু বিরক্তিকর রকমের দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে বিপিন চৌধুরীর। যে বেগে মোটর ছুটেছে প্রায় ভয়ের কারণ। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। প্রত্যাশার তাড়নায় স্থৈর্য বিড়ম্বিত।

কোনরকম ভূমিকা না করে অবিনাশ শান্ত মুখে বলল, সরমার সঙ্গে দেখা করুন।

কবে ? বিপিন দম নেবার অবকাশ পায়নি তখনো।

আজ কাল, যেদিন খুশি। অবিনাশ নির্লিপ্ত। ছবি আঁকছে।

বিপিন নড়ে চড়ে বসল একটু। দ্বিধা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বলেছিলেন···?

হ্যাঁ, আপনি যান তার কাছে।

বিপিন তবু অপেক্ষা করে একটু। নিস্পৃহতা চক্ষুশূল। অবিনাশ নক্সা আঁকছে একমনে।

অর্থাৎ, আর কথা নেই কিছু। ওর যা বলার বলেছে। এবং এইটুকুই সব। উঠতে হল বিপিন চৌধুরীকে। এর পরে আর বসে থাকাও বিসদৃশ।

নক্সা আঁকছে অবিনাশ। নিবিষ্ট-চিত্তে। স্বেচ্ছায় যে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল সেদিকে আর পিছু ফিরে চাওয়া নয়।

নক্সা আঁকছে। মনে মনেও। নারী মানুষের জীবনে কী? কেন? কতটুকু?

পুরু অয়েল-পেপারটা চার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। ভুল হয়েছে। রিয়েলিস্ট্ অবিনাশ মুখুজ্জে হেসে উঠল। ভালবাসা বড় করে মানুষকে?' হয়ত করে।

ফ্রেমে নতুন ক্যানভাস্ চাপাল আর একটা।

ছোট একটা পার্কের ধারে গাড়ি থামিয়ে বিপিন কিছুক্ষণ বসে থাকে চুপ-চাপ। ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবা দরকার। বড় বেশি তাড়াহুড়ো করছে—নিজেই বোঝে। কিন্তু ভাবতে গিয়েই মনে মনে যার সামনে এসে দাঁড়ায়, ধৈর্যের বাঁধ বালির বাঁধ সেখানে।...মণ্টুকে পড়ানোর মাঝখানে ওর প্রত্যাশিত আবির্ভাবে সেই হাল-ছাড়া নারী-মাধুর্য।...আর পথের ধারে সেদিনের সেই প্রত্যাখ্যানের সবল কমনীয়তা। ভিতরটা চনমনিয়ে উঠল বিপিন চৌধুরীর। তৃষ্ণার্ত অনুভূতি। দিন-কতক চেষ্টা করেছিল ভুলে থাকতে। ...দিন কতক? পলে পলে অনেক দিন। গাড়ি ছুটল আবার।

কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে দিল সরমা।

বৃথাই বাক্যচ্ছটার জাল বুনছিল বিপিন এতক্ষণ। সরমার চোখের শান্ত জিজ্ঞাসাটুকু হঠাৎ শান্ত করে দিল তাকেও।

আসুন।

বিপিন অনুসরণ করল।

বসুন—। নিজে বসল চৌকিতে, বিপিন চেয়ারে।

কিছু একটা বলা দরকার এবার। বিপিন চেষ্টা করল।—মণিময়বাবু বাড়ি নেই বুঝি? ক্ষুব্ধ হল পরক্ষণে। এই কি একটা জিজ্ঞাসা করার মত কিছু!

বেরিয়েচেন।

অস্বস্তিকর মুহূর্ত দু'চারটে।...অবিনাশবাবু আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে।

বলে ফেলে নিজের ওপরই জ্বলে উঠল আবার। এ কথাটাই বলবে না ভেবেছিল। প্রার্থীর নগ্ন প্রকাশ যেন। উত্তেজিত হল এবং নিজেকে ফিরে পেল তখুনি।—উনি পাঠান নি, আপনার কাছে আসতে বলেছেন আজ হোক

কাল হোক যেদিন খুশি। আমি আজই এলাম, উনি না বললেও একদিন আসতুম ঠিকই।

তার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল সরমার। এ উত্তেজিত মূর্তিটি আগেও খারাপ লাগত না। সামলে নিয়ে চুপ করেই বসে রইল।

জড়তা সম্পূর্ণ অপসৃত। ঈষৎ হেসে বিপিন পরিপূর্ণ দৃষ্টি রাখল তার মুখের ওপর। কি করে যেন বুঝছে লগ্ন শুভ। বলল, আপনার একটা কথার অপেক্ষায় দিন গুনছি অনেক দিন। কাজকর্মও ভুলেছি। আর ক'দিন এমন করে থাকব?

অদ্ভুত শোনায়। সরমা চকিতে তাকাল তার দিকে। সহজ আবেদনের স্পর্শ আছে একটা। শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, আপনার আর ভেবে দেখার নেই কিছু?

বিপিন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, আপনার চিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাববার সময় আমি পাইনি। বলুন কি ভেবে দেখতে হবে?

মনের কোথায় ছোঁয়া লাগে আবারও। পরস্পরের দৃষ্টি সংবদ্ধ ক্ষণকাল। সরমা ভাবল একটু। পরে আস্তে আস্তে বলল, নিতান্ত সাধারণ ঘরের মেয়ে আমি···তবু পড়াশুনা নিয়ে আছি, এর পরে ঘরের বাইরে হয়ত আমার কাজ থাকবে কিছু।

বিপিন অম্লান বদনে সায় দিল, থাকাই উচিত, আমি সহায় হব তাতে।

সরমা চেয়েই আছে। দু'চার মুহূর্ত···। মৃদু হাসিতে ওর মুখের রং গেল বদলে। লালিমাসিক্ত। বেশ, আর দিন গুনতে হবে না, কাজ করুনগে নিশ্চিন্ত মনে।

লগ্ন শুভ। জায়গাটা অনুকূল নয়। একটা প্রবল ইচ্ছাকে বিপিন সবলে নিষ্পেষিত করল মনের মধ্যে।—তোমার···আপনার পরীক্ষা কবে?

বেশি দেরি নেই।

তবু?

মাস তিনেক।

মনে মনে বিপিন একবার স্বর্গগত পিতাকেই স্মরণ করল বোধ হয়।—তিন মাস···! এ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে?

বিব্রত হল সরমা। হ্যাঁ বলতে বাধে, না বলাও সহজ নয়। একটু ভেবে ফিরে তাকেই জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি বলেন?

লগ্ন নিছক শুভ। আপাদ-মস্তকে খুশির ছোঁয়া লাগে আবার। ছোট কথা, সামান্য কথা, সাধারণ কথা। কিন্তু কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে পৌঁছায়। চোখ বুজে শ্রবণ-রসিকের মত দুই কান দিয়ে আস্বাদন করার মত। কি যে বলবে ভেবে পাচ্ছে না বিপিন।—আমি, মানে আমি আর কি বলব। তা দেখুন, ধেৎ, ছাই, দেখুন—মোট কথা তিন মাস প্রকাণ্ড সময়—ভাবতে গেলেও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ার মত। বিয়ের পর তোমার নিজের বাড়ি বসে পরীক্ষার শুভ কাজটা ভালো হবে না এ কোনো কাজের কথা নয়—আমি এই বলি।

চোখে চোখ রেখে হেসে ফেলল সরমাও। নিজেকে দেওয়ার মধ্যে পাওয়ারও বিচিত্র একটা স্বাদ আছে যেন।

আবার শেয়ার বাজার।

ভিড় ঠেলে লিফট্এর সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সবুর সইল না। বিপিন প্রায় এক দৌড়ে তিনতলার আপিস ঘরে উঠে গেল।

ঘনশ্যামবাবু আড়চোখে দেখলেন বারকতক।—এসেছেন ভালোই হয়েছে, গোটাকতক কথা ছিল। বাজার খারাপ—

বাজার খুব ভালো। সংক্ষিপ্ত জবাব। টেবিলের ওপর কনুই ঠেস দিয়ে হাতের ওপর মাথা রাখল সে।···সরমা বলেছে, আর দিন গুনতে হবে না, কাজ করুনগে নিশ্চিন্ত মনে।

ঘনশ্যামবাবু বললেন, কিন্তু মনে হয় ডিপ্রেশান্ আসছে একটা।

আসুক।···সরমা জিজ্ঞাসা করল কি না ফিরে তাকেই আপনি কি বলেন। বিপিন চৌধুরী হাসছে মৃদু মৃদু।

তবু দেখে শুনে চলা উচিত একটু। ধৈর্যের শেষ নেই ঘনশ্যামবাবুর।

চলুন দেখে শুনে।···ওর কথা শুনে হেসেই ফেলেছিল সরমা।

আমি বলছি নতুন করে আর টাকা রিস্ক করা ঠিক হবে না। ঘনশ্যামবাবুও মরীয়া।

রিস্ক আরো বেশি করতে হবে।···বিয়ের দিনটা কবে ঠিক করা যায়? ছুটিও নিতে হবে, একঘেয়ে ভালো লাগে না আর। মুখ তুলল।—ঘনশ্যামবাবু!

বিরক্তি সত্ত্বেও ওর চঞ্চল বর্ণচ্ছটা ঠিকই লক্ষ্য করছিলেন তিনি। ডাক শুনে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন।

আমি ছুটি নেব দিন-কতক, আমার বিয়ে।

মনে মনে কটূক্তি করে উঠলেন ঘনশ্যামবাবু, শ্রাদ্ধ আমার—। হাসলেন এক গাল, অ্যাঁ! কবে?

শিগগীরই। দিন-কতক একাই সব দেখতে হবে আপনাকে।

সহকর্মী প্রমাদ গুনলেন, নইলে পিণ্ডি চটকাবে কি করে আমার—আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়া গেছে! মুখে বললেন, এ আর বেশি কথা কি, দু'চার দিন বইতো নয়।

না, আরো বেশি।

আপিস ভালো লাগছে না আর। উঠে পড়ল।

রাগের মাথায় হাতের ফাইল রাখতে গিয়ে ঘনশ্যামবাবু কালির দোয়াত ওলটালেন।

শুভ সংবাদটা শুনে বিপিনের মুখের ওপর মতামত প্রকাশ করতে ভরসা পেলেন না চারুদেবী। কিন্তু ক্রুদ্ধ হলেন মর্মান্তিক। জেনেশুনে তাকে এমন অপদস্থ করা কেন।

মণ্টু খুশি হলে কি হবে না নিজেই বুঝে উঠছে না! সরমার সঙ্গে সম্পর্কটা ভাবতে খারাপ লাগে না। অথচ কেমন অদ্ভুত লাগছে।

বিপিন গাড়ি নিয়ে বেরুল আবার। দুনিয়াটাকে টেনে-হিঁচড়ে একজনের পায়ের কাছে এনে ফেলতে পারলে ভালো লাগত। সম্ভব নয়। অগত্যা ছোটাছুটি করে ছটফটানি নিরসনের প্রয়াস। চন্দ্রকে মনে পড়ল, সংবাদটা তাঁকে জানানো দরকার।

চন্দ্রর ড্রইংরুমে আলোচনার বিষয়বস্তু 'দেশের মেয়ে' ছবির ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড গান। গৃহস্বামী বাড়ি নেই। বক্তা মণিময়। অপর্ণা শুনছে।

গানের সুনিশ্চিত সাফল্য-বিশ্লেষণে সুরকার আবেগসিক্ত। একে ক্লাসিকাল কাজ আছে অপর্ণার গলায়, তাতে সংযোজন হবে ইংলিশ টিউন, আধুনিক গান কাকে বলে অডিয়েন্স শুনবে এবার, ইত্যাদি।

দেখুন আগে কি দাঁড়ায়—। অপর্ণা রাশ টানে।

দেখা আছে। আপনার ট্রায়েল শুনে প্রডিউসার পর্যন্ত সতের বার তাগিদ দিচ্ছে, ব্যানার্জী, কণ্ট্রাক্ট সই করিয়ে নাও। গান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু ছবি যে কি দাঁড়াবে সেটাই ভাবনা। যথার্থই একটা ভাবনার ছায়া পড়ল মণিময়ের মুখে।

কেন, ভালো হবে না?

ভালো হওয়া তো উচিত, বই তো আপনিও পড়েছেন…। প্রায় নিরাসক্ত মন্তব্য করল মণিময়। কিন্তু ভালো করবে কে? এক হিরণ্ময়ীর রোলএ তেমন কাউকে পেলেই ছবি উতরে যেতে পারে, কিন্তু নামবে তো সেই একঘেয়ে ইনি না হয় উনি—না আছে কাল্‌চার না কিছু। সত্যি কিনা বলুন?

অপর্ণা ছদ্মগাম্ভীর্যে সায় দিল, সত্যি। নিজের কণ্ঠসংগীত সংশ্রবজনিত দুর্বলতাও আছে। বলল, লেখাপড়াজানা মেয়েরা তো অনেকে ঝুঁকছে আজকাল এদিকে, আপনারা চেষ্টা করেন না কেন?

মণিময়ের দু'চোখ অস্বাভাবিক চকচকে দেখায় মুহূর্তের জন্য। পরে নিস্পৃহ জবাব দেয়, তেমন কই, দু'জন একজনে কি আর আর্ট বাঁচে। সোৎসাহে ঝুঁকে বসল আবার, অথচ দেখুন—

বাধা পড়ল। মূর্তিমান রসভঙ্গের মত বিপিন চৌধুরীর আবির্ভাব। মণিময় চিনল এবং তৎক্ষণাৎ গাম্ভীর্যের আবরণে গুটিয়ে ফেলল নিজেকে।

বিপিনও তেমনি বিস্মিত।—নমস্কার, আপনাকে এখানে দেখব মণিময়বাবু, ভাবিনি। বৌদি চিনতে পারছেন তো? মোহিনীদা কোথায়?

অপর্ণা সহাস্যে অভ্যর্থনা করল, বসুন, তিনি বেরিয়েছেন। চিনতে পারব না! সরমা ব্যানার্জী লাভের আশায় লজ্জাসরম বিসর্জন দিয়ে যে করে ছুটে এসেছিলেন এত সহজে ভুলতে পারি! হল কিছু ব্যবস্থা?

মণিময় অধিকতর গম্ভীর। কর্ণমূল আরক্ত বিপিন চৌধুরীর। মণিময়ের সামনে এ পরিহাস মর্যাদায় লাগে। নিরুপায়। বলল, সে খবরটাই দিতে এসেছিলাম মোহিনীদাকে। হাসল। যেমন হাসে শেয়ার বাজারের অবিশ্বাসী মক্কেল বশীভূত করতে।—তবে, ছোটাছুটি সত্যিই করতে হয় নি তেমন। মণিময়বাবু এখনো শোনেন নি তো? আপনি বাড়ি ছিলেন না, আজই ব্যবস্থাটা পাকা হল। অপর্ণাকে লক্ষ্য করে বলল, এঁর সঙ্গে এখন আমার সম্পর্কটা জানেন তো বৌদি?

অপর্ণা সবিস্ময়ে ঘাড় নাড়ল, বুঝলাম না তো!

দেয়ালে চোখ রেখে মণিময় বলল, সরমা আমার ছোট বোন।

অপর্ণা অবাক। মণিময়ের দাম হঠাৎ যেন বেড়ে গেল তার কাছে। সাগ্রহে বিস্ময় প্রকাশ করল, কই বলেন নি তো কোনোদিন?

এ যে একটা বলবার মত কথা কি করে জানব বলুন। জ্যেষ্ঠোচিত হাসি। অপ্রস্তুত হয়েও সামলে নিল অপর্ণা। বলল, সেদিন সায়েন্স কলেজে

সরমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। এখানে একদিন আসবে কথা দিয়েছিল।…আপনার নিজের বোন?

হ্যাঁ।

এক মুহূর্ত নীরব থেকে অপর্ণা উৎফুল্ল মুখেই বিপিনকে বলল, এঁর সামনে অমন ঠাট্টাটা করে ফেলে আপনাকে তাহলে বেশ লজ্জা দিয়েছি বলুন।…তা আপনার থেকে ঢের ঢের বড় লোকও পত্নী-লাভের তপস্যা করেছে, লজ্জা কিসের!

বিপিনও তেমনি জবাব দিল, ঠিক কথা, মোহিনীদার তপস্যার ফল যখন সামনেই দেখছি।

হাস্য-পরিহাসের মাঝখানে মণিময় বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

নিজের চিন্তায় তন্ময়।

মানুষটা খারাপ ছিল না আসলে। কিন্তু উপর্যুপরি সাফল্যে চিত্ত বিভ্রান্ত। আশার তাড়নায় স্বার্থের ঘোরালো পথটা সোজাসুজি পাড়ি দিতে চায় এখন। লোভ-দানবের হাতে চলার লাগাম। কপাল ঠুকে আজ কপালটাকে যাচাই করে নেবার দিকেই ঝোঁক বেশি। ভাবছে তবু। সঙ্কোচের একটা সূক্ষ্ম কাঁটা বিবেকের নরম পর্দায় আঁচড় কাটে থেকে থেকে।

ভাবছে। প্রযোজকের অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আর অল্প দুই-একটা কথা। যার অর্থ, শুধু ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড গান নয়, পারো যদি একে নায়িকার ভূমিকায় নামাতে, সার্থকতার সোনার তিলক কপালে বাঁধা।

নায়িকার প্রাদুর্ভাবজনিত শোকের মর্মার্থ এই। বিপিন চৌধুরীর সমাগম না হলে আরো খানিকটা এগোনো যেত।

ছবির প্রডিউসারকে জানে। জানে, শিল্প ছেড়ে শিল্পীর প্রতি নজরটা এরই পরের অধ্যায়। কিন্তু সব জানা ধামাচাপা পড়ে স্বার্থের মোটা যুক্তির নিচে।—যে পারে সে পারেই ঠিক থাকতে। আর্টের খাতিরে চেষ্টাটা দোষের নয়।

তোর বিয়ে শুনলাম?

সরমা তার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করল একটু। পরে তেমনি হালকা জবাব দিল, খুব অবাক হবার মত কিছু নাকি?

তাই তো। অবিনাশ ঘাড় থেকে নামবে ভরসা ছিল না। সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি।

শুনলে কোথায়? সরমা নিরীক্ষণ করছে ওকে।

বিপিনবাবুর মুখেই—ডাঃ চন্দ্রর বাড়িতে। চন্দ্রকে চিনিস? সায়েন্স কলেজেই তো আছেন—

চিনি। সামান্য হাসির উন্মেষ, অপর্ণা চন্দ্রকেও চিনি।

মণিময় চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একটা।—ভালো। কিন্তু তোর খবরটা চেপে আছিস কেন?

বাড়ি এলেই শুনতে পেতে, আজই কথা হয়েছে। কিন্তু অপর্ণা চন্দ্রকে তুমি গান শেখাও একথা গল্পচ্ছলেও কখনো বলো নি তো দাদা?

অমন কত মেয়ে শেখে গান। মণিময় নিস্পৃহ।

শেখে?

না তো কি।

আর একজনের নাম করো তো?

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চায় নি মণিময়। কটাক্ষ অমার্জনীয়।—কি বকছিস?

কি আবার, অপর্ণা চন্দ্রর মতো নাম করো না আর একজনের?

ফাজলামো রাখ, তিনি বলেছেন তোকে কিছু?

না। তবে আমি তোমাকে কিছু বলতে পারি। অল্প হেসে সরমা তার চোখে চোখ রাখল।—তোমার রাতারাতি বিখ্যাত হওয়া থেকে কোন্ কথাটা না সাতখানা করে ঢাক পিটিয়েছ আজ পর্যন্ত? বলো নি শুধু ঐ খবরটা। কেন—?

আলোতে কুঁকড়ে যায় এক প্রকারের কীট। মণিময় মিইয়ে আসছে তেমনি। তথাপি হেসে জোর গলায় বলল, আমার খুশি। কি বলতে পারিস তুই শুনি?

বলতে পারি, মহিলাটিকে যতটুকু চিনেছি, সজ্ঞানে তোমাকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন বোধ হয়। মতলব কিছু থাকে তো ছাড়ো দাদা।

ভীম-গর্জনে ফেটে পড়াই নিরাপদ এস্থলে। তাছাড়া সহ্যও অনেকক্ষণ করেছে।—তোর মত পেয়েছিস সকলকে, না? ছেলে পড়ানোয় একদিন কামাই হলে অস্থির! এর নাম তোমার ছেলে পড়ানো? মুখ বুজে থাকি, কিছু বলি না বলে, কেমন?

আর কি বলবে? সরমা হাসি চাপছে।

তোমার চরটি কে জানা নেই আমার? অবিনাশের ওই রোগাপটকা শরীর

ছাতু করে দিয়ে জেলে যাব তাও আচ্ছা, সাতখানা করে লাগানো বার করছি, দাঁড়া—।

উত্তেজনা দুরপনেয়। হাতের কাছে অবিনাশের অভাবে একটা কিছু ভাঙতে পারলে দাহ কমত। সবেগে পায়চারি শুরু করে দিল।

সরমা অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে নিরীহ-মুখে বলল, অবিনাশকে ডেকে আনব?

শুধু খেয়ালের বশেই ওকে রাগিয়ে দিল অথবা অগ্রজের বুদ্ধিবিবেচনার ওপর আস্থা কম বলে যথার্থই সতর্ক করে রাখল সরমাই জানে। কিন্তু আজকের দিনে অন্তত অপ্রীতিকর বচসা কাম্য নয়। হেসে বলল, তোমার হল কি দিনকে দিন, ঠাট্টা করে বললাম, আগুন হয়ে উঠলে ওমনি?

মন ভিজল একটু।

সরমা জল ঢালল আরো, তোমার মনে গলদ, নইলে কি না বললে আমাকে, রাগ করেছি?

আপসও বাঞ্ছনীয়।

অবিনাশের প্রসঙ্গে চিন্তিত আর একটি মানুষও। বিপিন চৌধুরী। মণ্টুর মুখে নামটা শোনামাত্র কৌতূহল আগের মতই দুর্নিবার। অস্বস্তিও।

সাত-সকালে মণ্টুকে দূত পাঠিয়েছিল সরমার বাড়িতে। তারই জের।

গত রাত্রিতে চন্দ্রর বাড়ি থেকে বিপিন ফিরেছিল প্রায় দিগ্‌বিজয়ীর মতই। অকারণে মুখ ভার চারুদেবীর, তাও নজরে পড়ে নি। রাত্রিতে ভালো ঘুম হয় নি। সকালে উঠে আগামী শুভ দিনের তারিখ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ সেদিনই অত্যন্ত জরুরী বলে মনে হল। কাগজ কলম নিয়ে বসল তক্ষুণি। লিখল, সন্ধ্যে নাগাদ সে দেখা করবে, যেন বাড়ি থাকে।

তারপর ভরসা মণ্টু। প্রাগ্‌-অনুরোধের ভূমিকাটুকু মন্দ নয়।

তোর তো বেশ সুবিধেই হল রে মণ্টু—

যেন তোর সুবিধার্থেই কোন ব্যবস্থার সূচনা।

বৌদির কাছ থেকে ধরেবেঁধে শিখে নিবি সব, ভালো পাস করতে পারলে এবারে একটা মোটর-সাইকেল ঠিক কিনে দেব তোকে।

উক্ত দ্বি-চক্রযানের বিনীত সুপারিশ মায়ের মারফত মণ্টু একদা পেশ করেছিল বটে। দুর্ঘটনার অজুহাতে বিপিন চারুদেবীকে নিরস্ত করেছে তখন।

মণ্টু শঙ্কিত। ঔদার্যের এমন বহর উদ্দেশ্যবিহীন নয়। গুরুর অস্ত্রে গুরুকে

পরাস্ত করার নজির আছে কুরুক্ষেত্রপর্ব থেকে। জবাব দিল, মোটর-সাইকেল দরকার নেই, খুব অ্যাক্‌সিডেণ্ট হচ্ছে আজকাল।

মুণ্ডু হচ্ছে তোর, ভীতু কোথাকার। যাকগে, তুই সরমাদের বাড়ি চিনিস? মূল কথাটা কতক্ষণ আর মুলতবী রাখা যায়।

না। প্রশ্ন শেষ হবার আগেই সাফ জবাব।

আচ্ছা, কাগজ পেনসিল দে, চিনিয়ে দিচ্ছি, নম্বরও বলে দেব'খন। একটা চিঠি দিয়ে আসবি ওর হাতে, দরকারি চিঠি। দরকারোচিত গম্ভীর বিপিন চৌধুরী।

আমার পড়াশুনা আছে অনেক, আমি পারব না। মণ্টু আর্তনাদ করে উঠল প্রায়।

কিন্তু না পেরে রেহাই নেই। বিপিনের চোখে আসন্ন ধৈর্য-চ্যুতির ইঙ্গিত। মণ্টু সভয়ে পাঠ করে নিল মুখভাব।

দাও—

কাগজ পেনসিল নিয়ে আয়।

বাড়ি চিনি, দাও।

ঘুরে এলো। বাইরের ঘরে বিপিন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। চিঠি বয়ে নিয়ে যেতে না হলে মণ্টুর মায়া হত হয়ত। নীরস খবরটা একেবারে গদ্যাকারে জ্ঞাপন করল সে। বলল, দেখা হল না, এই নাও চিঠি। তাঁর দাদা বললেন, অবিনাশবাবু না কার বাড়ি খোঁজ করতে। সে বাড়ি আমি চিনি না।

আনন্দ রোমন্থনে হঠাৎ যেন বেখাপ্পা ছেদ পড়ে গেল একটা। লোকটাকে সাময়িক বিস্মৃত হয়েছিল বিপিন, কিন্তু ভোলেনি। ওটা নামের অস্বস্তি এড়ানো সম্ভব হল না আজও। গুম হয়ে বিপিন বসে থাকে একা ঘরে।… মানুষটা সরমার জীবনে কে? কি? কেন?

উত্তর মেলে না। দুই-একটা ইঙ্গিত মনে পড়ে। চন্দ্র আর মণিময়ের। কিন্তু তাই যদি হবে, সরমা ফিরিয়ে দিল না কেন তাকে?

ভাবছে, ডাঃ চন্দ্রকেই খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়।

•

কিন্তু সমস্যার দোটানায় চন্দ্র বিপর্যস্ত নিজেই। সমাদ্দারের তাঁকে চাই। রোজগার কমবে না সত্যি কিন্তু য়ুনিভার্সিটির কাজটা ভালবাসেন তিনি। দ্বিধা লক্ষ্য করে সমাদ্দার রেগে ওঠেন।

টেল্ মি ইয়েস্ অর নো?

ভেবে দেখি।

ভাববে আবার কি! এতবড় একটা জিনিস ফেঁদে বসলাম তোমারই এই শেষ সময়ে ভেবে দেখি বলার জন্য? সমাদ্দার উত্তেজিত।—কি হবে ছেলেদের দু'পাতা কেমিস্ট্রি মুখস্থ করিয়ে। ম্যালেরিয়ায় মরছে, যক্ষ্মায় মরছে, কলেরায় মরছে, পেটের অসুখে ভুগে মরে যাচ্ছে—অস্থিচর্মসার বিকলাঙ্গ সব, মনের জোর নেই, শরীরের জোর নেই—কেমিস্ট্রি শিখে করতে বসবে তো কেরানী-গিরি। কাকে পড়াবে?

চন্দ্র হেসে ফেলেন। বলেন, তার চেয়ে অনেক ভালো বাজারে একের পর এক পেটেন্ট-মেডিসিন আর টনিক ছাড়া। সে কথা থাক, আপনি ডাকলে শেষ পর্যন্ত না এসে পারব না। বলুন কি করতে হবে?

সমাদ্দার বিগলিত।—পেটেন্ট আর টনিক তো আমার ফ্যাক্টরিতে হামেশাই বেরুচ্ছে হে, সে জন্যে কে ডাকছে তোমাকে? ল্যাবরেটারিতে শুধু রিসার্চ ওয়ার্ক চলবে। তুমি আমি বাদে আরও জনা তিন-চার কেমিস্ট নেবো আপাতত। তোমার ওই ছাত্রীটির নাম কি? ছ্যাট্ লাভলি এঞ্জেল—সরমা ব্যানার্জী, তাকেও কথা দিয়েছি নেবো। মেয়েটি কাজের হবে, না?

হ্যাঁ। চন্দ্র নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন।

আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা তোমার সঙ্গে কথা পাকা তাহলে?

চন্দ্র হাসলেন, পাকা।

কিন্তু এই অনুমোদনের ফলে ব্যাপার গড়ালো অনেক দূর। ডাঃ সমাদ্দারের পীড়াপীড়িতে অপর্ণা নিজেই আগে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, নামজাদা মানুষ দেশের, ডাকছেন এমন করে, গেলে নিশ্চয়ই ভালো হবে, রাজী হচ্ছ না কেন?

চন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন, গেলে তোমার রাগ বাড়বে আরো, বই থেকে মুখ তুলতে সময় পাব না।

অপর্ণা ছদ্ম-রোষে প্রতিবাদ করেছিল, আমি শুধু রাগই করি, না?

সুযোগ পেলেই, আর না পেলেও। চন্দ্র বলতে ছাড়েন নি।

বেশ যাও! অপর্ণা হেসেছিল।

কিন্তু সেদিন সমাদ্দার বিদায় নিতে দেখা গেল, নতুন কাজে যোগদান সম্বন্ধে অপর্ণার আগ্রহ শূন্যে পর্যবসিত। ভিতরে এসে চন্দ্র নিজে থেকেই জানালেন, বুড়োকে কথা দিয়ে দিলাম।

সাড়াশব্দ নেই।

গম্ভীর যে? চন্দ্র ঈষৎ বিস্মিত।

য়ুনিভার্সিটির চাকরি কি হবে? প্রায় তীক্ষ্ণ শোনায়।

চন্দ্র দেখলেন একটু।—সে তো ছাড়তেই হবে।

হাজার টাকা মাইনে সমাদ্দার দেবেন?

তা না দিলে কি হাওয়া খেয়ে কাজ করব। লেগে থাকলে ভবিষ্যতে অনেক বেশিই পাব।' কিন্তু কি ব্যাপার, তোমার মত নেই নাকি?

উষ্ণ ঝাঁজে অপর্ণা বলে উঠল, এ বাজারে এক কথায় হাজার টাকার চাকরি ছেড়ে দেবে সুদিনের স্বপ্ন দেখে, আর আনন্দে আটখানা হব আমি তাই ভেবেছিলে?

চন্দ্র বিমূঢ়। বুঝে উঠলেন না ঠাট্টা কি না। নারী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয় বিবেচনায় পাশ কাটাতে গেলেন।

শোনো—। কঠিন কণ্ঠে বাধা দিল অপর্ণা।

ফিরে দাঁড়ালেন।

চাকরি ছাড়া হবে না তোমার।

শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে চন্দ্র অপেক্ষা করলেন একটু। একটা সন্দেহ যেন সচকিত করল তাঁকে। অপর্ণার এ অসম্মতি অনটন সম্ভাবনার দরুন নয়। তার সেদিনের আগ্রহ আজ বিপরীত বাধায় মুখর কেন বুঝলেন। সময় লাগল সামলে নিতে। কাছে এলেন।

দেখ অপর্ণা, আগেও বলেছিলাম আজও বলছি, বাইরে থেকে যে মেয়েটির নাম শুনেই এত ঈর্ষা তোমার, সে সত্যিই এ সবের অনেক উঁচুতে। তাকে নিয়ে তোমার এ দুর্ভাবনার আভাস যদি পায় কখনো লজ্জায় মরে যাবে।

কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। সমাদ্দারকে চিঠি লিখলেন অল্প দু'চার কথায়। চাকরি ছেড়ে গবেষণায় যোগ দেওয়া সম্ভব নয়, এ নিয়ে আর অনুরোধ যেন না করেন। চাকরকে ডেকে আদেশ দিলেন, সমাদ্দারের হাতে দিয়ে আসতে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অপর্ণা দেখল সব। ডেকে থামাল চাকরকে। চিঠিটা নিল তার হাত থেকে। পড়ল। পরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিল সেটা।

লজ্জায় ধিক্কারে বিবর্ণ সমস্ত মুখ। মনের যে দ্বন্দ্বে আজ এ বাধার সৃষ্টি, আপাতদৃষ্টিতে তার নাম ঈর্ষা বইকি।

চন্দ্রের ভুল হল আবারো। যতবারই আঘাত দিয়ে আলো জ্বালাতে চাইলেন, আগুন জ্বলল।

চলচ্চিত্র প্রযোজকের সামনে সমাসীন মণিময়, অপর্ণা এবং আরো কয়েকজন। অপর্ণার একটা সম্মতির অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব সকলে।

এ যোগাযোগের শুভাশুভ ভেবে দেখার অবকাশ নেই অপর্ণার। সুস্থ চিন্তার অন্তরায় একান্ত ঘরের মানুষের নির্লিপ্ত উদাসীনতা। জ্বালাটা নিবিড় করে অনুভব করে তখনি, যখন ভাবে পথ আছে ডাইনে বাঁয়ে। পাথেয়র নগ্নরূপ সম্প্রতি উত্তেজনাবৃত।

তবু অস্বস্তি কেমন। সামনে বসে আছেন যাঁরা, চোখের দৃষ্টিতে আবরণ নেই মার্জিত সম্ভ্রমের। ওর সর্বদেহে সংবদ্ধ তাঁদের নির্মম পরীক্ষা। অশোভন স্পর্শের মত। বস্ত্র-স্বল্পতার অনুভূতি একটা। আগে জানত না এঁদের পরিকল্পনা। পরে শুনেছে। সাদাসিধে প্রস্তাব নয়, ফলে ফুলে পুষ্পিত মধুবর্ষী প্রস্তাবনা!

এবার জবাব দিতে হবে।

ঘরের কথা ভাবল আবার। যেমন ভেবেছে বহুদিন। মনোমালিন্য আর তিক্ততা। মানুষটা থাকুক তার সাধনা নিয়ে। এর নামও শিল্প। পরোয়া করে না সংস্কারের কোন চোখ-রাঙানির। উচ্ছল পরিপূর্ণতার সূক্ষ্ম বেদনা-বোধ আছে একটা। বাঁচার মত করে বাঁচতে চায় সে। আর চায় যশ খ্যাতি নাম। প্রস্তুত হল, দেবে জবাব।

কিন্তু আমি তো প্লে করিনি কখনো।

প্রযোজক দেশাই ব্যাখ্যা শুরু করলেন, আজ যা নতুন কাল তা পুরানো। মণিময়বাবুর মুখে শুনেছেন আর্টএর জন্য অপর্ণার দরদ কতখানি। ওটুকুই আসল, জড়তা কাটানো দু'দিনের অভ্যাস শুধু, ইত্যাদি—।

অপর্ণা শান্ত মুখে একবার তাকালো মণিময়ের দিকে। তার সেদিনের আক্ষেপের তাৎপর্য অস্পষ্ট নয় আর। জবাব দিল, নামি যদি, জড়তা কাটিয়েই নামব, বলুন কি ব্যবস্থা হবে।

ব্যবস্থা···মানে কণ্ট্রাক্ট?

হ্যাঁ।

সাফল্যজনিত আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশটুকু ব্যবসায়ীর গাম্ভীর্য-গ্রহের

অন্তরালেই সংগোপন থাকে। কটাক্ষে দেশাই সহকর্মীদের মুখভাব অবলোকন করলেন একবার। জানালেন, কন্ট্রাক্ট-ফর্ম ছাপানোই থাকে তাঁদের, ব্যবস্থা আজই পাকা হতে পারে। নতুন আর্টিস্টকে এ বাজারেও তাঁরা যা দেবেন, ততটা রেমুনারেশান্ কম প্রডিউসারই দিয়ে থাকেন। মন্দা-বাজারের মুনাফার অনিশ্চয়তায় কণ্ঠস্বর চিন্তাক্লিষ্ট।

অপর্ণার শান্ত চোখে বিদ্রূপের ছায়া পড়ে। আসল জবাবের প্রতীক্ষায় চুপচাপ বসে রইল।

ফুল-পিক্‌চার কন্ট্রাক্ট হবে···পনের হাজার টাকা—এর বেশি পারিনে। কর্মচারীর উদ্দেশে হাঁক দিলেন প্রযোজক, একঠো ফরম্ লাও জী—

ফর্ম এলো। অপর্ণা মণিময়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আবার। অতিরিক্ত মনোযোগে ধরে রাখা গাম্ভীর্যের মুখোশ। হাসি পেয়ে গেল। মাথা নিচু করে ভাবল একটু। তারপর প্রযোজকের দৃষ্টির সম্মুখীন হল সোজাসুজি।

ভূমিকাটি নায়িকার ?

হ্যাঁ—গ্রাণ্ড্ রোল্, যদি উতরে দিতে পারেন নাম ফেটে যাবে। প্রযোজকের সিক্ত কণ্ঠস্বরে সেই নিশ্চিত সম্ভাবনার আভাস।

নায়িকার ভূমিকায় সচরাচর ওই রকমই দিয়ে থাকেন আপনারা ? অপর্ণার প্রশ্নে জড়তার লেশমাত্র নেই।

শুনে গদ্য-রাজ্যে নেমে এলেন শুধু প্রযোজক নয়, মণিময় এবং আর যারা উপস্থিত, তাঁরাও। একটু ইতস্তত করে দেশাই জবাব দিলেন, আর্টিস্ট বুঝে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজারও দিতে হয়, কিন্তু নতুন আর্টিস্টের বেলায় সে কথা ওঠে না। একজনকে ইশারা করলেন ফর্ম এগিয়ে দিতে।

অপর্ণা ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, শুধু ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্ মিউজিকের কন্ট্রাক্ট হবে।

প্রযোজক নড়ে চড়ে বসলেন, কেন ?

অন্য সকলের মুখে আশাভঙ্গের ছায়া।

অপর্ণা জবাব দিল, এর সঙ্গে অভিনয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

তা নেই। প্রযোজক মিষ্টি করে বললেন, কিন্তু আপনি নতুন আর্টিস্ট সম্বন্ধে খবর নিয়ে দেখুন, বেশিই অফার করেছি আমরা।

হতে পারে। আমার নতুন আসাটা কোনো ডিস্‌কোয়ালিফিকেশান কি না সেটা আপনাদের বিচার। ওই সব চেয়ে বেশি যাঁদের দাবি আমার অফার

তাঁদের সমান রইল। মিউজিকের কণ্ট্রাক্ট-ফর্ম ফিল্-আপ করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন, সই করে দেব। আচ্ছা, নমস্কার।

খানিকটা আসতে মণিময়ের আহ্বান শুনে ঘুরে দাঁড়াল অপর্ণা। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে সে। যথার্থ ক্রুদ্ধ হয়েছে।

এ কি ছেলেমানুষি করলেন বলুন তো? আঘাতটা যেন তারই সব থেকে বেশি লেগেছে।

কী? অপর্ণা অস্ফুটকণ্ঠে ধমকে উঠল প্রায়।

মণিময় থতমত খেয়ে গেল। বলছিলাম, আপনি প্লে করবেন না বলে দিলেই হত, মিছিমিছি এতক্ষণ—

অপর্ণা নিঃশব্দে দু'চার মুহূর্ত চেয়ে থাকে তার দিকে।—আমি প্লে করব এমন আভাস কখনো দিয়েছি আপনাকে?

মণিময় নিরুত্তর। হঠাৎ এই লোকটার প্রতিই কেমন যেন মায়া হল অপর্ণার। নরম করে বলল, তবে ওঁরা রাজী হলে আপত্তি নেই। চলতে শুরু করল আবার।

সেই কথাই তো বলছি, এবারে কথা বলতে ভরসা পেল মণিময়, এমন ইম্‌পসিব্‌ল টার্মস্‌ আপনার, ওঁরা রাজী হবেন কি করে? যা চাইলেন আপনি, শুনে আমি সুদ্ধ অবাক!

অপর্ণা হাসল একটু। ওঁদের চাওয়াটাও কম নয়।

কিন্তু ওঁরা তো নামাতে চান আপনাকে?

নামাতেই তো চান। যাকগে, আপনি ফিরে যান, আমার তাড়া আছে একটু। সোজা গিয়ে গাড়িতে বসল অপর্ণা। মণিময় দাঁড়িয়ে।

ব্যক্তিত্বের সুকঠিন আব্রু এবং রূপ-মর্যাদার প্রহেলিকায় যে মায়াজালের সূচনা সেদিন, তার মোহ-পাশ থেকে সহজে মুক্ত হবেন এমন সবল নন চলচ্চিত্র প্রযোজক দেশাই। অভিনেত্রীর সঙ্গে দর কষাকষি অনেক করেছেন, অনেক দিয়েছেন দাবির সীমা ছাড়িয়ে। কিন্তু সেখানে তিনি মহাজন এবং দাতা। ব্যতিক্রম ঘটল এবার এবং ঘটল বলেই খুশি। এ ধরনের ব্যতিক্রম যাচাইয়ের কষ্টিপাথর। অপর্ণা পুরো নম্বর পেয়ে গেছে সেদিক থেকে। তাকে মূল্য দেওয়া ব্যর্থ হবে না কোন রকমে।

এদিকে অপর্ণার দিন যাপনে পারম্পর্য নেই। ডাঃ চন্দ্র সমাদ্দারের ফ্যাক্টরী এবং ল্যাবরেটারির সুব্যবস্থায় অহর্নিশি ব্যতিব্যস্ত। কিছুদিনের মধ্যে দু'চারটে

কথারও বিনিময় হয়নি অপর্ণার সঙ্গে। যদি কিছু বলেছেন তিনি, অপর্ণা শুনেছে চুপ করে। যদি কিছু চেয়েছেন, অপর্ণা হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছে নিঃশব্দে। কর্ম-ব্যস্ততায় তার থমথমে গাম্ভীর্যও চোখ এড়িয়ে গেছে চন্দ্রর।

অপর্ণা নিজের থেকেই তফাতে থাকে যথাসম্ভব। কিন্তু মনটাকে তফাত করে দেওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের যে সিঁড়ি প্রস্তুত করতে সঙ্কল্প-বদ্ধ এঁরা, উত্তরকালে তারই কোন সুউচ্চ সোপানে যশোজ্জ্বল থাকবে আর এক নারীর নাম, সে অপর্ণা নয়। এঁদের সাধনার সঙ্গে লিপিবদ্ধ থাকবে যে নারীর একাগ্র সাধনা, সেও অপর্ণার এই জীবন-ব্যাপী বিক্ষোভ নয়।

অথচ, দুর্বলতার সন্ধান রাখে মানুষটার।

সময় অসময়ে দানব-পিপাসার সেই উচ্ছৃঙ্খল তাড়না। সেই মুহূর্তের দুই সবল বাহুর ক্ষিপ্ত নিষ্পেষণে নিঃশ্বাস রোধের ভীতিটা অহেতুক নয় অপর্ণার।

তার প্রথম সন্তান...

ভাবতে পারে না।

অথচ, এই মানুষটিরই মুখ উদ্ভাসিত হতে দেখেছে একটি মাত্র নারীর নামোল্লেখে। সেও অপর্ণা নয়। ঈর্ষা করে না। কিন্তু একটা দিনের জন্যও তার ডাক পড়ল না পাশে।

সুসময়ে আবির্ভাব মণিময়ের। হাস্যোদ্ভাসিত। শুভ সংবাদ। প্রযোজক সম্মত আছেন, যেতে হবে কন্ট্রাক্ট সই করতে।

অপর্ণা শান্ত মুখে শুনল তার উচ্ছ্বাসের ইতিবৃত্ত।—আমার টার্মস্ না সেদিন ইম্পসিবল্ বলে মনে হয়েছিল আপনার?

মণিময়ের বিপর্যস্ত মুখমণ্ডল সুদৃশ্য।—তাই তো মনে হয়েছিল, ব্যাটারা একদিনে এতটা ইম্প্রেসড্ হয়ে যাবে কি করে জানব!

আবারও ঠাণ্ডা প্রশ্ন অপর্ণার।—কি দেখে একদিনে এতটা ইম্প্রেসড্ হলেন তাঁরা?

মণিময় সচেতন হল এবারে। ভালো করে কিছু বলা দরকার। উচ্ছ্বাস গেল। প্রায় নিস্পৃহ। বলল, সে জবাব তাঁদের কাছ থেকেই নেবেন, আমি খবরটা দিলাম শুধু। থামল একটু। ভাবল যেন একটু।—কিন্তু দেখুন, সত্যিই যদি ভয় থাকে মনে, তাহলে থাক, লাইনটা ভালো নয় সত্যি কথাই। কিন্তু স্বাই করুন, এ নিয়ে আপনি আমাকে অপদস্থ করতে চান কেন—আমি ছোটাছুটি করি বলে?

অপর্ণা হাসল, কেন করেন ছোটাছুটি ?

কবি নিজের স্বার্থে, বেশ এবার থেকে সাবধান হব।

অপর্ণা জোরেই হেসে ফেলল তার দিকে চেয়ে। হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল তাকে। বলল, বরং আর একটু বেশি অসাবধান হবেন, কিছু বলব না তাহলে। সিনেমা নিয়ে এমন মেতে গেছেন যে আমার গান শেখাও বন্ধ। রাগ হবে না ?

'অব্যর্থ অস্ত্র। দুর্জ্ঞেয় নারী-চরিত্র বিশ্লেষণের আয়াস মণিময়ের চোখে।

অপর্ণা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার বোনের বিয়ে কবে ?

মণিময়ের ভাবতে হল একটু। বোনের বিয়ে···হ্যাঁ, শীগগীরই হবে বোধহয়।

অর্থাৎ, খোঁজও রাখেন না, বেশ মানুষ। আপনি গান করেন, বই লেখেন—এসবে সরমার উৎসাহ কেমন ? হালকা আলাপের আগ্রহ অপর্ণার।

এতবড় একটা দায়িত্ব হাতে মণিময়ের, এ সময়ে ঘরোয়া কৌতূহল বিরক্তিকর। জবাব দিল, কেমিস্ট্রি বই পড়া আর অবিনাশের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর কিছুতে উৎসাহ নেই তার।

অবিনাশবাবু আপনাদের আত্মীয় বুঝি ? নিরীহ বিস্ময়।

আমার নয়, সরমার—কেমন আত্মীয় সেই জানে। নিজের রসিকতায় মণিময় হেসে উঠল নিজেই।

বুঝলাম। অপর্ণা যোগ দিল তার হাসিতে—কিন্তু বিয়ের ব্যবস্থাটি আর একজনের সঙ্গে কেন ? অপরের ব্যাপারে এ ধরনের আগ্রহ খুব সুশোভন নয় উপলব্ধি করেই তাড়াতাড়ি বলল আবার, এমন একজন ভালো মেয়ে য়ুনিভার্সিটির, তাই জানতে ইচ্ছে করে ওঁর সম্বন্ধে।

জ্যেষ্ঠোচিত গাম্ভীর্যে মণিময় ভবল একটু। পরে জবাব দিল, হ্যাঁ—পরীক্ষাগুলোতে বরাবরই প্রথম হয়, বুদ্ধি কিছু আছে।·· অবিনাশের একে তো ওই চেহারা, তায় না আছে চালচুলো না আর কিছু। বিপিন চৌধুরী সুপাত্র সেদিক থেকে।

অপর্ণা চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। খুশি হবার কথা। সরমার সঙ্গে ভালো করে আলাপ হয় নি, তবু চোখে যতটুকু দেখেছে তার সম্বন্ধে আর পাঁচজনের মত এ কথাই সত্যি বলে মনে হয় না।

মণিময় তাড়া দিল, আমাকে আবার যেতে হবে···আপনি কি করবেন ঠিক করে ফেলুন।

অপর্ণা আত্মস্থ হল যেন।—কি আবার করব, যাব। বসুন, আসচি। উঠে ওপরে এলো। আলমারি খুলে শাড়িগুলির ওপর অন্যমনস্কের মত চোখ বুলিয়ে গেল একবার। প্রিয়জন ছেড়ে বহুদূরে কোথাও যাবার আগের একটা অনুভূতির মত নিরুৎসাহ ঔদাসীন্যে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

সচেতন হল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে। চন্দ্র ফিরলেন। গভীর মনোনিবেশে শাড়ি বাছাই চলল অপর্ণার।

মণিময়বাবু নিচে বসে আছেন···ও, বেরুচ্ছ নাকি?

অপর্ণা একবার ফিরে তাকালো শুধু, জবাব দিল না। শাড়ি নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। প্রসাধন শেষ করে দাঁড়াল আয়নার সামনে। রোষদৃপ্তা ইন্দ্রাণীর রূপসজ্জা। টক্‌টকে লাল শাড়ির আভায় রক্তিম দেখাচ্ছে মুখ।

চন্দ্রর সামনে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, চাবিটা রাখো।

চন্দ্র চাবি নিলেন। দেখলেন তাকে।—শোনো।

অপর্ণা ফিরে দাঁড়াল।

চন্দ্র ডেকে ফেলেছেন এই পর্যন্ত। মুগ্ধ চোখ দু'টো নিজের অজ্ঞাতে তার সর্বদেহে বিচরণ করল একবার। বললেন, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে, কোথায় যাচ্ছ?

ক্ষণিকের দুর্বলতা সামলে নিল অপর্ণা।—এসে বলব।

মণিময়ের বিরক্তি বাড়ছে ক্রমশ। বসিয়ে রাখারও সীমা আছে একটা। কথার ছলে আজই জানিয়ে দেবে, সময়ের দাম তারও কম নয়।

চলুন—

রূঢ়-পরিকল্পনা অতলে নিমজ্জিত। বদলে, আত্মবিস্মৃত চোখের বিমূঢ় অর্ঘ্য নিবেদন। স্থান কাল ভুল হয়ে গেল মণিময়ের।

অপর্ণা হেসে ফেলল, দেখছেন কি, আসুন—?

হ্যাঁ, চলুন। মনে মনে ভাবল মণিময়, চল্লিশ হাজার ছেড়ে এর চারগুণে রাজী হওয়াও আশ্চর্য নয় প্রযোজকের।

•

চন্দ্র বই পড়ছিলেন। ঠিক পড়ছিলেন না, বসে ছিলেন বই নিয়ে। বিকেল গেল, সন্ধ্যা পেরুলো, রাত হল। ভালো লাগছে না। মন বসছে না বইএ। একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি যেন থিতিয়ে আছে সেই থেকে। অপর্ণা যাওয়ার পর থেকেই। ঘুরে ফিরে বার বার তার কথাই ভাবছেন। ভাবছেন না ঠিক,

মনে পড়ছে তাকে। তার ওই চোখ-ধাঁধানো লাল পোশাক যেন ব্যাল নিশানার মত কিছু। আশঙ্কার আভাসের মত। খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু সে চলে যাবার পরে মনে হয়েছে, প্রায় নির্দয় রকমের সুন্দর দেখাচ্ছিল যেন।

বই হাতে বিগত ক'টা দিনের কথা ভাবতে চেষ্টা করছেন। মনে পড়ার মত কিছু মনে পড়ছে না।...লক্ষ্য করেননি বলেই বোধ হয়। লক্ষ্য করলে চোখে হয়তো পড়ত কিছু। এই লক্ষ্য না করাটাও অপর্ণা আগে বরদাস্ত করত না। দ্বিগুণ রাগত। কিন্তু সম্প্রতি কোনো প্রতিবাদ নেই ওর দিক থেকে। কোনো রাগ না, অভিমান না।

আজ সে বেরিয়ে যাবার পর থেকে ওর এই কঠিন বিচ্ছিন্নতাটুকুই যেন ঘুরে ফিরে বার বার উপলব্ধি করছেন চন্দ্র।

চাকরটা মাঝে-মধ্যে এসে ঘুরে যাচ্ছে। কর্ত্রী বাড়ি নেই। যদি কিছুর প্রয়োজন হয়। এবারেও অস্পষ্ট পায়ের শব্দে চন্দ্র ভাবলেন, সে-ই। মুখ না তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, মাইজি আয়া ?

সাড়া না পেয়ে মুখ তুললেন, ও তুমি—এত রাত হল ?

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল অপর্ণা। আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকল। কাছে এলো। গাঢ় রক্তিম সাজের লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। নিরাসক্ত মুখে পাল্টা প্রশ্ন করল, কেন, ভাবছিলে নাকি ?

ভাবব না ? মুচকি হেসে চন্দ্র বই সরিয়ে রাখলেন।

অপর্ণা স্থির গম্ভীর। বলল, একটা কথা আছে।

চন্দ্র নীরবে তাকালেন। ক্ষণকালের বিভ্রম। ওর লাল সজ্জায় এখন মনে হচ্ছে, সারা গায়ে যেন আগুন লেগেছে।

আমি সিনেমায় নামছি। তোমার আপত্তি হবে ?

লালের ঘোর কেটে গেল। বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকেন চন্দ্র। বাহ্যজ্ঞান-রহিত।

একটু অপেক্ষা করে অপর্ণা স্পষ্ট, মৃদু-কঠিন কণ্ঠে বলল আবার, অবাক হচ্ছ কেন, তোমার সাধনায় আমি তো আনন্দ কিছু পাইনে—যাতে পাই সে চেষ্টাও করোনি কখনো। অথচ কিছু একটা চাই আমার, তুমি বাধা দেবে ?

পায়ের নিচে মাটি দুলছে। নিশ্চেতন মূর্তির মত চন্দ্র চেয়ে আছেন তেমনি।

জবাব দাও।

বিমূঢ় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছেন চন্দ্র। সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। নির্মল সুন্দর। সচেতন হলেন একটু একটু করে। অস্ফুট স্বরে বললেন, বাধা দিলে আটকানো যাবে তোমাকে?

না। একটি মাত্র শব্দে আপসের ক্ষীণ আশাটুকুও যেন নির্মূল করে ফেলল অপর্ণা।

স্তব্ধ, নীরব কতকগুলি মুহূর্ত। বেদনার রেখাগুলি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল চন্দ্রর মুখ থেকে। বললেন, কারো ইচ্ছেয় বাধা দেওয়া আমার স্বভাব নয় অপর্ণা। সত্যিই এই চাও তুমি?

হ্যাঁ।

বেশ। আমাকেও তুমি হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলে, ভুলো না।

অপর্ণা চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল।—মানে?

নিরুত্তরে বই তুলে নিলেন চন্দ্র।

কিন্তু হবে কেন বই পড়া। থাকল পড়ে বই। থাকল পড়ে বিজ্ঞানের দুরূহ সমস্যা। মনের বিজ্ঞান বিপর্যস্ত। চন্দ্র আরাম-কেদারায় শুয়ে পড়লেন। আবার উঠলেন, আবার বসলেন। অশান্ত পায়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ালেন বারকতক।

খাটের ওপর চুপ করে বসে আছে অপর্ণা। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চন্দ্র কাছে এলেন। বসলেন পাশে। মাঝখানে দুস্তর বাধার মত।

অপর্ণা তাকালো তাঁর দিকে। স্থির, তীক্ষ্ণ। কিন্তু অ চিরে দু'চোখ সজল হল নিজের অজ্ঞাতে। যে মানুষটির এতটুকু অনুরাগে সিক্ত হতে পারে ওর সমস্ত জীবন, তাঁর তাপদগ্ধ হৃদয়ের স্পর্শ লাগল বুকের মধ্যে। নির্ভুল পাঠ করে নিল সব না-বলা কথা! কণ্ট্রাক্ট সই করে আসার পর থেকে একটা অতিবড় আশ্রয়চ্যুতির অনুভূতি উতলা করে তুলছিল এতক্ষণ। কি করে যেন বুঝল, ওই প্রশস্ত বুকে আশ্রয় তার বাঁধাই আছে। খুব কাছে এসে একখানি হাত রাখল তাঁর হাতে। ধরা গলায় বলল, আমার জন্যে ভেব না কিছু।

সহসা যেন সচেতন হয়ে চন্দ্র দুই বাহুর নিবিড় বন্ধনে বেষ্টন করে রাখলেন তাকে।

সার্থক হয়েছে অপর্ণার কণ্ট্রাক্ট সই করে আসা।

॥ ৯ ॥

বিয়ে হয়ে গেল সরমার। ছোটখাটো কয়েকটা মতামত লঙ্ঘন করতে হয়েছে। যেমন, চারুদেবী রাজী নন রেজিস্ট্রি ম্যারেজএ। কাগজে কলমে আবার বিয়ে কি বাপু? ধূপধুনো নেই, যাগযজ্ঞ নেই, অনাসৃষ্টির দেশে আছি বলে যা খুশি তাই হবে!

কিন্তু কাগজে কলমেই হল বিয়ে। শোরগোল তুলে কোন উৎসবের উপলক্ষ হতে রাজী নয় সরমা। বাধা কোথায় এ যদি নিজের মনে উপলব্ধি করেও থাকে, প্রকাশ করা গেল না বিপিনের কাছেও। তার জিদ দেখে সে বিস্মিত, মুখ গম্ভীর চারুদেবীর—তবু এ নিয়ে আর জোর করল না কেউ।

কিন্তু শেয়ার বাজারের পদস্থ মানুষ বিপিন চৌধুরী জীবনের এতবড় শুভকর্ম চুপচাপ ঘরে বসে সারবে, এটা সম্ভব নয়। ইচ্ছেও নয়। শীঘ্রই আত্মীয়-পরিজন এবং বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করে পরিপূর্ণ এক উৎসবের আয়োজনে মেতে গেল সে। গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে নিমন্ত্রণ-পর্বটা নিজেই সমাধা করল। তারপর মনে পড়ল একজনের কথা।

সরমা, অবিনাশবাবুকে তো বলা হল না?

এই ভয়টাই ছিল মনে মনে। নিস্পৃহ জবাব দিল, থাকগে—।

থাকগে কি! তাঁর সুপারিশ না হলে, যাক—তুমি বলে আসবে না আমি যাব?

সরমা হেসে বলল, কাউকে যেতে হবে না, এমনিতেই রোগা শরীর, বারমাস অসুখে ভোগে, দাদাকে বলেছ?

হ্যাঁ। ওর মুখের দিকে চেয়ে কিছু যেন বুঝতে চেষ্টা করছে বিপিন।

মাস্টারমশাই আর তাঁর স্ত্রী?

বলেছি।

বিপিন চলে গেল সেখান থেকে। সরমা দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। অবিনাশকে বাদ দেওয়ার এ যুক্তিটা সে সহজ মনে গ্রহণ করল না বুঝেও। নতুন জীবনের সূচনায় কোন অসন্তোষের ছায়া ফেলতে চায় না। কিন্তু এই উপলক্ষে অবিনাশকেও ভদ্রতাপাশে আবদ্ধ করে টেনে আনতে মন সায় দিল না কিছুতে।

মণ্টু এদিকে এসেছিল, চুপি চুপি তার দরজা অতিক্রম করে সরে পড়ছে। সরমা তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ডাকল, এই দাঁড়াও!

কাছে গিয়ে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে। জোর করে বিছানায় বসিয়ে দিল।

বড় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছো দু'দিন ধরে?

মণ্টুর লজ্জা কাটেনি তখনো।—পালাব কেন, কাজ ছিল।

কাজ ছিল? আচ্ছা, মুখ তোলো।

মণ্টু তাকালো জিজ্ঞাসু নেত্রে।

চেয়ে থাকো যতক্ষণ খুশি, কিচ্ছু বলব না।

হেসে ফেলে মণ্টু। এবার সহজ মুখে ফিরে ঠাট্টা করল, দাদা লাঠি নিয়ে আসবে।

সরমা হেসে উঠল, এই ভয়ে পারছ না?—আচ্ছা, দাদাকে বলে দেব'খন এটি দু'নম্বর আমার।

যাঃন্—

একেবারে দোতলায় এসে উঠেচি যান বললেই আর যাই! হাসছে সরমা, ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেল?

মণ্টু ঘাড় নাড়ল।

দিলে কেমন?

জবাব না পেয়ে বলল, আচ্ছা থাক, এসব অপ্রিয় কথা এখন তুলব না, পরে মাস্টারি তো আছেই—।

আমি আর পড়বই না আপনার কাছে।

দেখা যাবে। আপনি ছেড়ে তুমি বলতে শুরু করো, অভ্যাস হোক—তা'বলে বৌদি বলা বাদ দিও না আবার।

ধেৎ! এবার যথার্থ লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়াল মণ্টু। চারুদেবী এলেন। সরমা মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে দিয়ে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।—এবার কিন্তু ছাত্রের কানমলে দিলেও চলে যাবার কথা বলতে পারবেন না কাকীমা।

কি এক অশুভক্ষণে চারুদেবী ওকে প্রথম দেখেছেন এখানে। তার ওপরে দলিলপত্রে বিয়ে। বললেন, তা কি পারি, তোমাদের অনুগ্রহের ওপর ভরসা করেই তো চলা এখন।

সরমা একেবারে চুপ। হাসি মিলিয়ে গেল মণ্টুর মুখ থেকেও। রাজ্যের

বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকালো মায়ের দিকে। চারুদেবী বক্র কটাক্ষে একবার দু'জনকেই নিরীক্ষণ করে যেন ঘরের দেয়ালের উদ্দেশেই বললেন, বিপিন কোথায়, সন্ধ্যেয় এই কাজ আর সে হুট-হুট করে বেড়াচ্ছে সকাল থেকে।

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

নিজের মা বলেই বোধকরি মণ্টুর লজ্জা আরো বেশি। বলল, মা ওই রককই বৌদি, কথার মাথামুণ্ডু নেই—

সরমা সামলে নিয়েছে। মণ্টুর বিপন্ন মুখভাব লক্ষ্য করে বলল, দু'দিনেই খাতির করে নেব'খন, ভেব না।

অবিনাশের ঘরের দরজায় তালা আটকানো। তবু কি ভেবে বিপিন জানলার শার্সি টেনে উঁকি দিল ঘরের মধ্যে। পকেট থেকে নিমন্ত্রণ-পত্র বের করে নাম লিখল। পরে তার এক ধারে লিখে দিল, নিজে এসেছিল কিন্তু দেখা হল না—সন্ধ্যায় অবশ্য যেন আসে, বিশেষ অনুরোধ।

শার্সির ফাঁক দিয়ে কার্ড ফেলে দিল। বাড়ি ফিরে এ সম্বন্ধে সরমাকে বলল না কিছু।

অবিনাশ কাজে বেরিয়েছিল। ফিরে আসতে দুপুর গড়িয়ে গেল। ঘরের জানলা খুলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এটা অভ্যাস।

একটা দুর্ভাবনা ছিল। আজকের পার্টির খবর মণিময়ের মুখে শুনেছে। তারও টানাহেঁচড়া পড়বে হয়ত। যেতে হবে, হাসতে হবে, আনন্দ করতে হবে।...তা'ছাড়া বড়লোকের বাড়ির অভিজাত সমাবেশে বেমানান লাগবে নিজেকে। কিন্তু অন্য তরফের সাড়াশব্দ না পেয়ে খুশি। মনে মনে কৃতজ্ঞ রইল সরমার কাছে।

বিপিনের কার্ড শিয়রের কাছে মাটিতেই পড়ে।

ভারী ইচ্ছে হল অবিনাশের, আজকের দিনে একটা উপহার পাঠায় সরমাকে। বাজারে কেনা লোক-দেখানো উপহার নয়। অন্য কিছু। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দিল ইচ্ছেটা। আজ অন্তত নয়, পরে ভেবে দেখা যাবে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে সচকিত হল।

ডাঃ চন্দ্র। ধুতি পাঞ্জাবি চাদর, এ বেশে কখনো দেখেনি তাঁকে। সোল্লাসে উঠে বসল।

মাস্টারমশাই! আসুন আসুন, এই—কোথায়ই বা বসাই আপনাকে—আচ্ছা এইখানে বসুন। বিছানার-চাদরের একটা দিক ঝেড়ে টান করে দিল।

মৃদু হেসে বসলেন তিনি। ঘড়ি দেখে বললেন, পাঁচটায় পার্টি বিপিনের, সময়মত পৌঁছুতে হবে। কি করছিলে?

খুশি ধরে না অবিনাশের। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, বিজ্ঞাপনের নতুন অর্ডার এনেছি, দামী অর্ডার—ভাবছিলাম নক্সাটা হবে কেমন। আর, আপনি কি না আজই এলেন আমার মধ্যে আর কোনো নক্সার আঁকি-বুঁকি চলছে কি না দেখতে! থামল একটু। উৎফুল্ল দুই চোখ তাঁর মুখের ওপর সন্নিবদ্ধ।—আপনাদের নতুন স্কীম কতদূর, কেমিকাল-ফ্যাক্টরী-কাম-রিসার্চ ল্যাবরেটারি?

চন্দ্র ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, কাজ শুরু হবে শিগগীরই।

পাবলিসিটির দরকার নেই? আমাকে দেবেন এঁকে দেব, চার্জ অবশ্য বেশিই হবে।

অল্প একটু হাসলেন তিনি।

অবিনাশ এতক্ষণে লক্ষ্য করল, কোথায় যেন ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। চকিতে একটা সন্দেহ জাগে মনে। কিন্তু কিছু না বলে চুপ করেই রইল। তখনো জানে না কি জন্যে এঁর এই অপ্রত্যাশিত আগমন।

ক্ষণকাল নীরব থেকে চন্দ্র বললেন, আচ্ছা অবিনাশ, একটা কথা তোমার মনে আছে—গত বারের বড় অসুখটা সবে সেরেছে তোমার, আমাকে শুনিয়ে তুমি সরমাকে বললে, বন্ধুত্ব সম্পর্কটা চলতে পারে তোমার সঙ্গে?

অবিনাশ জিজ্ঞাসু নেত্রে ঘাড় নাড়ল।

শান্ত মুখে চন্দ্র বললেন, ছাত্রর মুখে সেদিন কথাটা শুনতে খুব ভালো লাগেনি প্রথম, কিন্তু মনের কোথাও লেগেছিল নিশ্চয়। তারপর থেকে নিজেও বুঝেছ সেটা। কিন্তু গোড়াতেই যা তুমি শুনিয়ে দিলে, লজ্জা পেয়ে গেছি। মনে মনে আজ কিছু আঁকছ কি না, আর পাঁচজনের মত সাধারণ কৌতূহল নিয়ে সেটাই আমি দেখতে আসতে পারি?

স্বল্প-ভাষী মানুষটির মুখে গভীর কথাগুলি শুনে যথার্থ লজ্জা পেল অবিনাশ।—আমার অন্যায় হয়েছে মাস্টারমশাই।

অপরের বেলায় অন্যায় হয়েছে বলতুম না। চন্দ্র হাসলেন একটু, আজ সকাল থেকে বার বার মনে পড়ছিল তোমাকে, এসে পড়েছি।

দু'জনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ। তাঁর দিকে চেয়ে একটা দ্বন্দ্ব আবারো স্পষ্ট

ধরা পড়ে অবিনাশের চোখে। দ্বিধা কাটিয়ে বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মাস্টারমশাই ?

তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

বৌদিরও নিমন্ত্রণ ছিল তো আজ ?

ছিল, কাজে আটকে গেছেন। কেন ?

একটু হেসে অবিনাশ বলল, থাক্‌গে, এটাই জিজ্ঞাস্য নয় ঠিক।...কিছুদিন আগে খবরের কাগজে তাঁর ছবি দেখলাম এক সিনেমা কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে। ব্যাপারটা আপনার সম্পূর্ণ অমতেই হয়েছে নিশ্চয় ?

হঠাৎ যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলেন চন্দ্র। সহজ ভাবটুকু মিলিয়ে গেল। ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, এসব কথা আজ থাক্‌ অবিনাশ।

থাক্‌। বলল বটে, কিন্তু জবাবের হাত থেকে অত সহজে রেহাই দিল না ভদ্রলোকটিকে। দ্বিধান্বিত কৈফিয়তের সুরে বলল, একটু আগে বলছিলেন, অবিনাশ আর শুধু ছাত্রই নয় আপনার, তাই ভাবলুম তুলতে পারি কথাটা, মন হাল্‌কা হবে আপনার।

চন্দ্র সোজাসুজি খানিক চেয়ে রইলেন তার দিকে। পরে হেসে ফেললেন। —আমি শুধু ভাবি অবিনাশ, তুমি কি করে ফেল করলে বছরের পর বছর।— না, আমি তাঁকে বাধা দিই নি।

কেন দিলেন না ?

লাভ হত না।

আরো কিছু বলার মুখেও থেমে গেলেন যেন। সকাল থেকেই আজ অবিনাশের প্রতি মন টানছিল কেমন। সেটা নিজের কারণে নয়, ওরই জন্য। তাই আসা। কিন্তু উল্টে নিজেরই প্রসঙ্গ নিয়ে এ ভাবে টান পড়তে বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

অবিনাশ অনুভব করে, মানুষটি বাইরে যত শক্ত-সমর্থ হোন ভিতরে ততখানিই দুর্বল। বলল, ভদ্রঘরের মেয়েরা তো হামেশাই নামছে আজকাল ছবিতে, এ নিয়ে দুর্ভাবনা কেন মাস্টারমশাই ?

মৃদু হেসে তিনি জবাব দিলেন, এই জন্যেই তো আজকের দিনটিতে এলাম তোমাকে দেখতে, যদি কিছু শিখতে পারি।

অবিনাশ লজ্জা পেয়ে গেল। একটু বাদে বলল, আমার ওপর আপনার স্নেহ যত বাড়ছে সুরমার ওপর রাগও হচ্ছে ততটাই, না মাস্টারমশাই ?

চট করে জবাব দিয়ে উঠতে পারলেন না চন্দ্র। পরে আস্তে আস্তে বললেন, রাগ কি না জানি নে।···তোমার রূপ নেই, স্বাস্থ্য নেই, কিন্তু যা আছে তার দাম কেন দিতে পারল না সরমাও, ভেবে পাইনে।

আর কি আছে, টাকাও তো নেই!

না তাও নেই।

অবিনাশ হেসে ফেলল, আমিও ভাবি মাস্টারমশাই, এতবড় বিজ্ঞানী আপনি কি করে হলেন। এমন অবিচারই যদি নিজের ওপর করত সরমা, শুধুই যে আদর্শের বোঝা হয়ে উঠত আমার কাছে, রক্ত-মাংসের মানুষ বলে কোনদিন কি ভালবাসতে পারতুম। নীরব স্বল্পক্ষণ।—আমাকে নিয়ে নিজের সঙ্গে ওর সেই দ্বন্দ্বের কথা মনে হলে যেমন হাসি পায়, ভালও লাগে তেমনি।···কোনদিন ও এতটুকু ছলনা যে করেনি এইটেই বড় কথা মাস্টারমশাই।

চন্দ্র নিঃশব্দে দেখছেন শুধু। মনে পড়ল, ওর রোগশয্যায় সরমা একদিন দুধ খাওয়া নিয়ে রাগ করে বলেছিল, সমস্ত শরীরের মধ্যে আছে তো দুটো চোখ। তার দিকে চেয়ে কথাটা হঠাৎ নতুন করে অনুভব করলেন যেন।

উঠে দাঁড়ালেন।—এবার যেতে হবে। তুমি···?

অবিনাশ মুচকি হেসে ক্ষুদ্র জবাব দিল, না—। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি খানিকটা।

আধুনিক রুচি মাফিক পার্টি। ইঙ্গ-বঙ্গ এমন কি পাশ্চিমি গোঁজামিলও চোখে পড়ে। অভ্যাগতদের বেশির ভাগ শেয়ার বাজারের অন্তরঙ্গ সুহৃদবৃন্দ। সহকারী ঘনশ্যামবাবুও উপস্থিত। মণ্টুর বন্ধু-বান্ধবদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। আতিথ্যের ত্রুটি নেই। স্বয়ং বিপিন চৌধুরী শশব্যস্তে তদারক করে বেড়াচ্ছে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত।

মিসেসকে নিয়ে এলেন না মিঃ পারেখ, ভারী অন্যায় কিন্তু—

রাম রাম শেঠজি, বহুৎ মেহেরবানি—

বুলু কখন এলে, কাকীমার সঙ্গে দেখা করেছ তো? বউ—? ওই তো, যাও না—

নমস্কার মিসেস্ আইচ, মিঃ আইচকে সাবধান করে দিয়েছি, স্পেকুলেশানে মার যদি খাই তল্পিতল্পা গুটিয়ে সন্ন্যাসী হব—

এই যে ভাই, মণ্টু ওদিকে—

হিসেবী মানুষ ঘনশ্যামবাবু নির্বাক।। যা উড়ুনচণ্ডে স্বভাব, কোন দিন না তাঁকে সুদ্ধু...

মণ্টু একে একে তার বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিল সরমার সঙ্গে। হাসিখুশি দেখে মনে হবে তারই বিশেষ দিন। সরমা এক ফাঁকে ওকে কাছে ডেকে ঠাট্টাও করল এ নিয়ে। কিন্তু ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠছে কেমন। অবিনাশের জন্য দুশ্চিন্তা ছিল, এ পরিবেশে এখন নিজেরই অস্বস্তি লাগছে যেন। নিজের কেউ বলতে মণিময় পর্যন্ত আসেনি তখনো।

হঠাৎ দরজার দিকে চোখ পড়তে স্মিত হাস্যে উঠে দাঁড়াল। আগন্তুক ডাঃ চন্দ্র। কাছে এসে সরমা পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। জিজ্ঞাসা করল, বৌদি এলেন না?

জবাব দেবার আগেই ওধার থেকে বিপিন ছুটে এলো হন্তদন্ত হয়ে।— এতক্ষণে সময় হল মোহিনীদার! আমার ভয় হচ্ছিল গবেষণায় ডুব দিয়ে হয়ত ভুলেই গেলে সব। বৌদি কই?

চন্দ্র বললেন, তিনি আসতে পারলেন না...বেশি দেরি হয়ে গেল আমার?

না, কিন্তু বৌদি আসতে পারলেন না মানে? আরো কি বলতে যাচ্ছিল বিপিন, থেমে গেল। অপর্ণার ছায়াচিত্রে যোগদানের খবর তাদেরও অবিদিত নয়। চন্দ্রর দিকে চেয়ে সঙ্কোচ অনুভব করল কেমন। বলল, আচ্ছা পরে বোঝাপড়া হবে বৌদির সঙ্গে—সরমা মোহিনীদাকে তোমার কাছে নিয়ে বসাও, ইনিও আর কাউকে চেনেন না এখানে, তুমিও না।

হেসে বিপিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চ-কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করলেন চন্দ্র, সে কি হে, চেনাশুনাটাও করে নিতে পারনি এখনো!

বিপিন সহাস্যে আর একদিকে চলে গেল। ঠাট্টাটুকু কানে গেছে সরমার। মুখে রং লাগল একপ্রস্থ। চন্দ্র আসন নিলেন।

অদূরে উপহার সাজানো টেবিলটা চোখে পড়তে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে ছোট গহনার কেস্ বার করলেন একটা। সরমার দিকে এগিয়ে দিলেন। —অপর্ণার বদলে আমাকেই নিয়ে আসতে হল এটা।

অনেকটা সহজ মুখে হাল্কা আপত্তি জানাল সরমা, ও আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান, তাঁর হাত থেকে নেব।

হাসলেন তিনি, দেখা হলে লজ্জা দিও, ধরো—।

সুরমা হাসিমুখে বাক্সটা নিয়ে ভিতরের বস্তুটি দেখল একবার। পরে সেটা হাতে রেখেই জিজ্ঞাসা করল, সায়েন্স কলেজ ছেড়ে দিচ্ছেন তো আপনি ?

হ্যাঁ—

ডাঃ সমাদ্দারের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম।

চন্দ্র বললেন, সব জানি, কিন্তু আজ কোন কাজের কথা নয়। এমনিতেই যথেষ্ট দুর্নাম আছে, তার ওপর আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিপিন খোঁচা দিয়ে রেখেছে।

মনের গুমোট ভাবটুকু কেটে গেছে তাঁর। কথার ফাঁকে ফাঁকে সরমাকে দেখছেন। অনুসন্ধিৎসু কৌতূহল চোখে। কিন্তু না। অবিনাশ বলে কাউকে সে চেনে এমনও মনে হল না।

উৎফুল্লমুখে বিপিন মণিময়ের বাহু-বেষ্টন করে একপ্রকার টানতে টানতেই নিয়ে এলো এদিকে।—বসুন বোনের কাছে, আপনি বিশেষ লোক আজ, আর আপনারই দেরি!

তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার ছুটল সে। সরমা ঈষৎ হেসে তাকালো অগ্রজের দিকে। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, সম্মুখের মানুষটিকে দেখামাত্র মণিময় আড়ষ্ট, নিষ্প্রভ। ডাঃ চন্দ্রও ইচ্ছে করেই চেয়ে আছেন আর একদিকে, যেন কোন আগন্তুককে লক্ষ্যই করেন নি।

শুকনো হেসে মণিময় কুশল প্রশ্ন করল, কি রে কেমন আছিস ?

হঠাৎ একটা সন্দেহ জাগে সরমার মনে। অপর্ণার চলচ্চিত্র অভিযান রহস্য দুর্বোধ্য নয় আর। তাকে গান শেখানোর প্রসঙ্গে সেদিনের ঠাট্টার ফলে মণিময়ের উগ্র মূর্তিও চকিতে মনে পড়ে যায়। তিক্ত একটা অনুভূতি যেন সম্পূর্ণ আড়ষ্ট করে ফেলল তাকেও। মৃদু গলায় শুধু বলল, বোসো—।

কতগুলি ছোট ছোট সংঘাত, ছোট ছোট যোগাযোগ। হয়ত তাদের ভিত্তি নেই কিছু, তাৎপর্য নেই কোন সুস্থ বুদ্ধির বিবেচনায়। তবু অতি সহজে এগুলো পারে মানুষের জীবন-ধারা বিপর্যস্ত করে ফেলতে। বিচিত্র সংমিশ্রণে গড়া এই মন আত্মিক শক্তিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় শেকল-ছেঁড়া খ্যাপার মত, যার না আছে অর্থ, না কিছু।

বিপিনকে নিমন্ত্রণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অপর্ণা। কিন্তু স্টুডিওতে এসে দেখে, যে সেটিংএর ব্যবস্থা সেদিন, সন্ধ্যার আগে ছাড়া পাবে না। সাত

পাঁচ ভেবে চন্দ্রকে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিল ড্রাইভারের হাতে।—ফিরতে দেরি হবার সম্ভাবনা, অপেক্ষা করার দরকার নেই।

কিন্তু ওপরঅলার অভিপ্রায় অন্যরকম। দেখা গেল কিছু 'শট্' স্থগিত থাকায় অন্যদিন অপেক্ষা সেদিনের কাজ আগেই শেষ।

চিঠি রেখে চন্দ্র গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। অপর্ণা ঊর্ধ্বশ্বাসে রওনা হল বাড়ির দিকে। নির্দিষ্ট সময়ের আগে পৌঁছেও সাক্ষাৎ হল না। চন্দ্র বেরিয়ে গেছেন। বিরক্তিতে ভরে গেল মনটা। চুপ করে বসে ভাবল খানিকক্ষণ।

টেবিলের ওপর বিপিনের নিমন্ত্রণের কার্ড পড়ে আছে। বাড়ির ঠিকানা নোট করে আবার বেরিয়ে পড়ল গাড়ি নিয়ে।

সেদিনের সেই রাতে যার যার গুরুভার নিয়ে অতি কাছাকাছি এসে পড়েছিল যে দু'জন, প্রাণের বিনিময় হয়ত ছিল তাতে। চন্দ্রর আশা ছিল, সঙ্কল্প ত্যাগ করবে অপর্ণা। কিন্তু যে প্ররোচনায় অপর্ণার তরফ থেকে মণিময়ের প্রথম আমন্ত্রণ এ বাড়িতে, চিত্রাভিনয়ের পরিকল্পনা তারই পরের ধাপ। সেই রাতের প্রাণের স্পর্শে তারা যদি উপলব্ধি করেও থাকে কিছু, মনের গতি চিরকালই জটিল পথে।

কিন্তু সুরা পান নিয়ে ছলনা চলে, পানের পরে নয়। অমোঘ প্রতিক্রিয়া আছে ও বস্তুর। অপর্ণা প্রথম কিছুদিন অভিনয় সম্পন্ন করেছে সকৌতুক আগ্রহে। কিন্তু অচিরে কখন অন্তর স্পর্শ করে এ প্রহসন। ভাঙন ধরে খেলার আবরণে। অনাস্বাদিত শিহরণ লাগে প্রতি অঙ্গে। মদিরোচ্ছল পূর্ণতায় ভরে যায় দেহ মন।

অভিনয়ের ফাঁকি গেল।

ড্রাইভার, রোখো রোখো—। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে গাড়ি থামতে নির্দেশ দিল অপর্ণা।

পাশ দেবার জন্য যে লোকটা সরে দাঁড়িয়েছে একধারে, সে অবিনাশ। অপর্ণা ডাকল।

অবিনাশ একটা কিছু ভাবছিল হয়ত, শুনতে পেল না। চন্দ্রকে বিদায় দিয়েছে একটু আগে, এরই মধ্যে আর এক বিস্ময়কর যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত ছিল না। চলতে শুরু করল।

গাড়িটা আবারও এসে থামল পাশে। অবিনাশ থমকে দাঁড়াল।—কি আশ্চর্য, আপনি!

দেখুন ঠিক কি না, যে ভাবে পথ চলেন গাড়ি চাপা পড়বেন যে !

কাছে এসে দরজা ধরে দাঁড়াল অবিনাশ। হেসে বলল, এ রকম গাড়ি চাপা পড়লে দুঃখ হবে না খুব, চাই কি কাগজে ছবি উঠে যেতে পারে।...কিন্তু আপনি কি কাজে আটকে গেছেন শুনলাম ?

আমি! ও, হ্যাঁ...কোথায় শুনলেন ? জিজ্ঞাসু দুই চোখ তার মুখের ওপর রাখল অপর্ণা।

উৎফুল্ল মুখে অবিনাশ জবাব দিল, তাই তো ভাবছিলাম কার মুখ দেখে ঘুম ভাঙল আজ, বলা নেই কওয়া নেই মাস্টারমশাই সশরীরে উপস্থিত আমার ভাঙা কুঁড়েয়, আধ-ঘণ্টা না যেতে আবার আপনার সঙ্গে দেখা এতবড় পথে! দিনটা ভালো যাবে মনে হচ্ছে।

একটা জিজ্ঞাসা রেখাপাত করে অপর্ণার মনে।...মানুষটা অবহেলার নয় আগেও জানতো। গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে ডাকল, আসুন তাহলে—

কোথায় ? অবিনাশ ভড়কে গেল প্রায়।

শুধু দেখায় কি আর দিন ভালো যায়। ও কি! আপনারও আবার লজ্জা আছে নাকি ? আসুন—

মনে মনে বিব্রত হলেও বেশ যেন আহত হয়েছে এমনি মুখ করে অবিনাশ বলল, এমন কি আচরণ করলাম বৌদি যে ধরে নিলেন মানুষটা একেবারে নির্লজ্জ আমি। থামল একটু, কিন্তু সত্যিই যাচ্ছেন কোথায় ?

অপর্ণা এবারেও সোজাসুজি নিরীক্ষণ করল তাকে। দু'চার মুহূর্ত। তারপর জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার কোথাও যাবার কথা নেই এখন ?

অবিনাশ হাসল। যেমন হেসেছিল চন্দ্রর সামনে। কিন্তু অপর্ণার জিজ্ঞাসা আরো স্পষ্ট। এবং আর একটু নির্দয়ও যেন। অন্তত সেই রকমই মনে হল অবিনাশের। তাই হাসিটা একরকম হলেও জবাবটা একরকম হল না। সবিনয়ে বলল, আপনার কৌতূহলের উপযুক্ত নই বৌদি।

তার মুখের ওপর অপর্ণার পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে আরো কয়েক মুহূর্ত। পরে হেসে বলে উঠল, দেমাক তো কম নয়, ডাকছি এতক্ষণ ধরে শুধু কথার ওপর কথা! ঈষৎ নিচু গলায় বলল, আসুন খারাপ লাগবে না খুব।

মনে মনে বিস্মিত অবিনাশ। আর আপত্তি না করে উঠে বসল তার পাশে। ড্রাইভার স্টার্ট দিল আবার।

অবিনাশ বলল, আমার খারাপ লাগবে না জানি, আপনার কেমন লাগবে

সেটাই ভাবনা। মূর্তিটি আমার এমন মাজা-ঘষা যে এদিকে তাকালে নিজের চেহারাটি পর্যন্ত দেখতে পাবেন বোধহয়।

অপর্ণা চকিতে ঘাড় ফেরাল তার দিকে। পরে হেসে বলল, কথাগুলোর অর্থ কি সাদা বাংলা না আর কিছু ?

আর কি ! নিরীহ বিস্ময়ের অভিব্যক্তি অবিনাশের মুখে।

বাঁচলুম···।

উৎফুল্ল মুখেই বিনয় প্রকাশ করে অবিনাশ, কথার যদি অর্থই থাকবে এত, সাতবার করে পরীক্ষায় ফেল করি !

অপর্ণা সায় দেয় তেমনি, ঠিক। ঘুরে বসল একটু তার দিকে।—যাচ্ছিলেন কোথায় ?

বাড়ির দিকে।

আপনার মাস্টারমশাই নিমন্ত্রণ রাখতে গেছেন ?

হ্যাঁ। আপনি গেলেন না ?

একটু থেমে অপর্ণা জবাব দিল, কি জানি···শুনলেন তো কাজে আটকে গেছি। হঠাৎ তার দিকে চোখ রেখে হাসল একটু, কাজটা কি বলেন নি ?

অবিনাশ বিব্রত মুখে সামনের দিকে তাকালো।

হেসে উঠল অপর্ণা, ড্রাইভার বাংলা বোঝে না, নির্ভয়ে জবাব দিতে পারেন। আর আপনার বাড়ির পথটাও বলে দিন ওকে, নামিয়ে দিয়ে যাই—।

এ উচ্ছলতার হেতু অবিনাশের হৃদয়ঙ্গম হল না সঠিক। সে জানতে চায় কি সেটুকু অবশ্য সুস্পষ্ট। বলল, ড্রাইভার বাঙ্গালী নয় যখন বাংলা না বোঝাই স্বাভাবিক, কিন্তু বুঝলাম না যে কিছু আমিও !

হুঁ উঁ ? সকৌতুক কটাক্ষে ব্যাঙ্গোচ্ছল একটা শব্দ নির্গত হল অপর্ণার কণ্ঠ থেকে।

পরিহাসের লোভ সংবরণ করতে পারল না অবিনাশ। বলল, আমার মোটা মাথায় কৌতূহল জিনিসটাই একটু কম বৌদি, সবই পণ্ডশ্রম আপনার—অচল টাকা জোর করে বাজাতে গেলেই বাজবে কেন !

মুখের হাসি স্তিমিত হয়ে আসে অপর্ণার। হঠাৎ যেন উপলব্ধি করে, লোকটি মণিময় নয়। এর জাত আলাদা। সাতবার ফেল করা সত্বেও চন্দ্র শ্রদ্ধা করেন একেই, আর মণিময়ের মতে য়ুনিভার্সিটির নাম করা ভাল ছাত্রী সরমার মত

মেয়েরও একমাত্র রহস্যজনক অন্তরঙ্গ মানুষ এই লোকটিই। অপর্ণার সহ্যগুণ কম, বসে থাকে গুম হয়ে।

অবিনাশ জানালো, সামনের বাঁয়ের পথে তার বাড়ি।

নামতে হবে না।

অবিনাশের নির্বাক বিস্ময়ের জবাবে কণ্ঠস্বরে আরও জোর দিয়ে অপর্ণা বলে ওঠে, আমি সিনেমায় প্লে করতে নেমেছি আপনি জানেন সে কথা ?

অবিনাশের জিজ্ঞাসু দু'চোখ তার মুখের ওপর সন্নিবদ্ধ। সোজা চলল গাড়ি।

জানেন ?

জানি।

আপনার মাস্টারমশাইয়ের কাছে শুনলেন ?

হাসতে লাগল অবিনাশ।—ঠিক যে কি আপনি শুনতে চান বৌদি সেটুকুই সোজাসুজি বলুন না! আমি নিরীহ মানুষ আমার ওপর এ রাগারাগি কেন ?

থতমত খেয়ে অপর্ণা হেসে ফেলল।

অবিনাশও বাঁচল যেন। বলল, খবরের কাগজে আপনার ছবিটা চোখে পড়বার জন্যেই দিয়েছিলেন বিজ্ঞাপন-দাতারা। পড়েছেও। তেমনি হাল্কা কণ্ঠেই বলে গেল সে, আজ আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই ভাবছি, আর দু'দিন বাদে যাঁকে দেখবার জন্য এতবড় বোম্বাই শহর হত্যা দেবে সিনেমার দরজায়, আমি অবিনাশ শর্মা কি না তাঁরই পাশে বসে মোটরে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছি, এ আনন্দ রাখি কোথায়! কিন্তু আপনার রকম-সকম দেখে প্রায় হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে আমার—।

নীরবে তার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিতে চেষ্টা করল অপর্ণা। পরে হেসেই বলল, ছাই হয়েছে আপনার।

আরও খানিকটা অগ্রসর হবার পর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে।

আজ পথের ধারে অবিনাশকে দেখে হঠাৎ আটকে রাখল কোন্ খেয়ালে, অপর্ণা জানে না নিজেও। আত্ম-সমর্থনের অভাব ঘটে যখন, হয়ত এমনি করেই বাইরের সমর্থন খুঁজে বেড়ায় মানুষ। পেলে খুব যে খুশি হয় এমন নয়, কিন্তু প্রাণঘাতী জ্বালার মত লাগে সেটুকুও না পাওয়া। এ ধরনেরই একটা আঘাত উৎক্ষিপ্ত করে তুলল অপর্ণাকে।

কিন্তু এবারে অবিনাশই প্রস্তুত মনে মনে। ধীর, শান্ত মুখে বলল, এতক্ষণ

এ আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছিলাম বৌদি, কিন্তু আপনিই ছাড়লেন না। তা ছাড়া বাইরের মানুষ হলেও বরাত জোরে আপনাদের এত কাছে এসে গেছি যখন, সাহস বেড়েছে।...অনেক দিন বাদে আজ মাস্টারমশাইকে দেখে মনে হল, মনটা খুব সুস্থ নয় তাঁর। তাই, আপনার ওই ছবিতে নামার কথাটা আমিই তুলেছিলাম জোর করে।

সশ্লেষে অপর্ণা বাধা দিয়ে ওঠে, বিশেষ করে আজকের দিনেই তাঁর মনের অসুস্থতা অন্য কারণেও তো হতে পারে।

বলে ফেলেই সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হয়ে গেল যেন। অজস্র ধিক্কার দিল নিজেকে। সামলে নিতে চেষ্টা করল তাড়াতাড়ি, আমি পার্টিতে যেতে পারলুম না বলেও হতে পারে মন খারাপ! যাক, কি বললেন তিনি?

গভীর দৃষ্টিতে অবিনাশ চেষ্টা করল তার মুখভাব নিরীক্ষণ করতে। অন্ধকারে বোঝা গেল না ঠিক। ভারী ইচ্ছে হল, তাকে কাছে টেনে এনে পরীক্ষা করে দেখে কি গোপন করে গেল। একটু থেমে গম্ভীর মুখে জবাব দিল, তিনি বললেন না কিছু, বরং জানালেন, ভুল তাঁরই।

এই সম্বন্ধেই যাহোক কিছু শোনবার জন্য অপর্ণা উদগ্রীব ছিল সারাক্ষণ। শোনার পর মন বিরূপ হল অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই। স্বল্প-পরিচিত এই মানুষটির সঙ্গে আজ সর্বক্ষণ তার নিজের আচরণের অস্বাভাবিকতা ভেবে দেখার নেই অবকাশ, নেই ধৈর্য। উলটে চন্দ্রর ওপরেই গুমরে উঠল মনে মনে, বাইরের মানুষের সঙ্গে ঘরের কথা নিয়ে এসব আলোচনা কেন।

ব্যঙ্গোক্তি করল, গুরুশিষ্যের আলাপের বিষয়বস্তুটি চমৎকার। তারপর, আপনি আমারই ভুলটা প্রমাণ করতে লেগে গেলেন বোধহয়?

না, বরং সান্ত্বনা দিলাম এরকম হামেশাই হচ্ছে আজকাল, অন্যায় কিছু নয়।

সান্ত্বনা! দপ্ করে এক ঝলক আগুন জ্বলে উঠল যেন অপর্ণার চোখে। চাপা হাসির ছটায় প্রায় ফেটে পড়তে চাইল পরক্ষণে। বলে উঠল, নীতির দাগটা তাহলে অন্যায়ের ঘর ছুঁয়েচে একশ পাঁচ ডিগ্রি জ্বরের মত, কি বলেন? অন্ধকারে ছাই মুখও দেখতে পাইনে ভালো করে।...ঘন হয়ে সরে এলো পাশে।—তারপর?

অবিনাশ বাকশক্তি-রহিত ক্ষণকাল। রহস্যের মত লাগে। সঠিক যেন বোঝেনি একে। বলল, আপনি হাসছেন সত্যি, কিন্তু রাগটুকু বুঝতে পারি। এ আলোচনা থাক।

ও মা, আমি রাগব কি! জোরেই হেসে উঠল আরো। ভেতরে কোন পদার্থ থাকলে তো, উলটে ভালোই লাগছে শুনতে।···তা, পেলেন তিনি সান্ত্বনা?

জানিনে ঠিক—। অবিনাশের অস্বস্তি বাড়ে। সপ্রগল্‌ভ সান্নিধ্যে ওর শাড়ির আঁচল এবং সামনের দু'এক গোছা অবাধ্য চুল ক্ষণে ক্ষণে এসে লাগছে চোখে মুখে।

বেশ—। অপর্ণা সম্পূর্ণ ঝুঁকে বসেছে তার দিকে। কাঁধে কাঁধ লাগল। মাঝের সামান্য ফাঁকটুকুও গেছে প্রায়।—বলল, এখন সব জড়িয়ে আপনার বক্তব্য কি?

চেষ্টা করেও অবিনাশ হাসতে পারল না আর। জবাব দিল, মাস্টার-মশাইয়ের ভুল যদি কিছু থাকেও, আপনার দিক থেকে আর একটা ভুল দিয়ে তার জের মিটবে না।

চমৎকার! আর কিছু?

না।

অপর্ণা হেসে উঠল উচ্ছল কণ্ঠে। অবিনাশের হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উৎফুল্ল মুখে বলল, এতক্ষণে বুঝলাম সরমাকে কেন খুইয়ে বসেছেন আপনি। উপদেশ আর বক্তৃতা দু'টোই যে দু'চোখের বিষ মেয়েদের, গতি হবে কি আপনার?

অবিনাশ সরে বসতে চেষ্টা করল একটু। পরে ফিরে তাকালো একবার। আঘাত দেবার জন্য ওর এই সঙ্গোপন ব্যথার জায়গাটুকুই বেছে নিতে পারে কেউ, ভাবেনি। কিন্তু আশ্চর্য, যতটা লাগা উচিত অবিনাশের, ততটা যেন লাগল না। চোখ ফিরিয়ে নিতে হল।···পার্শ্ববর্তিনী বিচিত্ররূপিনী।

অপর্ণা ড্রাইভারকে আদেশ দিল গাড়ি বাঁয়ে ঘোরাতে। পরে আবার বলল, কিছু ভয় নেই, নীতির বালাই নেই যখন, আমি আছি রোগ সারিয়ে দেব'খন আপনার।

নিজের অজ্ঞাতেই আবারও তাকালো অবিনাশ। সারা দেহে অননুভূত যাতনা একটা। প্রকাশের তাড়না। বুভুক্ষু বেদনা। অন্ধকার সত্ত্বেও কঠিন এক ঝলক হাসির আভায় অপরূপ দেখাচ্ছে অপর্ণাকে। তার তপ্ত নিঃশ্বাস, উষ্ণ স্পর্শ এবং দাহ্য সান্নিধ্য ক্রমশ যেন নিষ্ক্রিয় করে ফেলছে অবিনাশকে। বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত। মুগ্ধ, বিহ্বল।

কিছুক্ষণ। অবিনাশ সামলে নিল।

অন্তস্তলের একটা শুভ চেতনা এই ক্ষণিকের মোহজাল থেকে যেন টেনে তুলল ওকে। আরো খানিক চুপ করে থেকে খুব ধীর, খুব শান্ত মুখে বলল, নিজেকে ভাল ক'রে জানি বলেই এও জানি বৌদি, মেয়েদের কাছে কোনদিনই কিছু প্রাপ্য নেই আমার। এ ব্যর্থতার ব্যথা আছেই, মানুষটা আমি সবল এমন অহঙ্কার তো কোনদিন রাখিনে। কতটুকুই বা দাম আমার মত মানুষের মুখের দুটো মন-রাখা কথার।...সেটুকু পেলেন না বলে এতবড় নির্মম পরীক্ষা আপনার!

সহসা কে যেন একপ্রস্থ কালি লেপে দিল অপর্ণার সমস্ত মুখে। স্তব্ধ, নিস্পন্দ।

নীরবে সরে এলো এক কোণে।

বসে রইল নিষ্প্রাণ মূর্তির মত।

ড্রাইভার গাড়ি থামাও। অবিনাশ বলল, এক তলার ওই ঘরটায় আমি থাকি...আপনি নামবেন?

জবাব পেল না। একটু অপেক্ষা করে নেমে চলে গেল সে। অপর্ণার অগ্নিদৃষ্টি অন্ধকারে অনুসরণ করল তাকে। তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে ড্রাইভারকে অস্ফুট নির্দেশ দিল গাড়ি চালাতে।

চন্দ্রকে সান্ত্বনা দেওয়ার কথাটা ওর মুখে শোনামাত্র দুর্বার আক্রোশে জ্ঞান হারিয়েছিল। ভেবেছিল, চূর্ণ করে দেবে শুকনো নীতির মুখোশ, কামনার নগ্নমূর্তি দেখিয়ে দেবে নিজেদেরই—অস্ত্র আছে তারই হাতে। অবিনাশের দুর্বলতার আঁচ পাওয়া মাত্র প্রতিঘাতের আনন্দে ঝক্‌মকিয়ে উঠেছিল সমস্ত মুখ। আর একটু...। তীব্র শ্লেষে ঐ সান্ত্বনার কথাটাই ফিরে স্মরণ করিয়ে দিত।

কিন্তু কি হয়ে গেল কোথা দিয়ে। নিজেকে প্রকাশ করেও শান্ত মুখে সে যা ফিরিয়ে দিয়ে গেল তার বৃশ্চিক দাহনে জ্বলে যাচ্ছে সমস্ত ভিতরটা। অভিসারিকার ছলনায় এক উপবাসক্লিষ্ট অন্তরে দাগ ফেলার প্রয়াস শুধু হীনতা নয়, নিষ্ঠুরতাও। ফলে, যে হিংস্র মূর্তি চোখে পড়ে নিজের, এমন যেন আর কোনদিন দেখেনি। অবিনাশের শেষের কথাগুলি বার বার অব্যক্ত ক্ষোভে অস্থির করে তুলল অপর্ণাকে।

হাত-ঘড়িতে সময় দেখে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল বিপিন চৌধুরীর ঠিকানায় যেতে।

ঘরের তালা খুলে অবিনাশ আলো জেলে বিছানায় বসল চুপ করে। কিসের একটা অবসাদে আচ্ছন্ন সমস্ত দেহ। একজনের তপ্ত নিঃশ্বাস এবং উষ্ণ স্পর্শ এখনো যেন লেগে আছে। উঠল। কানে মাথায় জল দিয়ে এলো বেশ করে। তারপর জানালা খুলতে গিয়ে চোখে পড়ল মাটিতে বিপিন চৌধুরীর নিমন্ত্রণ-পত্র।

চকিতে সময় দেখল ঘড়িতে। না যাওয়াটা সুশোভন হল না। কিন্তু সময় নেই আর ত্রুটি সংশোধনের।

অন্যমনস্কে কাটল কতক্ষণ খেয়াল নেই। নিজের অজ্ঞাতে একটা বড় নিঃশ্বাস মিশল বাতাসে। চিঠিটা রেখে আলো নিবিয়ে দিল। জানালা দিয়ে একফালি জ্যোৎস্না যেন খলখলিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। জানালার গরাদ ধরে অবিনাশ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। আকাশে অগণিত নক্ষত্রের নীরব সমারোহ!

আর নির্মম কৌতূহল দূরান্ত সপ্তর্ষির অনন্ত জিজ্ঞাসায়।

উৎসব বাড়িতে অভ্যাগতদের বিদায় নেবার পালা। মণিময় ওঠবার উপক্রম করছিল। বিপিন আটকে রেখেছে। চন্দ্রর তাড়া ছিল না খুব, তবু এবার যাবেন ভাবছেন।

বাড়ির গেট পর্যন্ত একজন নিমন্ত্রিতকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বিপিন অপর্ণাকে সঙ্গে করে ফিরল।

উৎসব শেষে এমন একজন সুদর্শনার আগমনে যাবার কথা বিস্মৃত হলেন অনেক আগন্তুক।

বিপিন সোল্লাসে বলে উঠল, মোহিনীদা পর্যন্ত যে হাঁ করে ফেললে! সরমা বোঝাপড়া করে নাও বৌদির সঙ্গে, দুটি ঘণ্টার আগে ছাড়া পাবেন না।

অপর্ণা জবাব দিল, সবে বিয়ে করেছেন, বাইরের লোককে বেশিক্ষণ ধরে রাখলে বউ রাগ করবে।

কাছে এসে সরমা স্মিত হাস্যে দু'হাত তুলে নমস্কার জানাল, আপনি আর আসবেন সত্যিই ভাবিনি।

অপর্ণা একবার তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হাত দু'টি টেনে নিল নিজের দুই হাতে। সকৌতুকে বলল, ভাব নি তো? ওই দেখুন বিপিনবাবু, আপনি খুশি হলে কি হবে, বউ ভাবনায় পড়েচে। আপনি টাপনি বাদ দিলুম ভাই,

কিছু মনে কোরো না। ফিরে তাকালো একবার চন্দ্রর দিকে।—না এসে উপায় আছে, তোমার মাস্টারমশাই কি আর তাহলে মুখ দেখতেন আমার!

বিপিন টিপ্পনী কাটল, খুব ভয় তো আপনার!

অপর্ণা ছদ্ম গাম্ভীর্যে জবাব দিল, খুব—। পরে এক ঝলক হেসে বলল, কিন্তু আমার যে ক্ষিদে পেয়ে গেছে, খেতে টেতে দেবেন না? সব শেষ নাকি!

বিপিন হাঁকডাক করে বেয়ারাকে আদেশ দিল খাবার নিয়ে আসতে। হাসছিল সবাই। ডাঃ চন্দ্রও।

অপর্ণার হঠাৎ চোখ পড়ে মণিময়ের ওপর। ঈষৎ থমকে গিয়ে বলল, কি আশ্চর্য, আপনি এখানে চুপটি করে বসে! আমি তো দেখতেই পাইনি, এই জন্যেই বুঝি আজ স্টুডিও কামাই?

বিব্রত মুখে মণিময় হাসল একটু।—না, অন্য জায়গায় কাজ ছিল, আপনার এত দেরি?

হবে না! শুটিং কি আর শেষ হয় ছাই, আসতে পেরেচি এই ঢের।

একমাত্র চন্দ্র বুঝলেন, সম্পূর্ণ ইচ্ছে করেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করল অপর্ণা। নিজের অজ্ঞাতে সরমা কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল একটু। কাছাকাছি দুই-একজন যাঁরা ছিলেন সাগ্রহে সম্পূর্ণই ঘুরে বসলেন এবার। বিপিন শোনেনি কিছু, নিজেই একটা ছোট টেবিল এনে পেতে দিল অপর্ণার সামনে।

অপর্ণার মুখে ব্যতিক্রম নেই এতটুকু। পৃথক-জগতের আনন্দ-স্বরূপিনী যেন। খাওয়ার তাগিদটা নাম মাত্র।

বিপিন অনুযোগ করল, এই আপনার ক্ষিদে?

ও মা, কম খেলাম নাকি!

এর নাম খাওয়া! মিথ্যে খাটালেন, সরমা ধরো না ভালো করে।

অপর্ণা বলল, ধরলে হবে কি, মাস্টারের বউ, এর বেশি অভ্যেস নেই।

চোখ কপালে তুলে ফেলে বিপিন, অ্যাঁ! মোহিনীদা সামনে বসে আর এত বড় দুর্নাম। যাচাই করব কিন্তু—

তেমনি জবাব দিল অপর্ণা, করুন যাচাই, দেয় নাকি ভালো করে খেতে, এই জন্যেই তো এমন ছিরি চেহারার।

বিপিন সরমা এমন কি মণিময়ও হেসে উঠল সশব্দে। বিপিন বলল, আপনার চালাকি বুঝি, যে অপবাদটা চাপিয়েছিলেন মোহিনীদার ঘাড়ে, চেহারার ছিরি দেখিয়ে সেটা নিজেই কাটিয়ে নিলেন আবার।

অপর্ণার হাসি-খুশি উপছে উঠছে যেন। সরমার দিকে একবার কটাক্ষপাত করে বলে উঠল, থাক, আপনি আর বলবেন না কিছু, যে জিনিস সংগ্রহ করেছেন ভয়ে ভয়ে দিন কাটবে। তার ওপর আবার মুখখু সুখখু নয় আমার মত, খাঁটি রত্ন।

লোকজনের সামনে সরমা স্বভাবতই কম কথা বলে। মৃদু হেসে তাকালো তার দিকে।—এবারে বুঝি আমার পালা?

কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল খেয়াল নেই কারো। তারা ক'জন বাদে অন্য নিমন্ত্রিতরা সকলেই চলে গেছেন। চন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন, চলো রাত হল—

চলো। অপর্ণা উঠল তৎক্ষণাৎ। কি মনে হতে মুহূর্তের জন্য ভাবল একটু। ক্ষিপ্র হাতে গলা থেকে বড় লকেটসুদ্ধ হারটা খুলে নিয়ে সরমাকে বলল, এসো—

সবিস্ময়ে সরমা দাঁড়াল একটু।—সে কি! মাস্টারমশাই হাতে করে নিয়ে এলেন একটা, আবার কেন!

চকিতে একবার উপহারের টেবিলের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অপর্ণা সহাস্যে বলল, তোমার বরাত ভালো, আমি তো নিশ্চিন্ত ছিলুম হয়ত বা একটা মাইক্রোসকোপই নিয়ে হাজির হবেন উনি। যাই আনুন, খুলেছি যখন পরতে হবে, এসো।

না, এ ভারি লজ্জার কথা। সরমা প্রতিবাদ করল তবু।

দেখো, আমার রাগ তো জান না, জিজ্ঞেস করে দেখো তোমার মাস্টারমশাইকে, এসো বলচি!

বিব্রত হয়েও হেসে ফেলে সরমা।—কিন্তু এসেই না বললেন, আপনিই খুব ভয় করেন মাস্টারমশাইকে।

হেসে ফেলল অপর্ণাও। ঠিকই বলেছি।

হার সরমার গলায় পরিয়ে দিয়ে চন্দ্রর দিকে ঘুরে দাঁড়াল, চলো—।

এই হার একদা চন্দ্রই নিজে পছন্দ করে অপর্ণাকে কিনে দিয়েছিলেন।

মোটর চলল। দু'জনে দু'ধারে বসে। কিছুক্ষণের নীরবতা। চন্দ্র বললেন, তোমার এই শেষের ব্যবহারে আমি অপমানিত বোধ করেছি অপর্ণা।

অপর্ণা জবাব দিল, অসম্ভব নয়।…বুদ্ধি আছে সরমার, কিছু একটা গলদ হয়ত বা ধরাই পড়েছে।

প্রত্যুত্তরের এই বাঁকা স্বর সুপরিচিত। বাইরের দিকে চোখ ফেরালেন চন্দ্র।

অপর্ণা বলল, কিন্তু কেমন ভালো অভিনয় করি আমি খেয়াল করে দেখলে তো ?

চন্দ্রর মুখের বেদনার্ত ছায়াটুকু চোখে পড়ল না অপর্ণার। উৎসব-গৃহে ওর অপ্রত্যাশিত আগমনে খুশি হয়েছিলেন মানুষটি। মণিময়ের সঙ্গে কথাবার্তা এবং শেষের এই হার পরানো ছাড়া ওর সারাক্ষণের হাসি-কৌতুকে খুঁজে পেয়েছিলেন আগের সহজ স্বস্থ অপর্ণাকে। ভালো লেগেছিল।

নিরুত্তরে সম্পূর্ণ ই ঘুরে বসলেন এবার।

একটু বাদে অপর্ণা শান্ত মুখে বলল, আমাকে নিয়ে মন তোমার এত খারাপ যে বাইরের কে না কে অবিনাশ, সেও দু'টো সান্ত্বনার কথা শোনায় তোমাকে। শুনে আমিও বোধ করেছি খানিকটা অপমান, এটা কি তার চেয়েও বেশি ?

বিস্মিত নেত্রে ফিরে তাকালেন চন্দ্র। বুঝলেন, তিনি চলে আসার পর যেখানেই হোক আজই অবিনাশের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অবিনাশ বলেছে কিছু বিশ্বাস্য নয়। তাকে চেনেন এবং আরো বেশি চেনেন অপর্ণাকে।

বললেন, লোকের মুখ আর চাপা দেবে কি করে। কিন্তু বাইরের কে না কে লোকটা গায়ে পড়েই তোমাকে সান্ত্বনার খবরটা দিয়ে গেল বোধহয় ?

অন্ধকারে নিজের অধর দংশন করল অপর্ণা।

জবাব না পেয়ে হাসলেন তিনি।—অবিনাশকে ঘাঁটাতে গেলে তেমন কিছু বলবে সে এ বোধ হয় আগে জানতে না।

সাড়া শব্দ নেই অপর্ণার।

মিথ্যে যে বলেন নি এ আর অপর্ণার চেয়ে বেশি কে জানে আজ। অন্তর্জ্বালা সত্ত্বেও নিখুঁত অভিনয় করে এলো বিপিন চৌধুরীর বাড়িতে। কিন্তু অবিনাশকে ভুলতে পারে নি এক মুহূর্ত। অপমানের যে কালি মানুষটার সমস্ত মুখে মাখাতে গিয়েছিল রূপের অহঙ্কার আর বুদ্ধির গর্ব নিয়ে, তার সবটুকু ফিরে এসেছে নিজের কাছে।

রাগে দুঃখে বেদনায় অপর্ণা নিঃশব্দে বসে থাকে স্থাণুর মত।

•

শুধু মণিময় ছাড়া বাইরের আর নেই কেউ। বিপিন শেয়ার মার্কেটের গল্প করছিল তার সঙ্গে। সে থামতে মণিময় উঠে দাঁড়াল।

এবার চলি, বেশ রাত হয়ে গেল।

সরমাও চুপচাপ অপেক্ষা করছিল সেই থেকে। ডাকল, দাদা, শোনো—

তাদের কথা বলার অবকাশ দিয়ে বিপিন বেয়ারাদের খোঁজে অন্য দিকে গেল। মণিময় জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলবি ?

শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়াতে জড়াতে সরমা তাকালো তার দিকে।—শুনলাম ডাঃ চন্দ্রর স্ত্রী সিনেমায় নেমেছেন, সে কি তোমার বইএ ?

হ্যাঁ, তুই জানতিস না ? শুকনো হাসি।

না, হঠাৎ এ খেয়াল তাঁর ?

কি জানি। নির্লিপ্ত মুখে জবাব দিল মণিময়, চল্লিশ হাজার টাকা পাচ্ছেন, তার ওপর গানের দাম, নেমে গেলেন। প্রস্থানের উদ্যোগ করল সে।

দাঁড়াও, সরমা বাধা দিল আবার, আমি থাকব না তাই মনে করিয়ে দেওয়া —সময় মত টাকা পাঠাতে ভুলো না বিনুর হস্টেলে…আর, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে এসো তাকে।

কি ভেবে কর্তব্য দু'টো স্মরণ করিয়ে দিল সেই জানে। সাদা কথার তাৎপর্য সাদা মনে গ্রহণ করল না মণিময় মুখ দেখেই বোঝা গেল। কিছু না বলে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সে।

ওপরে এসে চারুদেবীর নির্দেশ মত হাত মুখ ধুয়ে ফুল ছড়ানো বিছানায় এসে বসল সরমা।

ভালো লাগার কথা। কিন্তু তেমন ভালো লাগছে না। এত মানুষ এলো গেল, কিন্তু এলো না যে, শ্রান্ত অবকাশের প্রথম মুহূর্তে মনে সেই মানুষেরই ছায়া পড়ে আবার। তাকে ডাকেও নি আশাও করেনি। কিন্তু ডাকে নি যে, আর আশাও করা চলে না যে, উৎসব আসরেও ঘুরে ফিরে বার বার মনে হয়েছে সে কথা।

খুঁটিনাটি তদারক সেরে বিপিন এলো খানিক বাদেই। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার সামনে বসল। ঘর্মাক্ত।

সরমা তার দিকে চেয়ে হাসল একটু। উঠে পাখার স্পীড্ বাড়িয়ে দিল।—খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তো ?

অনুরাগ-রঞ্জিত প্রেম-গুঞ্জন নয় নব-বধূর। ওতে সরমাকে মানায় না। যা মানায় তা এই। পাখার বেগ বাড়ানো বা অনাড়ম্বর জিজ্ঞাসার ওটুকুতেই শেষ নয়। অনাস্বাদিত স্পর্শের মত লাগে বিপিনের। হেসে বলল, এরকম ছোটাছুটি আমার অভ্যেস আছে। সিগারেট ধরালো একটা।—তোমার খারাপ লাগছে না তো কিছু ?

খারাপ লাগবে কেন? আমি তো দিব্বি বসেই কাটিয়ে দিলাম।

নীরবে ধূম-পান চলল মিনিট খানেক। পার্টির সাফল্যে সারাক্ষণই প্রসন্ন ছিল মন। এখনো তাই। কিন্তু সরমাকে একা পাওয়ার এই লোভনীয় মুহূর্তেই বিপিনেরও যেন মনে পড়ে কিছু। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, অবিনাশবাবু কিন্তু সত্যিই এলেন না শেষ পর্যন্ত। সরমার সপ্রশ্ন চোখে-চোখ রেখে থামল একটু। বলল, আমি নিজে গিয়ে কার্ড রেখে এসেছি, বিশেষ অনুরোধও করেছিলাম।

সরমা অবাক প্রথম। পরে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, আসবে বলেছিল?

না, ঘর তালা-বন্ধ দেখে চিঠির নিচে আলাদা করে লিখে রেখে এসেছিলাম, যেন আসেন।

সরমা চেয়ে থাকে খানিক।—ঘর তালা-বন্ধ তো কার্ড দিলে কাকে?

বিপিন বলল, জানালার শার্সি খুলে বিছানায় ফেলে রেখে এসেছিলাম।

সরমা ভাবল কয়েক মুহূর্ত। ও কার্ড তাহলে মাটিতেই পড়ে আছে, ওর তক্তাপোশ থেকে জানালা তু'তিন হাত দূরে। চোখে চোখ রাখল আবার, কিন্তু আমাকে বলনি তো কিছু?

চিঠি পাওয়া সত্বেও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেনি অবিনাশ, এ সিদ্ধান্ত সরমা মেনে নিলেই বিপিন খুশি হত। হয়ত বা আত্মপ্রসাদজনিত সহানুভূতিও থাকতে পারত অবিনাশের প্রতি। বদলে, জানালা থেকে তার শয্যার দূরত্বের হিসাব ভালো লাগল না তেমন। তবু হেসেই জবাব দিল, তিনি এলে তোমাকে অবাক করে দেব ভেবেছিলাম।

অবিনাশের সম্বন্ধে তার আগ্রহ এই দ্বিতীয়বার লক্ষ্য করল সরমা। হাসল মনে মনে। অবিনাশকে চেনার সুযোগ ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রেখে বলল, রাত হয়েছে, মুখ হাতে জল দিয়ে এসো, ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।

অনুভূতির সূক্ষ্ম বোধটুকু সজাগ হল আবার। সিগারেট ফেলে এবারে ভিন্ন আগ্রহ নিয়ে তাকালো বিপিন। পুরুষের বহু আকাঙ্ক্ষার তুর্লভ মাধুর্য এত কাছে, ছাইয়ের ভাবনা তার।

কি দেখচ? তার দেখার এই পরিবর্তনটুকু উপলব্ধি করেই সহজ হতে চেষ্টা করল সরমাও।

না। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল বিপিন। জামাটা খুলে আল্‌নার দিকে ছুঁড়ে দিল দূর থেকে। আল্‌না টপকে কোথায় গিয়ে পড়ল ওটা দেখার অবকাশ নেই। বিছানায় উঠে তার কোলে মাথা রেখে সটান শুয়ে পড়ল।

সরমা হেসে ফেলল।—কী ?

জবাবে বিপিনের দুই বাহুর, হাতের আঙুলের, নিবিড় স্পর্শে তপ্ত বাসনার আঁচ লাগল সর্বাঙ্গে। সরমা থমকে গেল একটু। শ্বাস রুদ্ধ করে তাকালো তার দিকে। ওই দুই চোখের উষ্ণপিপাসা প্রথম রাত্রিতেও অনুভব করেছে। কিন্তু এক শ্রান্তির ঘোরে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত কেটেছে সরমার সে রাতটা। বিপিন লক্ষ্য করেছিল সেটুকু। লক্ষ্য করেই অন্তর্দৃষ্টির উদারতায় ওর বিশ্রামে আর ব্যাঘাত ঘটায়নি। সাড়া জাগাতে চেষ্টা করেনি।

পরের রাত্রিটা চারুদেবীর মতে কাল-রাত্রি। হলই বা কাগজে কলমে বিয়ে। শুভকর্মের বিধি-বিধান সবই উল্টে দিতে হবে নাকি! অতএব সরমার বিগত রাত্রিটা কেটেছে চারুদেবীর হেপাজতে। এই সংস্কার বিধানের দরুন কেন যে এত স্বস্তি বোধ করেছে সরমা মনে মনে, নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় খুব। আর সমস্ত রাত ধরে বিপিনের মনে হয়েছে, এমন কাল-রাত্রি আর বুঝি হয় না।

তারপর আজকের রাত…।

সরমার রুদ্ধ নিঃশ্বাস মুক্তির অবকাশ পেল না।

যাতনার মত লাগছে এই নিবিড় স্পর্শ, অধর-নিপীড়ন। যাতনা আর অস্বস্তি। কোথায় যেন বাধা একটা। কোন্ অগোচরে। স্মৃতি-পথে। স্পর্শ-যাতনার মধ্যেও সরমা চমকে উঠল প্রায়। কোথায় বাধা কিসের বাধা চিনেছে যেন। উপলব্ধি করেছে যেন। নতুন জীবনে যাকে ছাড়িয়ে এলো, মনের নিভৃত থেকে তাকে একেবারে বিদায় দেওয়া হয়নি বুঝি। জীবন বাস্তবে, যৌবন-বাস্তবে তাকে চায়নি। চায়ও না। কিন্তু অন্তস্তলে তারই ছায়া পড়ে আছে একটা। সেটাই বাধা। সেখানেই বাধা।

সহসা শিউরে উঠে দেহতটের বাঁধ ভেঙে দিয়ে সকল বাধা নিঃশেষ করে দিতে চাইল সরমা। নতুনের অভ্যর্থনায় নিঃশেষ করে দিতে চাইল নিজেকে। সাড়া জাগল। সাড়া জাগালো। আগল-ভাঙা সমর্পণে বিস্মৃতি-ঘন অবসানের আকৃতি।

॥ ১০ ॥

সরমার পড়াশুনায় কামাই হয়ে গেল বেশ কিছু দিন।

আপাত দৃষ্টিতে সে জন্য বিপিনিই দায়ী বটে। হালকা ভ্রূকুটি করে সরমা মাঝে মধ্যে তাকে অনুযোগ করতেও ছাড়েনি। কিন্তু নিজেরও যেন একটা মোহাবেশের মধ্যেই কেটেছে এই ক'টা দিন। সেদিনের সেই সমর্পণের বিহ্বলতা নিজেও ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি বড়। দু'জনার এই বিনিময়ের নিভৃতেও বিপিন চৌধুরীর স্বভাবের পরিবর্তন দেখেনি। তেমনি দুর্দম, তেমনি অশান্ত। প্রায় বন্য। প্রায় হিংস্র। তবু প্রশ্রয় এবং আগ্রহ নিয়েই প্রতীক্ষা করেছে সরমা। না করে পারেনি। এই স্থূল মত্ততা প্রশমনের মধ্যে নিজের বিবশ পরিতৃপ্তিটুকু গোপন লজ্জার মত।

কিন্তু পরীক্ষা সন্নিকট।

পাশের ঘরে বইপত্র গুছিয়ে মণ্টুকে তলব করল সরমা।—তোমার তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে এসো এ ঘরে, অনুরাগ চর্চা শুরু হবে কাল থেকে।

এ ক'দিনে মণ্টুর সঙ্কোচ অনেকটা কেটে গেছে। জবাব দেয়, রেজাল্ট বার হোক, নইলে চর্চাটা হবে কি নিয়ে?

থালি চেয়ার টেবিলেই হবে, নইলে বউ মানুষ সারাক্ষণ বই মুখে নিয়ে বসে থাকলে কাকীমার মেজাজ বিগড়ে যাবে।

ও, মাকে দেখলেই পড়াতে শুরু করে দেবে আমাকে?

ঠিক। হেসে তাকালো সরমা। বরাবরই জানি তোমার বুদ্ধি আছে।

চারুদেবীর সুনজর নেই তার ওপর সরমা জানে। কিন্তু এর থেকেও বড় বিপদ মণ্টুকে নিয়ে। মায়ের বিন্দুমাত্র কটাক্ষও বরদাস্ত করার পাত্র নয় সে। ওর প্রকাশ্য সংগ্রামে সরমা কোথায় পালাবে ভেবে পায় না এক এক সময়। এবারে পথটা মন্দ উদ্ভাবন করেনি। চারুদেবীর মেজাজ নিয়ে লঘু হাসি-ঠাট্টায় বিষয়ের গুরুত্ব চাপা পড়ে।

বিপিন চৌধুরীও ঠাণ্ডা মাথায় চেষ্টা করছে কাজে মন দিতে। শেয়ার বাজারের সচ্ছলতায় টান ধরেছে কিঞ্চিৎ। উঠে পড়ে লাগল আবার। কতগুলি ছোটখাটো ব্যাঙ্কেও শেয়ার কেনা ছিল। ডিরেক্টার হিসেবে সেগুলিরও তদারক শুরু করল। যোগ্যতার প্রশ্ন কোনদিন যেন না ওঠে সরমার মনে। টাকা করতে হবে। অজস্র টাকা। এটাই সে পারে, যা কোন পারার থেকে কম নয়।

কিন্তু বিকেল ছ'টা না বাজতে ছটফটানি শুরু। গৃহাভিমুখী চিত্তকে কাজের হাজার বলগায়ও আটকে রাখা যায় না তখন। অথচ সন্ধ্যে না হতে সরমা বসে যাবে বই নিয়ে। বিরক্ত করা উচিত নয় বলেই নিজের ওপর বিরক্তি বাড়ে।

কখনো বা মণ্টুকে পড়ার ঘরে গল্প করতে দেখে খুশি হয়ে নিজেও চেয়ার টেনে বসে সামনে।—কি রে পরীক্ষার সময় আড্ডা জমিয়েছিস তো।

কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তু প্রায়ই রসায়ন-চর্চাগত। বিরক্তি চেপে কাজের অছিলায় উঠে যেতে হয়। দু'বার ফেল-করা ছেলের পরীক্ষার পরেও কেমেস্ট্রি-প্রীতি দেখে পিত্তি জ্বলে যায়।

সেদিন বিপিন একটু আগেই ফিরল আপিস থেকে। প্রস্তাব করল, চলো সিনেমায় যাই।

সরমা একটু অবাকই হল যেন। সিনেমায় যাবে···এখন ?

বিপিনের উৎসাহ স্তিমিত ওটুকুতেই। তার মন রাখতে সরমা হেসেই বলল, পরীক্ষাটা হয়ে যাক না, ক'টা দিনই বা বাকি আর। কি বলো ?

আচ্ছা।

কিন্তু শিগগীরই এই না যাওয়ার অর্থটা বিকৃত রূপ নিল সম্পূর্ণ। হয়ত সরমাই দায়ী এ জন্য।

বিয়ের পর তিন সপ্তাহ বিগত। অথচ অবিনাশের সাক্ষাৎ নেই। সরমা ভেবেছিল, বিপিনের নিমন্ত্রণ-লিপি চোখে পড়লে মূর্তিমানের আগমন অবশ্য-ম্ভাবী। কিন্তু বৃথা দিন গুনলো বসে। বিবাহিত জীবনের আনন্দটুকুর সঙ্গে সন্তর্পণে মিশে আছে কেমন একটু বেদনা-বোধ। তবু স্থির জানে, অবিনাশের সামনে একবার গিয়ে দাঁড়াতে পারলে সঙ্কোচ কাটবে। নিজেই যাবে যাবে করে যত দিন যায়, সহজে গিয়ে হাজির হওয়ার বাধাও ততো বাড়ে।

পড়াশুনার ফাঁকেও সরমা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে একটু আধটু। অসুখ-বিসুখ করল কিনা তাই বা কে জানে। যে চাপা লোক, একটা খবরও দেবে না হয়ত। বই রেখে দিল তৎক্ষণাৎ। তার যাওয়াই চাই এবং আজই। অবিনাশ পারে তাকে না দেখে থাকতে। অনেক কিছুই পারে সে। কিন্তু ও পারবে না।

আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরবে আপিস থেকে ?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধছিল বিপিন, সোৎসাহে মুখ ফেরাল। কেন বলো তো ?

এক জায়গায় যাব—

তার উৎসুক চোখের দিকে চেয়ে দু'দিন আগে সিনেমায় না যাওয়ার কথাটা কেমন মনে পড়ে গেল সরমার। তবু দ্বিধা কাটিয়ে বলল, অবিনাশের ওখানে। —তোমার সঙ্গেও আলাপ হবে ভালো করে আর নিমন্ত্রণ না রাখার কৈফিয়তও নেব, চলো না?

স্নো-পাউডার ঘষা মুখে উপর্যুপরি ক'টা রেখার কুঞ্চন মিলিয়ে যায়। আলনা থেকে কোট পেড়ে নেবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল বিপিন। কোটের ভাঁজ পরীক্ষা করে কনুইয়ের ওপর ফেলল সেটা।

তুমি যাবে তো যাও না, আমার ফিরতে দেরিই হবে হয়ত, অনেক কাজ হাতে। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে হাসল একটু।—দালাল মানুষ, কোন্ নিমন্ত্রণে কে এলো না এলো অত কি আর মনে করে বসে আছি, কৈফিয়ৎ নেব কি!

সে চলে গেলে বিশেষ কিছু ভাবার অবকাশ পেল না সরমা। সঙ্গে সঙ্গে মণ্টুর আবির্ভাব। জাঁকিয়ে বসল বিছানায়।

দাদা আপিস যাবে তাও তোমার মন খারাপ!

সরমা হেসে যোগ দিল, সত্যিই তো, তুমি আছ কি করতে। আজ বিকেলে বেরুতে হবে আমার সঙ্গে।

কোথায়? মণ্টু উদ্‌গ্রীব!

অত খোঁজে দরকার কি, যেখানে বলব নিয়ে যাবে।

এক পায়ে রাজী, কিন্তু সাড়ে পাঁচটায় যে খেলা আমার?

আগেই বেরুব, খেলার শেষে আবার নিয়ে আসবে আমাকে।

আচ্ছা। ঠাট্টা করতেও ছাড়ল না, একা আর পথে-ঘাটে বেরুবে না ঠিক করলে নাকি?

সরমা গম্ভীর মুখে জবাব দিল, হ্যাঁ।

মণ্টুও চেষ্টা করল গম্ভীর হতে, বলল, ভালোই করেছ, নইলে মা বলবে, নতুন বউ বলা নেই কওয়া নেই হুট হুট করে বাড়ির বার হলেই হল!

হাস্যধ্বনি।

মণ্টু একেবারে মিথ্যে আঁচ করেনি হয়ত। কিন্তু ওটাই বড় কারণ নয়। জীবনের নতুন অধ্যায় থেকে পুরানো দিনে ফিরে যাওয়া। ক্ষণিকের বিড়ম্বনাটুকু সইয়ে নেবার জন্যও একজনের আড়াল দরকার।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রসন্নতা বাড়তে লাগল বিপিন চৌধুরীর। সেদিন উৎসব-রাত্রির সেই ছোট জিজ্ঞাসাটুকু নিশ্চিহ্ন হয়নি মন থেকে। নিজের

অজ্ঞাতে বরং ব্যাপ্তি লাভ করেছে সেটা। অদূরে ঘনশ্যামবাবু মুখ গোমড়া করে বসে। ভাবছেন, ঝকমারি এমন মানুষের অংশীদার হওয়া।

বিপিন চিন্তিত। ট্রাম বাস্ অথবা ট্রেনে যেতে হবে সরমাকে। গাড়িটা রেখে না আসার দরুন নিজের উদ্দেশেই কটূক্তি করল মনে মনে। আপির্স হয়ে গেল। উঠে পড়ল।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। চারুদেবী দিবানিদ্রার আলস্যজড়ানো মুখে সবে উঠে বসেছেন। সরমা অথবা মণ্টু কাউকে না দেখে বিপিন তাঁকেই জিজ্ঞাসা করল, এরা সব গেল কোথায়?

সশব্দে হাই তুলে তিনি জবাব দিলেন, এই তো একটু আগে আমাকে বলে বেরুলো দু'জনে। তুই এত সকাল সকাল ফিরলি?

বিপিন নিজের ঘরে এসে বসল গুম্ হয়ে। দিবানিদ্রার উষ্ণতায় চারুদেবী বিরক্তি প্রকাশ করলেন, বুঝিনে বাবু ভাবসাব।

পুরানো আঁকা ছবির পাতা ওলটাচ্ছিল অবিনাশ। বিজ্ঞাপনের নক্সা নয়। ওর যুগাতীত বিলাসী মনের সঞ্চয় কিছু। এর থেকেই এনলার্জ করবে একটা। সামনের ফ্রেমে ড্রইংয়ের ক্যান্‌ভাস্ আঁটা।

সরমাকে দেখে আনন্দে স্তব্ধ কয়েক নিমেষ। চেঁচামেচি করে উঠল তারপর। —এসো এসো, আমি ভাবছিলাম চৌধুরীমশাই বুঝি ফরাক্কাবাদেই উধাও হলেন তোমাকে নিয়ে।

সরমা অল্প হেসে ঘুরে মণ্টুকে আহ্বান করল, তোমার খেলার তো দেরি আছে এখনো, মানুষটাকে দেখেই যাও একবার—

সে ঘরে প্রবেশ করতে অবিনাশ জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো সরমার দিকে। পরে উঠে চেয়ারটা টেনে দিল শশব্যস্তে। চৌকিতে পাশের জায়গাটা চাপড়ে দিয়ে সরমাকে বলল, বোসো। এটি?

সরমা হালকা জবাব দিল, এটি আমার ভূতপূর্ব ছাত্র, বর্তমানের বডি-গার্ড এবং ভবিষ্যতের হয়ত বা দু'নম্বর মালিক।

অবিনাশ সোচ্ছ্বাসে বলল, বুঝলাম—বোসো ভাই, দাঁড়িয়ে কেন, একটু দেখে বোসো জামা না ছেঁড়ে—নতুন যখন কিনে আনি থার্ড-হ্যাণ্ড চেয়ারটা তখন থেকেই একটা হাতল নেই ওর।

মণ্টু তাড়াতাড়ি বসে বাঁচল।

ঠিক আছে, এইবার দেখো আমাকে। তোমার লেডি মিছে বলেন মি, জ্যু-লজিকাল গার্ডেনের মত ম্যান-লজিকাল গার্ডেনের পত্তন হলে এ দেশ থেকে আমার ক্লেইম্ আনরাইভালড্। ছদ্মগাম্ভীর্যে আবার নিরীক্ষণ করল মণ্টুকে। তারপর বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—কিন্তু ভাই মিছে আশ্বাসে ভুলছ তুমি, ছাত্র ছিলে ভালই ছিলে, বডি-গার্ড হয়েছ সেটা আরো ভালো—কিন্তু ওই তু'নম্বর মালিকানা এক-এ নামবে না কোনদিন। অথচ, তোমার ওই পুঁটলির ইউনিফর্ম পরে খেলার মাঠের হোয়াইট্ গ্যালারির পাশে এই চেহারা নিয়ে যদি ঘোরাঘুরিও করো দিন কতক—অনেক সুদর্শনা এক নম্বর ছেড়ে একমেব অদ্বিতীয়ম্ বলবেন। কিন্তু লেডি তোমার এমনই স্বার্থপর, এই সৎ পরামর্শ টুকুও দেবেন না কোনদিন।

মণ্টু বিস্ফারিত নেত্রে তাকালো সরমার দিকে। অর্থাৎ এ কোথায় এনে ফেললে আমাকে!

সরমাও হাসছে। বলল, বকুনি থামাও, ওকে এভাবে লজ্জা দিলে ও আর আসবে না এখানে।

অবিনাশ জবাব দিল, নিশ্চয় আসবে, কারণ ও যাঁর বডি-গার্ড তিনি আসবেন এবং তিনি গার্ড না নিয়ে চলাফেরা করেন না আজকাল। ওর জন্যে আমার দুর্ভাবনা নেই, তোমার খবর কি?

সরমা কটাক্ষে একবার মণ্টুর দিকে চেয়ে হেসেই জবাব দিল, ভালো। ছবির খাতা খুলে বসেচ যে, কমার্সিয়াল আর্ট কি হল?

অবিনাশ গম্ভীর মুখে বলল, মহা-অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি—আজ নির্বাসন ওদের। রসসৃষ্টির কারিগরিটা একেবারে ভুলে মেরে দিইনি এর প্রমাণ থাকবে বিপিন চৌধুরীর অন্তঃপুরিকার শয়নঘরের দেয়ালে—এই জন্যেই কোমর বেঁধে বসেছিলাম।···তা উইল্-ফোর্সের জোর দেখো, তিন সপ্তাহের সেতু ডিঙিয়ে কুলবতীর স্বয়ং আবির্ভাব ভক্ত-শিল্পীর ঘরে। অতএব প্রশ্ন করে আর বেশি ঘাঁটিও না দেবী, বসে থাকো চুপ করে, ভালো করে দেখি তোমাকে।

মণ্টুর বিস্ময়াপ্লুত মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠল অবিনাশ।—কিছু মনে কোরো না ভায়া, ওকে দেখার নিরীহ অভ্যাসটা তোমার মতই ছিল আমারো। নেহাৎ বয়সে আট দশ বছরের বড় বলে কান-মলা পুরস্কার থেকে সগৌরবে বঞ্চিত হতে পেরেছি। ওকি! লজ্জা পেও না, বরং সদর্পে বলবে, মহৎ

সাধনায় দুঃখ আছে, আছে নির্যাতন, আছে···এই কি বলে, আরো অনেক কিছু আছে—।

সরমা শাড়ির আঁচল মুখে পুরল। মণ্টু আরক্ত।

কিন্তু ভায়া, তোমার খেলা ক'টায়, সময় উৎরে যাচ্ছে না তো?

মণ্টু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। দেরিই হয়ে গেছে, কিন্তু যেতে মন সরে না। হেসে বলল, বৌদির মারফত আমার নেমন্তন্নটাও পাকা করে দেবেন, তিন সপ্তাহ ছেড়ে সপ্তাহে তিনবারও আসতে পারি।

অবিনাশ সানন্দে বলল, দেখলে সরমা, জহুরী জহর চেনে। বেশ, আসবে। সাতবার পর্যন্ত ফেল করাতে পারি আমি, তার বেশি বিদ্যে নেই।

বৌদিকে ক'বার ফেল করালেন? মণ্টু একেবারে ছাড়ার পাত্র নয়।

অবিনাশ গম্ভীর। বোলো না, গুরুর নাম ডুবিয়েছে।

সরমা হাসি চেপে মণ্টুকে বলল, তোমাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না, এঁকেই ধরে নিয়ে যাব'খন।

সে চলে গেলে ঘুরে বসল অবিনাশের মুখোমুখি। এত বাক্‌চাতুরী কিসের?

স্বভাব। কিন্তু ওকে সত্যিই বারণ করে দিলে আসতে?

কেন, তোমার ও বাড়ি যেতে আপত্তি হবে খুব?

না।

সরমা চকিতে দেখে নিল একটু। সেদিন গেলে না কেন?

অদৃষ্ট। নিমন্ত্রণ-লিপি চোখে পড়ল যখন, গেলে তাড়া খেতে হত।

তার পরেও তো এলে না?

অবিনাশ সকৌতুকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।—নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে এতদিন বাদে নিজেই চলে এলে শেষ পর্যন্ত, এই তো ভালো হল।

বিব্রত হয়ে সরমা হেসে ফেলল। জেনেশুনেই বিপদ ডেকে আনা। জোর দিয়ে বলল, আমার দায় পড়েছে বোঝাপড়া করতে, যখন খুশি আসব আগের মতই, কে কি বলবে?

মুচকি হেসে অবিনাশ থামল একটু।—বাজে কথা যেতে দাও, চৌধুরী-মশাইকে লাগছে কেমন?

মন্দ কি।

তবু, বনিবনাটা হল কেমন শুনতে পাইনে?

তোমার মত ঝগড়াটে নই, বনিবনা সকলের সঙ্গেই হয় আমার।

লক্ষ্মী মেয়ে।

ভালো হবে না বলছি—। বিগত দিনের স্বর।

তারপর, পড়াশুনা ?

হচ্ছে—। সরমা উঠে আলো জ্বেলে দিল ঘরের।

সময় দেন তো চৌধুরীমশাই ?

ফের ?

ঘরের চারিদিকে পরীক্ষাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সরমা ভুরু কোঁচকালো। পরে হেসে ফেলে বলল, তুমি কি ভেবেছ আগের মতই এসে তোমার ঘর গুছিয়ে দিয়ে যাব আমি ?

জামা কাপড় বইপত্র সব কিছু তছনছ হয়ে পড়ে আছে যেটার যেখানে খুশি। সশঙ্ক দৃষ্টিতে অবিনাশও একবার দেখে নিল চারদিক। ওর চোখে পড়েছে যখন সংস্কার অনিবার্য। খুশি করার জন্যই জবাব দিল, নিশ্চয় দেবে, নইলে এসে করবে কি আগের মত ? কিন্তু তা বলে আজ ও-সব কিছুতে হাত দেওয়া চলবে না।

আজ কি ?

গুরুবার।

তোমার মুণ্ডুবার।

উঠে শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে নিল সরমা।—চাদরটারও তো দেখছি তেমনি ছিরি।

অবিনাশ অসহায় কণ্ঠে বলে ওঠে, আমার ছিরিটাই বা এগুলোর থেকে এমন কি ভালো—আজ থাক না ?

থাকবে বই কি, নইলে ভালো হাতে অসুখ বাঁধাবে কি করে।

যাবতীয় সামগ্রী সুবিন্যস্ত হল আবার। ঘরটাও ঝাঁট দিয়ে ফেলল সরমা। অবিনাশ শুয়ে শুয়ে দেখছে আর হাসছে মনে মনে। যে স্নেহ এবং আগ্রহ আজ পরিস্ফুট ওর মুখে, তার হেতু অন্য কিছু।

সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে শাড়ির আঁচলেই সরমা হাত মুছে নিল। ঘরের কোণে টিনের তোরঙ্গটা খোলাই থাকে বারমাস। একটা চাদর বার করে পাট ভেঙে সামনে এসে দাঁড়াল। ওঠো—

ওঠবার লক্ষণ নেই, অবিনাশ চেয়েই আছে তেমনি।

সরমা হেসে ফেলেও সামলে নিল চট করে। ওঠো না ?

অবিনাশ অস্ফুট হাস্যে গা-ছেড়ে দেয় আরো। নাটকীয় সমর্পণের ঢংএ টেনে টেনে বলে, 'চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে, ওষ্ঠে তোমার কিছু কৌতুকে হাসে, মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদু সুর—।'

বেশ, কাব্য করবে না উঠবে? রাত হয়ে গেল, আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে না?

এ কাজটুকু অন্তত আমি পারব, তুমি চাদরটা রেখে এই চেয়ারে বোসো বলছি।

কিন্তু ওর বিরক্তি লক্ষ্য করে উঠতে হল তৎক্ষণাৎ। চেয়ারে আশ্রয় নিয়ে নিরুপায় কণ্ঠে বলল, আচ্ছা, যতটা লক্ষ্মীছাড়া ছন্নছাড়া ভাবছ ততটা যে নই আবার এলেই দেখবে। তোমার করুণা বরদাস্ত করার পাত্র নই আমি।

সরমা পরিষ্কার চাদরটা বিছানায় ফেলল। পরে মুখ না ফিরিয়েই নিরীহ মুখে বলল, অন্য কোনো করুণাময়ীর সন্ধানে লেগে যাবে?

জবাব দেবার সময় পেল না অবিনাশ। দোর-গোড়ায় মোটর থামার শব্দ। বিছানায় উঠে চাদরের ধারগুলি টান করে গুঁজে দিচ্ছিল সরমা, বিস্মিত নেত্রে ফিরে তাকালো সেও। পরক্ষণে ঘরে প্রবেশ করল যে তাকে ওরা আশা করেনি কেউ।

বিপিন চৌধুরীর দিক থেকেও এ শয্যা-বিন্যাসের পরিস্থিতি কল্পনার বাইরে।

সরমা নিজের অজ্ঞাতেই হঠাৎ আরক্ত হয়ে উঠল। কোমরে জড়ানো শাড়ির আঁচলটা খুলে মাথায় ফেলল সে।

বিপিনের মুখের মুহূর্তের স্তব্ধতাটুকু চোখ এড়ায়নি অবিনাশের। সহাস্যে উঠে দাঁড়াল।—এতগুলি হাতির পা আজ গরীবের কুঁড়েয়, কি ব্যাপার! বসুন, শর্ষেফুল দেখছিলেন তো চোখে?

নিস্পৃহ মুখে বিপিন বলল, রাত হচ্ছে দেখে এলাম একবার—

মস্ত এক ফাঁড়া কেটেছে যেন এমনি মুখ করে তড়বড়িয়ে উঠল অবিনাশ, খুব ভালো করেছেন, নইলে আমাকে নাকে দড়ি পরিয়ে নিয়ে যেত এক্ষুনি।

সরমা ধীরে সুস্থে বিছানার চাদর টান করতে লেগে গেছে আবার। অবিনাশ বাধা দিল, ও এখন থাক, মানুষটাকে দেখো একবার—ক'জনকে চাপা দিয়ে এলেন খবর নাও! উৎফুল্ল মুখে বিপিনের দিকে চেয়ে বলল, আপনার স্ত্রীর মহিষ-মর্দিনী রূপটা পুরোপুরি দেখতে পেতেন আর একটু আগে

এলে, এখন ঘোমটা টেনে কলাবউ সেজেছে। ওই দেখুন ঝাঁটা, ঘর সংস্কার শেষ করে আমাকেও একদফা…থাকগে কি আর বলব—।

বিপিনের মুখে গাম্ভীর্যের ব্যতিক্রম নেই এবারেও। বাড়ির আট-পৌরে মেয়ের মত সরমার এ অন্তরঙ্গ সহজতার আকর্ষণ আছে বলেই মেজাজ আরো বিগড়ে যায়। ঠাট্টার ছলেই ফিরে ব্যঙ্গ করল, শুধু ঝাঁটায় কুলোবে তো?

অবিনাশ হেসে উঠল হা হা করে।—আমাকে এমন করে জব্দ করলে নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই কিন্তু ঝগড়া হয়ে যাবে আপনার!

মনে মনে ভাবল বিপিন, সে ভয় আছে দেখতেই পাচ্ছি। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখের সামনে ঘোরালো বার কতক। অর্থাৎ, গরমে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

অবিনাশ তাড়াতাড়ি একটা হাতপাখা সামনে এগিয়ে দিল।

থাক্—

পাখা হাতে রেখে অবিনাশ হাসল একটু। দারিদ্র্যের পরোয়া করে না, তবু বিব্রত দেখাচ্ছে আজ।

বিপিন বলল, আছেন কেমন, সেদিন তো এলেন না?

নিতান্তই ভদ্রতা রক্ষার্থে। অবিনাশ সবিনয়ে জবাব দেয়, কথায় আছে অভাগা চাইলে সমুদ্র শুকোয়। আপনাদের নিমন্ত্রণ অবহেলা করতে পারি এমন কদর অবিনাশ শর্মার নয়—জবাবদিহি করেছি একবার। কই সরমা, বল না?

সরমা তক্তাপোশের ধারে সরে এসে পা নামিয়ে বসল। বিপিনের হাবভাবে প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞাটুকু লক্ষ্য করেছে। অবিনাশের বিনম্র কথাগুলি বিরক্তিকর আরো। জবাব দিল, যাওনি তো যাওনি, তার জন্যে এত বিনয় কেন? এবার না হয় চিঠি চোখে পড়েনি সময় মত, লোকের ভিড় আর কবে না এড়িয়ে গেছ তুমি?

অবিনাশের বিপন্ন মুখভাব যেন গ্রাহ্যই করল না, বিপিনের দিকে চোখ ফেরাল সে।— তোমার না ফিরতে রাত হবে বলেছিলে?

আগের বক্রোক্তি যথাযথ অনুধাবনে ভুল হল না বিপিনের। সম্ভ্রমের পালিশে আঁচড় পড়ল ঠিকই। গত্যন্তর নেই মনোভাব গোপন করা ছাড়া। হাসল।—রাত মানে যদি বারটা একটা ধরো তাহলে ঠিক বলিনি। আমি কিন্তু উঠব এক্ষুনি, তোমার দেরি হবে?

বাঁকা শোনায়। ঈষৎ বিস্মিত নেত্রে তাকালো সরমা। কোথা দিয়ে যেন

একটা নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি হয়ে গেছে চারদিকে। জীবনের এই নতুন অধ্যায়ের প্রতিটি পদক্ষেপ আর একজনের অনুমোদন-সাপেক্ষ।

হয়ত বা এটা সরমারই মনের গলদ। বিপিনের অপ্রত্যাশিত আগমনে নিজের মুহূর্তকালের বিভ্রমটুকু অজ্ঞাত নয় নিজেরও। কৈফিয়ৎ নেই বলেই দাহ আছে।

আর মনে মনে ভাবছে অবিনাশ, ওর জন্য সরমার এই শয্যা-রচনা যেন অন্তিম শয্যাই হয়। তবু কলকণ্ঠে সেই সাড়া দিল আগে, দেরি হবে কি মশাই! ঝাড়া তিন ঘণ্টা বকিয়েছে, আর নয়—আড্ডায় একবার জমলে সময় জ্ঞান থাকে নাকি ওর!...একটা কথা, এর পরে আপনি নিয়ে আসবেন সঙ্গে করে, নইলে উঠতে বসতে শাসন অসহ্য।

পাছে সরমার চোখে চোখ পড়ে যায় এই ভয়ে আর একদিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসতে লাগল সে। অন্য লোকের সহস্র কটাক্ষেও যে মেয়ের শান্ত মুখে এতটুকু রেখা পড়বে না, ওর সামান্য কথায় তারই চণ্ডী-মূর্তি বহুবার দেখেছে। এখনো ওর জলন্ত চোখ দু'টো ঠিকই অনুভব করল।

বিপিন চেষ্টা করে হাসল আবার একটু। বলল, মেয়েদের শাসন আর্টিস্ট-দেরই মনোপলি, সকলের কপালে জোটে না—বাধা দিতে গিয়ে ঘরের সঙ্গে লড়াই বাঁধাব! তার চেয়ে অনেক সহজ পাটের দর চড়িয়ে দেওয়া। উঠে দাঁড়াল। সৌজন্য প্রকাশে ক্রটি নেই।—আমি দালাল মানুষ, সময় কম বুঝতেই পারেন, আপনিই আসুন মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়ি। পরীক্ষা কাছে, যাতায়াতের সময়টা অন্তত বাঁচে সরমার।...আর, লোকের ভিড়ের ভয় নেই এখন, সে গ্যারান্টিও দিচ্ছি। আসবেন তো?

দু'দিন আগেও সরমার সপ্রশংস মনোভাবই ছিল। লোকটার রাখা ঢাকা নেই কিছু, মুখের দিকে চাইলে মনের কথা বোঝা যায়। কিন্তু সেটাই আজ এতবড় লজ্জার কারণ হবে ভাবেনি। পরীক্ষার তাগিদে সিনেমায় না যাওয়ার কথাটা মনে পড়ে আবার। আর লোকের ভিড়ের প্রসঙ্গও ও নিজেই উত্থাপন করেছে। দেখল, হাসিমুখেই মাথা নেড়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে অবিনাশ, যাবে—। কিন্তু তার ভিতরের বিপর্যস্ত মূর্তিটা গোপন থাকার কথা নয় সরমার চোখেও।

মোটর ছুটেছে।

গাড়ির বেগে বিপিনের অসন্তোষের মাত্রা নির্ণয় করা যেতে পারে। পাশে সরমা। সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে।

অস্বস্তি কাটিয়ে বিপিনই সহজ হতে চেষ্টা করল প্রথম।—মণ্টু রাস্কেল্‌টার নিতে আসার কথা ছিল তোমাকে, না ?

সরমা শান্তমুখে তার দিকে চেয়ে রইল খানিক। পরে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, পথে চলাফেরা করতে চলনদার লাগে আমার তাই জানতে নাকি তুমি ?

ঠাণ্ডা স্পর্শের মত লাগে কণ্ঠস্বর। বিপিন আড়চোখে তাকালো একবার। গাড়ির স্পীড্‌ কমিয়ে দিল খানিকটা। মণ্টুর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ওজরে অপ্রীতিকর জিজ্ঞাসাটা থামিয়ে দেওয়াই বিধেয়। বলল, সে কথা নয়, ভাবলুম ওর জন্য অপেক্ষা করে বসে আছ।

তাতেই বা দোষের কি ?

বিপিন জবাব দিল না। তার দোষ নেই, আজকের ব্যবহারে অশোভন যদি থাকেই কিছু তার জন্যে দায়ী ডাঃ চন্দ্র, মণিময় এবং সব থেকে বেশি সরমা নিজে। একটু নীরব থেকে বিপিন আসল সমস্যার সম্মুখীন হল সরাসরি। বলল, এই নিয়ে তিন দিন আলাপ অবিনাশবাবুর সঙ্গে, কিন্তু এখনো ঠিক চিনলুম না ভদ্রলোকটিকে।

সরমা সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, সময় লাগবে চিনতে।

অন্ধকারে বিপিনের মুখের বর্ণান্তর দেখা গেল না।

সরমা বসে আছে তেমনি, দু'চোখ সামনের দিকে। জিজ্ঞাসা করল, অবিনাশকে চেনার থেকেও তার সঙ্গে আমার এ ঘনিষ্ঠতা কেন এই হয়ত বিশেষ করে জানতে চাও তুমি, না ?

নিরুত্তর।

সেদিন উৎসব রাত্রিতে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েও মনে মনে হেসেছে সরমা আজ আর তা সম্ভব হল না। আজ হোক কাল হোক এ নগ্ন জিজ্ঞাসার বোঝা-পড়া আছেই। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হবে সেটা ভাবেনি। হল যখন, শেষ হওয়াই ভালো। একটু অপেক্ষা করে নরম করেই বলল, তার আগে একটা কথা তোমাকে ভেবে দেখতে বলি। বিয়ের আগে স্বাধীনই ছিলুম আমি, কেউ বাধা দেবার ছিল না কোথাও—সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেতেই তোমাদের বাড়ি এসেচি। অবিনাশকে চিনতে চাও ভাল কথা, কিন্তু তাকে নিয়ে এ দুর্ভাবনা কেন ?

অখণ্ড নীরবতা। গাড়ির একটানা শাঁ শাঁ শব্দ। রগ-চটা বিপিন চৌধুরীর

নিরুপায় বিক্ষোভ দাহ্য পদার্থের মতই ওঠা-নামা করছে দেহে। নিষ্ক্রমণের পথ নেই। কারণ ইঙ্গিতটা মিথ্যে নয়।

রাগ করলে? সরমা কাছে সরে এলো .....।

অন্ধকারে মাথা নাড়ল বিপিন। অস্ফুট এক শব্দ নির্গত হল শুধু।

কিন্তু অবিনাশ উপলক্ষ মাত্র। সত্যিই কেন এ দুর্ভাবনা হয়ত বিপিন নিজেও জানে না সঠিক। একটা অস্বস্তিকর বোঝা বিজড়িত এর সঙ্গে। যোগ্যতার মানদণ্ডে নিজেই নিপীড়িত। ঐশ্বর্যের আড়ম্বর যত বড় করে তুলতে যায়, মনের দিক থেকে দেউলে হয়ে পড়ে ততো বেশি। সরমার একান্ত সান্নিধ্যে এসে ওর শিক্ষা এবং স্বতন্ত্র সত্তার পরিবেষ্টনীতে বেমানান লাগে নিজেকে। আকর্ষণ বাড়ে। ভয়ও। ঐশ্বর্যের বাইরে শিগগীরই হয়ত আরো কিছু অনুসন্ধান করবে সরমা যা তার নেই। তাই পাওয়ার আনন্দটা যত বড়, তাকে ছাপিয়ে ওঠে হারাবার ভয়।

বিগত সন্ধ্যাটা বেশ কিছুদিন মনে ছিল বিপিনের।

ফিরে সেই গোড়ার দিকের পথ অবলম্বন করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিল। ওর আত্মসমর্পণের সহজতাও অনেক সময় বিপন্ন করে তোলে সরমাকে। পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। খাটুনি বাড়ছে। কিন্তু রাত্রি দশটা না বাজতে বিপিন পড়ার ঘরের বাইরে পায়চারি শুরু করে দেবে ঘন ঘন। ডেকে বাধা দেবে না একবারও। কিন্তু এ প্রতীক্ষার আহ্বান কোনো ডাকাডাকির থেকে কম না।

পড়ার সাথী মন্টু এক একদিন বই আড়াল করে ...তে থাকে। তবু কিছু না দেখার ভান করে সরমা নিজেকে আটকে রাখে বেশ কিছুক্ষণ। কোন দিন বা হেসেই ফেলে। উঠে হাতের বই দিয়েই মন্টুর পিঠে বসিয়ে দেয় এক ঘা—। খুব যে! পালাও আর পড়ব না।

নিজের ঘরে এসে ছদ্মরাগে বিপিনের সম্মুখীন হয় কোনদিন, পরীক্ষা আছে না আমার?

আমিও তো আছি। বিপিন নির্বিকার।

বেশ! খানিক মুখ গোঁজ করে বসে থেকে সরমা আবারও হেসেই ফেলল শেষ পর্যন্ত।

এরপর আর এক খেয়াল চাপল বিপিনের। বিয়ের আগে অবিনাশ বিদ্রূপ করেছিল ব্যাঙ্কের পাস বইয়ের জোর থাকে তো বাড়িতে:যেন একটা ল্যাবরে-

টারি করে দেয় সরমাকে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্গুণ ব্যস্ততা। শুনে সরমা অবাক।

ল্যাবরেটারি! একি ঘরের চাল ডাল নাকি যে এনে মজুত করলেই হল? যেমন অবিনাশের বুদ্ধি—কোন হাঙ্গামা করে কাজ নেই এখন।

হাঙ্গামা আছে বলেই বিপিনের উৎসাহ। আর দশজনের দ্বারা সম্ভবপর হলে গা করত না। সরমার কাছে আমল না পেয়ে মণ্টুর সঙ্গেই গোপন মন্ত্রণা চলল। সরমা পরীক্ষার পড়ায় ব্যস্ত। ষড়যন্ত্র 'টের পেল না।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, যন্ত্রপাতি ব্যালান্স গ্যাস-জার ফানেল টেস্ট-টিউব বার্নার প্রভৃতির আমদানি শুরু হয়েছে।

মণ্টু মাথা চুলকে পড়ার ঘরে এসে উপস্থিত।—বৌদি, তোমার ঘরে গিয়ে বোসো একটু, এই ঘরে লোক আসবে।

সরমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলল।

গ্যাস অ্যারেঞ্জমেণ্ট্ ফিট্ করতে হবে, আর মিস্ত্রি এসেছে, লম্বা ডেস্ক্ বসাবে একটা!

নিচে এসে ব্যাপার দেখে সরমার চক্ষু স্থির।—তোমাদের মাথা খারাপ হয়েচে?

মাথা খারাপ হবে কেন। বিপিনের মেজাজ প্রসন্ন।

এখানে এসব দিয়ে হবে কি?

বিপিন দমে যায় একটু। কিন্তু মণ্টু উল্টে বকুনি ঝাড়ে, যা হবার হবে, তোমার কাজে না লাগুক আমার লাগবে—এখন সরো এখান থেকে, কাজ করতে দাও।

পড়ার ঘরে ল্যাবরেটারির মত পত্তন হল একটা কিছুর। আলমারিতে থাকে থাকে অ্যাসিড এনে সাজাল মণ্টু। অপরিমিত অর্থব্যয় হল এইগুলি সংগ্রহ করতেও। কারণ, দাম দিলেই বাজারে পাওয়া যায় না সব জিনিস।

টাকার শ্রাদ্ধ দেখে চারুদেবীর অসন্তোষ প্রকাশ্যে মুখর। সব কিছুর উপলক্ষ হয়ে সরমা লজ্জায় সঙ্কোচে নিজের ঘরে আবদ্ধ থাকে দিন কতক।

কিন্তু ব্যর্থ বিপিন চৌধুরীর সগর্ব প্রতীক্ষা।

অবিনাশ এলো না।

ক্ষুদ্র রসায়নগারটিও অভ্যস্ত হয়ে গেল সকলের চোখে। মণ্টুর উৎসাহ

অপরিমিত। আর ক্রমশ এ ঘরটার প্রতি সরমার প্রচ্ছন্ন আকর্ষণও বিপিন অনুভব করতে পারে।

আই, এস্‌সি পরীক্ষার ফল মন্দ হয় নি মণ্টুর। বি, এস্‌সি ক্লাসের ছাত্র এখন। রাসায়নিক গবেষণার ঝোঁকও তাই প্রবল। যতক্ষণ পড়ে সরমা, কলেজ-পাঠ্য একটা কিছু এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে সে তন্ময়। কখনো বা চিৎকার করে ওঠে আনন্দে, ম্যাগনিফিসেণ্ট ফেলিওর! ম্যাডাম কুরি! এদিকে আসবে তো এসো, নইলে সব ওলটালুম।

সেদিন রীতিমত উত্তেজনা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল সে, চাপা গলায় ডাকল, বৌদি!

হুঁ—।

দেখই না চেয়ে!

পকেট থেকে শিশি বার করল একটা। সমস্ত মুখ সাফল্যস্ফীত। সাড়া পেয়ে পাশের ঘর থেকে বিপিনও উপস্থিত।

সরমা জিজ্ঞাসা করল, কি এটা?

মণ্টু শিশির লেবেলটা ধরল তাদের দিকে। সাইনাইড্।

বিপিনের মুখ সাদা হয়ে গেল এক নিমেষে। সরমা অবাক। কি হবে এতে?

সোনার উপর অ্যাকশান দেখব।

সরমা রাগতে গিয়েও পারে না।—সোনা-দানার খুব ছড়াছড়ি পড়েছে বাড়িতে, কেমন?

কতটুকু আর লাগবে, এইটুকু তো—। সকরুণ আবেদন মণ্টুর।

বিপিন আত্মস্থ হয়েছে খানিকটা। শাসনের স্বরে বলল, এসব বাড়িতে আনা উচিত হয়নি তোর। সরমার দিকে তাকালো সে, দেখতে চায় দেখুক না, তুমি জানো নাকি কি করতে হবে?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মণ্টু বলল, আমরাই ঘাঁটাঘাঁটি করি সাইনাইড নিয়ে তার আবার—

জিনিসটার এতটা মর্যাদা দিয়ে ফেলে বিপিন মনে মনে অপ্রস্তুত। গলার কাছের বোতামটা ছিঁড়ে নিয়ে সরমার সামনে রাখল।—আচ্ছা, দেখা যাক কি হয়।

বই রেখে সরমা গম্ভীর মুখে উঠল এবার। আঁচলের চাবি দিয়ে অ্যাসিডের আলমারি খুলল। মণ্টুর হাত থেকে শিশি নিয়ে এক কোণে আড়াল করে রেখে

দিল সেটা। আলমারির তালা বন্ধ করে বোতামটা আঁচলের খুঁটে বেঁধে পড়তে বসল আবার।

বারকতক মাথা চুলকে মণ্টু প্রস্থান করল ঘর থেকে। বেগতিক দেখে বিপিনও চলে এলো। মারাত্মক জিনিসটা থাকল আলমারির মধ্যে, এ অস্বস্তি সম্পূর্ণ যাবার নয়। মণ্টুকে আচ্ছা করে ধমকে দেওয়া দরকার।

দিন যায়। এত করেও অবিনাশকে মন থেকে একেবারে সরানো সম্ভব হল না যেন। আমন্ত্রণ সত্ত্বেও একদিনও আসেনি এখানে। এলে বিপিন সন্তুষ্ট হত এমন নয়। কিন্তু সরমাই আরো বারকতক গেছে তার ওখানে। কখনো মণ্টুর সঙ্গে, কখনো একা। পুরানো ক্ষতের ওপর নতুন করে লাগে। কিন্তু মনোভাব গোপন করে বাইরের সহজতা বজায় রাখতে শিখছে বিপিন।

ভাগ্যচক্রের পরিহাসের কেবলমাত্র শুরু এটা। হঠাৎ আসল সংঘাত উপস্থিত কর্মক্ষেত্রের দিক থেকে। সহকর্মী ঘনশ্যামবাবু বিপদের লাল নিশানা দেখে আগেই সাবধান করেছিলেন।

কিন্তু বিপিনের আত্ম-বিস্মৃত দু'চোখের একান্ত দৃষ্টি তখনো ঘরের দিকে।

সংশ্লিষ্ট কতগুলি ছোট ব্যাঙ্কের পতন ঘটল একে একে।

বোম্বাই শহরের অনেক ঘরেই ত্রস্ত আলোড়ন পড়ে গেল একটা। ভাঙনের ত্রাস দেখা দিল ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ী মহলে। আর সহসা প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে প্রকৃতিস্থ হল বিপিন চৌধুরী।

দিবারাত্র পরিশ্রমের ফলে বাঁচল কিছু। কিন্তু গেল যা তাও অনেক দিনের সঞ্চয়।

বাড়িতে কিছু প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অর্থের নিশ্চিন্ত আচ্ছাদনে নিজের যে অভাব পরিপূর্ণ করে ঢেকে দেবে সরমার চোখে, ভাঙন ধরেছে সেই সঞ্চয়ে। বাইরে সহ-ব্যবসায়ীর উপদেশ, ঘনশ্যামবাবুর তাড়না। ঘরে চারুদেবীর নিশ্চিন্তে মহাভারত পাঠ, মণ্টুর গবেষণা, সরমার পরীক্ষার পড়া এবং সময় পেলে এরই মধ্যে অবিনাশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। রুক্ষ তিক্ত ক্ষিপ্ত হয়ে গেল মেজাজ।

তার এই পরিবর্তনটুকুই শুধু চোখে পড়ে সকলের। সরমা পরিষ্কারই জিজ্ঞাসা করল একদিন, কি হয়েছে তোমার আজকাল বলো তো?

কি হবে—

কিছু না?

হঠাৎ নড়েচড়ে বসল বিপিন। চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

—আমার যদি হয়ও কিছু তোমার পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটবে একটুও? আর—

অবিনাশের নামটা মুখে এনেও সামলে নিল।

কি আর?

বিপিন অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

সরমা খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, দেখো, নিজের মন থেকে যারা দুঃখ সৃষ্টি করে দুঃখ পায়, তাদের অদৃষ্টে শান্তি লেখা নেই কোন কালে।

আবার গিয়ে পড়তে বসল সে।

বিপিন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেদিকে। যন্ত্রপাতি সমেত ওই ঘরটাকে ভস্ম করতে পারলে শান্ত হত।

আগের উদ্যম নিয়ে কাজে লাগলে যা গেছে তা চারগুণ ফিরিয়ে আনতে পারে, নিজের ওপর এমন একটা বিশ্বাস আজও আছে। কর্মক্ষেত্রে নিজেকে এবার নির্বাসিত করলও সম্পূর্ণ। কিন্তু মনের আষ্টেপৃষ্ঠে শিকল বাঁধা।

মেরিন লাইনসএর ল্যাবরেটারিতে দু'জন সহকারী এসেছে। ভুটা এবং হরিআনন্দ। নির্বাচনে বাহাদুরি আছে সমাদ্দারের। গুণী দু'জনেই। কিন্তু এমন বিপরীতমুখী যোগাযোগ সুদুর্লভ। ভুটার দিকে তাকালে মনে হবে লোকটা বুঝি রাতের মুখ দেখেনি কখনও। হাসি-খুশিতে ভরপুর। হরিআনন্দ অবলীলাক্রমে দেশ-বিদেশের ডিগ্রী আহরণ করে গেছে একের পর এক। কিন্তু মুখ থেকে ফেল করা ছাত্রের সঙ্কোচ গেল না। একসঙ্গে দু'টোর বেশি কথা বলতে গেলে কান লাল হবেই। কোনো দুরূহ মীমাংসার মুখে সকলে যখন ব্যস্ত-সমস্ত, সে হয়ত সসঙ্কোচে ভুটার কানে কানে সন্ধান দেবে, অমুক জার্নালের অমুক পাতায় হদিস মিলতে পারে, একবার দেখলে হয়…। এদিকে তার সদা-বিব্রত মুখভাব দর্শনে ল্যাবরেটারির সুদক্ষ বেয়ারাও সংশয়াপন্ন। দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে অনেক সময়, অ্যাপারেটাস ফিটিংএ গলদ আছে কি না।

সমাদ্দারের কাজ শুরু হয়েছে পুরো উদ্যমে। একদিকে ওষুধের ফ্যাক্টরী অন্য দিকে ল্যাবরেটারির রিসার্চ। প্রবল প্রাণ-শক্তি মানুষকে সুন্দর করে তোলে কত, ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধটির দিকে চেয়ে চেয়ে অনেকেই উপলব্ধি করে সেটা। পূর্ব-ব্যবস্থা মতো রিসার্চের প্রধান দায়িত্ব ডাঃ চন্দ্রর। সারা পৃথিবীর কেমিকাল লিটারেচারে মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন দিবারাত্র।

সেদিন বিকালের দিকে সমাদ্দার ফাক্টরী থেকে ল্যাবরেটারিতে এসে দেখেন শুধু চন্দ্র ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে। সমাদ্দার খালি ডেস্ক্ দু'টোর দিকে চেয়ে ফেটে পড়লেন প্রায়।

এঁরা সব গেলেন কোথায়?

চন্দ্র বিজ্ঞান-তথ্য থেকে মুখ না তুলেই হাসলেন একটু। জবাব দিলেন না।

এই করে সব রিসার্চ করবে, অ্যাঁ! ছ'টা না বাজতে হাওয়া!

চন্দ্র বললেন, তবে কি এক ন'টায় এসে আর এক ন'টায় যাবে?

আর এক ন'টায় মানে? দরকার হলে তার পরের দিন ন'টায় যাবে, দরকার হলে একদম যাবে না!

দরকার হোক আগে। বিকেলে ওদের খেতে দেবে কে, সে ব্যবস্থা করেছেন? বুড়োকে একটু জব্দ করতে চেষ্টা করলেন চন্দ্র।

থতমত খেয়ে গেলেন সমাদ্দার। পরক্ষণে উল্টে তেতে উঠলেন তাঁরই ওপর,

—কেন করোনি ব্যবস্থা? তোমার ওপর ভার দিলে এমনি হবে জানি। সকাল ন'টা থেকে আটকে রাখো ওদের, খাওয়া নেই দাওয়া নেই— এই সন্ধ্যে পর্যন্ত! কাজ করতে এসে শেষে অসুখে পড়ুক, কেমন?

চন্দ্রর বিপদ কম নয়। হরিআনন্দ্ এবং ভুটার সামনেও এমনি ধমক খেতে হয়। অথচ, তিনি নিজে যেদিন থাকেন ল্যাবরেটারিতে কোনদিন ছুটি দেন পাঁচটায় কোন দিন বা তারও আগে। চন্দ্রকে বলেন, রিসার্চের থার্স্ট যখন ভিতর থেকে আসবে ওদের, দিন রাত এখানে পড়ে থাকবে দেখো—।

মাঝখান থেকে জলযোগের খরচাটা বাড়ল।

সায়েন্স কলেজ। ঘণ্টা বাজল। পরীক্ষার্থীরা বেরিয়ে আসছে। সিঁড়ির একপ্রান্তে অবিনাশ দাঁড়িয়ে। সরমা মহা খুশি তাকে দেখে।

তুমি যে!

আজ্ঞে। শেষ হয়ে গেল তো পরীক্ষা?

হ্যাঁ।

বালাই গেল।

গাড়ি নিয়ে বিপিনও অপেক্ষা করছে পথের ধারে। আপ্যায়নে বাধা পড়ল অবিনাশকে দেখে।

কেমন দিলে পরীক্ষা?

ভালো। উৎফুল্ল মুখে সরমা বলল, আজ যে দেখি গ্র্যাণ্ড রিসেপশান্! তিনটের মধ্যেই কাজ শেষ তোমার?

দিনটা শনিবার সরমার খেয়াল নেই। পরীক্ষা পর্ব আজ শেষ জেনে বিপিন খুশি মনেই এসেছিল। কিন্তু যে মানুষ বাড়ি এলো না একবারও তার এখানে যাতায়াত ভালো লাগার কথা নয়।

জবাব দিল, আবার যেতে হবে, এমনি খোঁজ নিতে এসেছিলাম। আপনা থেকেই অবিনাশের দিকে চোখ পড়ে এবার।

দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো অবিনাশ।—তবু ভালো দেখতে পেয়েছেন। আপনার স্ত্রী য়ুনিভার্সিটির কবল থেকে ছাড়া পেল এতদিনে, দিনটা সেলিব্রেট করা উচিত।

বিপিন হেসেই বলল, করুন সেলিব্রেট···কিন্তু আমি নিরুপায়। বিজনেস্‌-ম্যানের কপালে আর্টিস্টের সাহচর্য কদাচিৎ জোটে। চলি, কেমন?

একমুখ হেসে সে প্রস্থান করল।

একটা বড় নিঃশ্বাস টেনে ঠাট্টার ছলেই মনোভাব ব্যক্ত করল অবিনাশ।—ভদ্রলোককে রোগেই ধরল নাকি শেষ পর্যন্ত বুঝছিনে।

হয়ত অস্বস্তির মত লাগছিল সরমারও। জোর দিয়ে প্রতিবাদ করল, ভদ্রলোক নিষ্কর্মা নয় তোমার মত, সত্যিই আজকাল নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই, দিনরাত কাজে ডুবে আছে।

অবিনাশ নিশ্চিন্ত হল যেন।—বাঁচালে। কিন্তু এখন যাওয়া হবে কোথায়?

তোমার প্ল্যান ছিল কিছু?

প্ল্যান আবার কি। হাসতে লাগল, পথে-ঘাটে আর লাইটপোস্টের গায়ে যে রকম পোস্টারের ছড়াছড়ি অপর্ণা চন্দ্রর, দেখার ইচ্ছে ছিল কি এমন অসাধ্য সাধন করলেন। মণিময়দা'র গল্প তো জানই—

পরীক্ষার চাপে এ প্রসঙ্গ একেবারে মনে ছিল না সরমার। সোৎসাহে বলে উঠল, চলো দেখে আসি।

পর-মুহূর্তে মনে পড়ল কি। ভাবল একটু। কাল তো রবিবার? কাল চলো, আজ ক্লান্ত লাগছে।

বেশ তো। অবিনাশ হাসছে আবারও।

সরমা বলল, কাল দুপুরে তোমাকে ডাকব, কোথাও বেরিও না। তাছাড়া ডাঃ চন্দ্রর বাড়িও যেতে হবে একবার, দরকারী কথা আছে।

অবিনাশ ঘাড় নাড়ল, তথাস্তু। যুগলে আসছ তো?

সরমা হেসে ফেলল। আসচিই তো, তোমার খুশির মাত্রা কমবে তাতে?

না।

হাসচ যে?

তোমার ক্লান্তির বহর দেখে। আমাকে বেশ খানিকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে এও কম আনন্দের কথা নয়। নইলে বলতে, না বাপু আজ যাবার উপায় নেই, ঘরের লোকটিকে সঙ্গে নিতে হবে—আগের সরমার সঙ্গে মিল থাকত তাহলে। আর হেঁটে কাজ নেই, এই ট্রাম তোমার, উঠে পড়—কাল বাড়ি থাকব'খন।

ট্রামে বসে সরমা পরীক্ষা-পত্রটা খুলল আবার। মনে মনে একবার হিসেব করে নিল কত নম্বর পেতে পারে। ভাঁজ করে রেখে দিল ওটা।

জবাব দেওয়া যেতে পারত অবিনাশকে। বলতে পারত, আগের সরমা

বদলেছে সত্যি, কিন্তু বদলেছে আগের অবিনাশও। অপরকে আপন করে নেবার যাদু-কাঠি যার জিভের ডগায় সে কেন এমন দূরে ঠেলে রাখল ওরই ঘরের লোকটিকে। বলবে। আবার উঠুক কথাটা।

কিন্তু যাকে নিয়ে মনে মনে এ সুপারিশ, তার বিকলতার পরিধি কল্পনাতীত। বাড়ি ফিরে সরমা অবাক।

বিপিন খাটে শয়ান। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে পুরোদমে।

পরদিন। যথাসময়ে সরমা ঘরে প্রবেশ করবার পরেও ঈষৎ ঝুঁকে অবিনাশ সরমার দিকে চেয়ে থাকে। দ্বিতীয় কারো সাড়া না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, বিপিনবাবু এলেন না?

ডাকিনি। চলো, তিনটেয় তো শো?

অবিনাশ জিজ্ঞাসু।...ডাকোনি কেন?

এমনি।

একমুহূর্ত অপেক্ষা করে অবিনাশ সটান শুয়ে পড়ল আবার।—বোসো। আজ থাক তাহলে, একসঙ্গে যাওয়া যাবে'খন আর একদিন।

সরমা জোর দিয়ে বলল, না আজই যাব।

না।

সরমা রেগে গেল। উঠবে তো ওঠো নইলে আর কোনদিন কোথাও যাব না তোমার সঙ্গে।

না গেলে। অবিনাশ নির্লিপ্ত।

খানিক তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সরমা দরজার দিকে অগ্রসর হল। তাড়াতাড়ি উঠে অবিনাশ হাত ধরে ফেলল।

ছাড়ো, কাজ আছে। ঝাঁজিয়ে উঠল সরমা।

অবিনাশের দু'চোখ তার মুখের ওপর নিবদ্ধ।—পরীক্ষার গরম কাটেনি এখনো না আর কিছু?

অসহিষ্ণু ক্ষোভে সরমা বলে উঠল, তুমি যাবে কি না?

যাব, বোসো—। দেয়ালের হুক থেকে জামা পেড়ে নিল। বলল, কোনদিন কোথাও যাবে না আমার সঙ্গে এর মানে এই নয় যে এখানে এসেও বসবে না পর্যন্ত। জামা গায়ে পরে হঠাৎ হাসল একটু, আচ্ছা তোমার যত তম্বি কি আমারই ওপর?

সরমা চুপ। এখানে জোর খাটে বলেই নির্বিচারে খাটায়ও সে জোর।

কিন্তু সকলের বড় জোর যেখানে খাটবার কথা মেয়েদের, সেখান থেকে একটা শূন্যতার আঘাত যেন বিদ্রূপ করে ওঠে তাকে।

ভবিষ্যতের যাত্রাপথ নিরঙ্কুশ হবে না এ আভাস স্পষ্ট যেন…।

সহজকে সহজ করে দেখার মন নিয়েই ছেলেবেলা থেকে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ উত্তীর্ণ হতে চলল। এর মাঝে গৃহস্থ মেয়ের হাজার বিধি-নিষেধের দণ্ড হাতে পাহারা দেয়নি কোন অভিভাবক। সহপাঠীর সসংকোচ উসখুসানি ভালো লাগত। ভালো লাগত বেপরোয়া বিপিন চৌধুরীর সাগ্রহ আকর্ষণ। এতে না ছিল কোন গ্লানি, না কোন লজ্জা ভয়। অবিনাশকে ঘিরে আজ সহসা একটা সমস্যা বিমূঢ় করে ফেলে তাকে। বিয়ের পর বিপিন যদি হাসিমুখে ঠাট্টা করত অবিনাশকে নিয়ে, হাসিমুখে বরদাস্ত করত সরমাও। কিন্তু এর ধার দিয়েও গেল না মানুষটা।

ভাবল অবিনাশকে বলে দেয়, গতকাল সে যা অনুমান করেছিল মিথ্যে নয়। যথার্থই অবিশ্বাসের বীজাণুতে রোগাক্রান্ত তার ঘরের মানুষ। চুপ করে থাকে।…বিপিনকে আজও বোঝেনি সঠিক এমন একটা আশ্বাস এখনো আছে। আর যদি সত্যিই বুঝে থাকে, নির্বাচনে এত বড় ভুলের লজ্জা অবিনাশের কাছে অন্তত পেতে চায় না।

নির্দিষ্ট প্রেক্ষা-গৃহের কাছে এসে মনের ভার কাটল অনেকটা। অবিনাশ গেছে টিকিট কাটতে। জনতার ঠেলাঠেলি বাঁচিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল সরমা।

দেয়ালের গায়ে অপর্ণা চন্দর একাধিক চিত্রিত মূর্তি। কৌতূহল সত্ত্বেও সরমা ভালো করে তাকাতে পারল না সেদিকে। নারী-মূর্তি রেখাঙ্কনে রুচির পরিচয় থাকার কথা নয় প্রচার-চিত্রকরের। আছে দেহের অংশ-বিশেষে বেপরোয়া তুলি চালনার স্থূল দক্ষতা। মূল্যবান বেশ-ভূষার স্রস্ত আবরণ নগ্নতাকে লজ্জা দেয়। চলচ্চিত্র রস-পিপাসু জনতা এবং পথচারীর সাগ্রহ দৃষ্টি অনুসরণ করে বার বার তবু সেদিকে চোখ পড়ে যাচ্ছে সরমার। একা দাঁড়িয়েও লজ্জা পেতে লাগল কেমন।

অবিনাশ টিকিট কেটে কাছে এলো, চলো। দু'পা এগিয়েই সে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। সামনের দেয়ালে অপর্ণার সপ্রগল্ভ মূর্তিটি নিঃসঙ্কোচে দেখল চেয়ে চেয়ে। দুর্বোধ্য একটা শব্দ নির্গত করল মুখ দিয়ে। সরমার সঙ্গে দৃষ্টি মিলল পরক্ষণে।

হঠাৎ কান পর্যন্ত রাঙিয়ে ওঠে সরমার। নিজেরই কোনো অসম্বৃত লজ্জার স্খলিত প্রকাশ যেন। অন্য দিকে চেয়ে তাড়া দিল, চলো না, দাঁড়ালে কেন?

অবিনাশ হেসে ফেলল, যাচ্ছিই তো!

পরদায় তখন প্রচার সংবাদ শুরু হয়েছে। পিছনের এক কোণের আসন থেকে প্রেক্ষা-গৃহের অন্ধকার বিদীর্ণ করে সেই দিকটার প্রতিটি আগন্তুককে লক্ষ্য করছেন একজন।···ডাঃ চন্দ্র। পর পর দু'টো রবিবার চেষ্টা করেছেন চেনা চোখ এড়িয়ে স্ত্রীর ছবি দেখতে। গতবারে সামনে ছিল জনাকতক ছাত্র। তাদের রসালাপে বিঘ্ন ঘটবার আগেই সংগোপনে উঠে গেছেন। এবারেও হল না। অদূরে অবিনাশ এবং সরমা পাশাপাশি আসন নিয়ে বসেছে। একটু বাদে ইণ্টারভ্যালের আলো জ্বলবে, হয়ত বা ফিরে তাকাবে ওরা—। শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন চন্দ্র, নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন পূর্ব-দিনের মতই।

বিজ্ঞানীর এই গোপন ব্যর্থতা সংসার ক্ষেত্রেও। রঙ্গ-মঞ্চের মত অপর্ণার অন্তঃস্থ পরদার প্রতিটি বর্ণচ্ছটা পর্যবেক্ষণের মর্মান্তিক আগ্রহে কতবার তার কাছে গিয়েও এমনি সংগোপনে ফিরে এসেছেন ঠিক নেই।

ছুটির দিনে সমাদ্দারের ওখানে যাবার কথা সন্ধ্যার পর। এতক্ষণ সময় বাইরে কাটানো সম্ভব নয়। অগত্যা বাড়ির পথ ধরলেন চন্দ্র।

দূর থেকে বৈঠকখানায় নারী পুরুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর কানে এলো। অন্দর মহলে প্রবেশের দ্বিতীয় পথ নেই আর।

অপর্ণা এবং মণিময় ছাড়া আরো জনাকতক অপরিচিত এবং অপরিচিতার হাস্যোজ্জ্বল সমাবেশ। মানুষটিকে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সকলেই দৃষ্টি ফেরালেন।

স্টুডিওর গণ্ডি ছাড়িয়ে এই দলটির এখানে আসাটা তেতো ওষুধ গেলার মত লাগছিল অপর্ণার। এখনো তার মুখের চকিত বিপন্ন ছায়াটা দৃষ্টি-গোচর হল না কারো। অতিথিবৃন্দের সপ্রশ্ন চাউনির জবাবে একটু হেসেই উঠে দাঁড়াল।—এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।···ইনি মিঃ দেশাই, প্রডিউসার।···ইনি ডিরেক্টর ত্রিবেদী।···মিস্ লয়লা খান্, আমার সঙ্গেই নতুন নেমেছেন···মিসেস্ বেদী, কত হাসাতে পারেন একবার এঁর ছবি দেখলে বুঝতে। মণিময়বাবুকে তো চেনই—ইনি মিঃ কাপুর, ক্যামেরাম্যান। অতিথিদের দিকে চোখ ফেরাল অপর্ণা, ডাঃ চন্দ্র—।

অভিবাদন বিনিময়ের পর প্রযোজক দেশাই ইংরেজী এবং উর্দু সংমিশ্রণে

উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করলেন।—বসুন, আপনার স্ত্রীর ছবি দেখেছেন নিশ্চয়? দেখেন নি! হাউ স্ট্রেইঞ্জ্! কালই পাস পাঠিয়ে দেব। সি হ্যাজ্ ওয়ার্কড মিরাক্ল্—আপনাদের মত সম্ভ্রান্তদের এ সহানুভূতি চিত্র-জগতে বিপ্লব আনবে আশা করতে পারি।

হাঁপিয়ে উঠলেন প্রায়। সঙ্গীসাথীরাও ঘাড় নেড়ে চিত্রজগতের স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আস্থা জানালেন।

গিরিরাজের অভ্যন্তরে তরল অগ্নি-স্রোত। বাইরে প্রশান্ত, হিম-শীতল। চন্দ্রর শান্ত মুখেও নেই কোন দাহের ইঙ্গিত। বললেন, ভারী খুশি হলাম পরিচিত হয়ে।…কিন্তু আমার আবার কাজ আছে একটু। আচ্ছা নমস্কার…।

বিজ্ঞানীর ছদ্ম-ব্যস্ততায় ভিতরে চলে এলেন। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে শুনলেন অপর্ণার প্রশংসাবাণী, ওঁর মাইক্রোসকোপ ঠিক থাকে যদি, ইত্যাদি—। আর শুনলেন অপর সকলের পালিশ করা হাস্যগুঞ্জন।

ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন রেলিংএ ঠেস দিয়ে। কতক্ষণ ঠিক নেই। হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখেন, অবিনাশ এবং সরমা প্রবেশ করছে গেট দিয়ে।

তাড়াতাড়ি নিচে নামলেন। ড্রইংরুমের কারো দিকে দৃক্‌পাত না করে বাইরে এলেন।

কি ব্যাপার, তোমরা…!

অবিনাশ বলল, বৌদি সেই কবে নাকি সরমাকে নিমন্ত্রণ করে রেখেছিলেন; আজ তাঁর ছবির প্রশংসা করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল সে কথা।

সারাপথ সরমা অবিনাশকে সাবধান করে এসেছে, সিনেমার প্রসঙ্গ যেন উল্লেখ পর্যন্ত না করে এখানে এসে। ফলে এই। কুণ্ঠিত মুখে বলল, আমি আজ নিজের কাজেই আসতুম আপনার কাছে।

বেশ, অপর্ণার ছবি দেখে এলে বুঝি?

হ্যাঁ…সত্যিই নিখুঁত অভিনয় করেছেন। সরমা না বলে পারল না।

চন্দ্র হাসলেন, অভিনয় জিনিসটা নিখুঁতই হওয়া চাই, এসো—। তাঁর কাছে কারা সব এসেছেন, একজন অবশ্য তোমার দাদা…আচ্ছা এসইতো, এসো অবিনাশ।

তারা দু'জন অনুসরণ করল অনেকটা যন্ত্র-চালিতের মত। ঘরে ঢুকে চন্দ্র অপর্ণাকে লক্ষ্য করে বললেন, আজ সুদিন বলতে হবে, আরো সব অতিথি

এসেছেন তোমার। প্রযোজকের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে বললেন, না না—তাড়া নেই, ইউ টেক্ ইওর টাইম্—আমরা ভিতরে গিয়ে বসছি।

অপর্ণা ততক্ষণে উঠে এসেছে সরমার কাছে। পিছনে অবিনাশকে দেখে থমকে গেল মুহূর্তের জন্য। সরমা দু'হাত কপালে ঠেকাবার আগেই হাত দু'টি ধরে ফেলে সানন্দে বলল, নমস্কারে কাজ নেই, এসেচ এই ঢের—ওপরে গিয়ে বোসো, আমি এক্ষুনি আসচি মূর্তিমানদের বিদেয় করে।

মণিময়ের দিকে চোখ পড়ল সরমার। ভোর-বেলার পাণ্ডু চাঁদের মত নিষ্প্রভ সমস্ত মুখ।

চন্দ্র আগে আগে উঠলেন সিঁড়ি দিয়ে। পিছনে সরমা, তারপর অবিনাশ। গুমটের মত লাগছে সরমার। মনের একান্ত নিভৃতে যে মন অন্তর্যামী, এ কোন্ ভবিষ্যতের দিকে তার নীরব ইঙ্গিত কে জানে। চলচ্চিত্রের এ হেন অভ্যাগত-দের সামনেও অবশ্য অপর্ণার সাদাসিধে গৃহস্থ-বউয়ের আটপৌরে বেশবাসে আতিশয্য দেখল না। সিনেমার দেয়ালে বিস্রস্ত-বসনা নারী-মূর্তি যেন আর কেউ। ছবিও ভালো লেগেছে। দেয়ালের ও বিজ্ঞাপন পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণের উপলক্ষ শুধু, নইলে নায়িকার ভূমিকায় তার সংযত অভিনয়ে নারীর মর্যাদা-বোধ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি কোথাও। কিন্তু এখানে এ পরিবেশ এবং সেখানে মণিময়ের উপস্থিতি—সহসা সব কিছুর যেন তাল কেটে গেল।

ভাবছে অবিনাশও। সেদিনের সেই বিহ্বল সন্ধ্যায় দ্রুতগতি মোটরের অন্ধকারে পার্শ্ব-লগ্না লীলা-সঙ্গিনীর এতটুকু মিল নেই আজকের অপর্ণার সঙ্গে।

তাদের বসতে দিয়ে চন্দ্র নিজে খাটের ওপর বসলেন।—এ ঘরেই আমি থাকি। সরমার দিকে তাকালেন, তোমার পরীক্ষার খবর বলো, কেমন দিলে?

ভালোই...।

কতটা ভালো?

সরমা স্মিতমুখে জবাব দেয়, ফার্স্ট ক্লাস পাব।

বেশ।...নিজের কি কাজের কথা বলছিলে তখন?

সরমা বলল, পরীক্ষা তো হয়ে গেল, ডক্টর সমাদ্দারের ওখানে কবে থেকে যাব ঠিক করে দিন...।

প্রসন্ন মুখে খানিক হেসে নিলেন তিনি।—ভয়ানক তাড়া যে! একবার ও ভদ্রলোকের সুনজরে পড়লে পালাতে চাইবে। অবিনাশের দিকে মুখ ফেরালেন,

ফ্যাক্টরী তো আছেই, বাড়ির ল্যাবরেটারিতেও দিন রাতে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ হলে বোধ করি খুশি থাকেন ভদ্রলোক।

সরমার কৌতূহল বাড়ল। দিবারাত্র এক কর্ম-মুখর সৃষ্টি-কাজে সেও একজন ভাবতে ভালো লাগে।—আমি কোথায় কাজ করব?

ল্যাবরেটারিতে। কারখানার কমার্সিয়াল মেডিসিনের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

ওদিকে নিচে ড্রইং-রুমের অতিথিরা গাত্রোত্থান করলেন। মজলিশ জমবে না আর বুঝেছেন। অপর্ণার নির্লিপ্ত অন্যমনস্কতার অর্থ সুস্পষ্ট। প্রযোজক দেশাই জানিয়ে গেলেন, নতুন ছবি রূপায়ণের আলোচনা মুলতবী থাকল আপাতত, কিন্তু শিগগীরই একদিন স্টুডিওতে আসা চাই অপর্ণার।

অপর্ণা মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল শুধু। লক্ষ্য অন্য দিকে। ডাকল, মণিময়-বাবু!

দরজার কাছ থেকে মণিময়ের প্রত্যাবর্তন।

আপনি, চললেন যে বড়, সরমার সঙ্গে দেখা করবেন না?

দেখা তো হলই। আজ নতুন গান নিয়ে বসব দুই একটা···ওকে বলে দেবেন একদিন যাব'খন।

অপর্ণার নীরব দৃষ্টি তার মুখের ওপর বিচরণ করল স্বল্পক্ষণ। হাসল একটু। আচ্ছা, আসুন তাহলে।

দোতলার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল অপর্ণা। যে করেই হোক বুঝেছে, সেদিন প্রদোষ-কালের নাটকীয় ব্যাপারটা অবিনাশ আজও বলেনি সরমাকে। অন্যমনস্কের মত তাকালো ওপরের ঘরের দিকে। চাকরকে চায়ের আদেশ দিতে ফিরে এলো আবার।

এদিকের ঘরে আলোচনার বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন হয়নি তখনো। চন্দ্র বললেন, কথা তো ঠিকই আছে, কবে থেকে কাজে লাগতে চাও বলো।

অপর্ণা ঘরে প্রবেশ করল। সরমাকে লক্ষ্য করে ঈষদহাস্যে বলল, দেরি হয়ে গেল, বোসো বোসো—উঠতে হবে না, আমি এখানে বসছি। চন্দ্রর পাশে খাটের ওপর আসন নিল সে।—থামলে কেন, একেবারে খোদ কেমিস্ট্রির আড়ালে আছি, আমাকেও একজন বিজ্ঞজন বলে ধরে নিতে পারো।

সরমা হেসে ফেলে চন্দ্রর কথারই জবাব দিল আগে, বসেই তো আছি এখন, যেদিন বলবেন সেদিন থেকেই যেতে পারি।

চন্দ্র বললেন, আচ্ছা, সবে পরীক্ষা দিয়ে উঠলে, বিশ্রাম তো করো এ সপ্তাহটা, একেবারে সেই পরের সোমবার থেকে এসো। আজ সমাদ্দারকে তোমার কথা মনে করিয়ে দেবখন আবার। ভাবলেন একটু।—তুমি আমাদের ল্যাবরেটারিতে কাজ করবে বিপিন জানেতো ?

অপ্রতিভ দেখাল সরমাকে। চিন্তা করেও স্মরণ হল না বিপিনকে এ সম্বন্ধে কখনো কিছু জানিয়েছে কি না। ক্ষুদ্র জবাব দিল, আজ বলব।

খাটুনি বেশি তাই বলছিলাম।·· যাক্, আর কাজের কথা নয় এখন। অপর্ণা, এদের একটু চা দেবে না ?

অপর্ণার দৃষ্টি এতক্ষণ সরমার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। চন্দ্রর চোখে চোখ রাখল। পরামর্শের স্বরে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বল, দেবো ?

সকলেই হেসে ফেলল। চাকর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আসতে অপর্ণা উঠে চা করল। এতক্ষণ পর্যন্ত একবার চেয়েও দেখেনি অবিনাশকে। এবারও অপরিচিতার মতই চা এবং খাবার এগিয়ে দিল। পরে নিজের জন্য এক পেয়ালা চা নিয়ে স্বস্থানে বসল আবার।

প্লেট থেকে আধখানা বিস্কুট ভেঙ্গে চন্দ্র বললেন, তোমার ছবির এঁরা খুব প্রশংসা করছিলেন অপর্ণা।

অপর্ণা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ভালো। মনে মনে যে শ্রাদ্ধ করছিলেন সে আর জানবে কি করে বলো।

বিব্রত মুখে বিস্কুট গলাধঃকরণ করলেন চন্দ্র। এসে পর্যন্ত অবিনাশ নিঃশব্দে বসে আছে লক্ষ্য করেছেন। সেদিন রাতে বিপিনের বাড়ি থেকে ফেরার মুখে ওর ওপর অপর্ণার সেই তিক্ত আক্রোশের প্রসঙ্গটা মনে পড়ল চন্দ্রর। নিঃসঙ্কোচে ওদের কথাবার্তা বলার সুযোগ দেবার জন্য একটু আগেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আচ্ছা, তোমরা গল্প করো, আমি চলি এখন।

ডুবন্ত লোকের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মত একটা ক্ষীণ আশাও মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল হয়ত। আজও অবিনাশ বলে যদি কিছু, সুফলই হবে।

কিন্তু এবারে বিপদ ডেকে আনল অবিনাশই। সরমাকে লক্ষ্য করে বলল, আমরাও তো এখন উঠলে পারি ?

সরমা কিছু বলার আগেই অপর্ণা জটিল করে তুলল পরিস্থিতি। সরমাকেই জিজ্ঞাসা করল হঠাৎ, তোমার তাড়া আছে কিছু ?

না।

তবে বোসো, আমি পৌঁছে দিয়ে আসব'খন তোমাকে। চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছ ?

না।

মুহূর্তের নীরবতা। অপর্ণার ইঙ্গিত স্পষ্ট। অবিনাশ চন্দ্রর সঙ্গেই যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াবে কি না ভাবছে। সরমা তাড়াতাড়ি বলল, পৌঁছে দিতে হবে না, আমরা পরে যাব'খন, আপনি যান মাস্টারমশাই।

তিনি চলে গেলে অবিনাশকে প্রায় ধমকেই উঠল সরমা, তোমারই বা এমন কি তাড়া, বোসো না—।

মানুষটার স্বভাব-বিরুদ্ধ নীরবতা এবং তার প্রতি অপর্ণার এ স্পষ্ট অবজ্ঞা দুই-ই সরমার বিস্ময়ের কারণ। তবু কিছু খেয়াল না করার মত হালকা সুরেই অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সঙ্গে এঁর তেমন আলাপ নেই বোধহয় ?

সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে অবিনাশ। মুখে নিরুপায় হাসির আভাস।

অপর্ণা শান্ত মুখে অপেক্ষা করল একটু।—তেমন আলাপটা কি রকম বুঝিয়ে বলো।

বিব্রত হয়ে শেষ পর্যন্ত অবিনাশকেই ঠেলে দিল সরমা। হেসে বলল, এমন চুপ করে থাকলে আমি সামলাই কি করে ?

অপর্ণা লক্ষ্য করল, চন্দ্রর সামনে মেয়ে যতটা শান্তশিষ্ট এমনিতে ঠিক ততটা নয়।

অবিনাশ হেসেই জবাব দিল, বিপদ ডেকে আনবে তুমি আর সামলাবার দায় আমার! মনের ত্রিশঙ্কু অবস্থা কাটিয়ে ফেলল জোর করে। যথেষ্ট সহ্য করেছে আর নয়। সোজাসুজি তাকালো অপর্ণার দিকে। বলল, আপনার মিথ্যে চেষ্টা বৌদি, বইয়ের রসায়ন তথ্য সরমা হয়ত বোঝে, কথার রসায়ন ওর মাথায় এক বর্ণও ঢোকে না—সে বেলায় এই সাদা দেয়ালটার মতই নিরেট ও। নইলে আমাকে আটকে রেখে দিতে না এমন করে, আপনার গাড়িতে ওকে পৌঁছে দেবার সাদা অর্থটা বুঝত।

সরমা চকিতে দু'জনকেই নিরীক্ষণ করল একবার। কৌতূহল দমন করে বলল, আশ্চর্য, আলাপ আছে কি না জিজ্ঞাসায় এমন বিভ্রাট!

অপর্ণা পূর্বের মতই নিস্পৃহ মুখে জবাব দিল, ওই তেমন কথাটা যদি তুলে নাও তাহলে অবশ্য বিভ্রাট কিছু হবে না।...নীতি-বিশারদরা তো আমাদের

ভয়ে দিশেহারা একেবারে। মুহূর্তের এক তীব্র কটাক্ষে এক ঝলক ব্যঙ্গছটা যেন ছড়িয়ে দিল অবিনাশের মুখের ওপর। [illegible] শান্ত আবার।—জানোই তো ছবিতে নেমেছি, তোমার মত সাইনটিস্ট তো নই।

নির্বাক শ্রোতার মতই বসে থাকে অবিনাশ। দুর্বোধ্য একটা বিস্ময়ের ধাক্কা আবারও সামলে নিয়ে সরমা জোরেই হেসে উঠল।—আমার মত সাইন-টিস্ট ফি-বছর গণ্ডায় গণ্ডায় বেরোয় য়ুনিভার্সিটি থেকে। কিন্তু আপনার কাম তো একটু আগে নিজের চোখেই দেখে এলাম, সাইনটিস্ট্‌দের শিল-নোড়ায় বাটলেও এ জিনিসটি তাদের দ্বারা হবে না।

অপর্ণা চেয়ে থাকে কয়েক নিমেষ।—সত্যি ভালো লাগল ?

খুব, আপনি তখন মিছেই অমন করে বললেন মাস্টারমশাইকে।

অল্প একটু হাসল অপর্ণা।

সরমা বলল, তাছাড়া এমন গাইতে পারেন কানে না শুনলে ভাবতে পারতুম না।

তুমি বাড়িয়ে তুললে আমাকে। একটু থেমে অপর্ণা অনেকটা আপন মনেই বলল যেন, পাঁচ-মিশালি গান ভেঙে সুরগুলি মন্দ করেননি তোমার দাদা—

সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের কোন্ পথ ধরে এই মন্তব্য সঠিক বোঝা গেল না। ফলে দেখা গেল গান অথবা ছবির প্রশংসায় সরমার উৎসাহ নেই আর।

লঘু-হাস্যে অপর্ণা এ প্রসঙ্গ ধামা-চাপা দিল এবারে।—এসব তথ্য থাক্ এখন, তোমার খবর বলো শুনি।

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সরমা।—খবর ভালোই।

বিপিনবাবুর একেবারে দেখা নেই কেন ?

দিনরাত ব্যবসার চিন্তায় ডুবে আছেন, বাড়ির লোকেরই দেখা পাওয়া শক্ত।

ও, বিয়ের পর বুঝি এই! আর আগে—। হাল্‌কা একটা কিছু বলার মুখে অপর্ণা থেমে গেল।—আচ্ছা আমার কাছে পাঠিয়ে দিও একদিন, বেশ করে সমঝে দেব।

হেসে ঘাড় নাড়ল সরমা, দেবেন।

পথে নেমে চুপচাপ অগ্রসর হল দু'জনে। সরমা আড়চোখে মাঝে মাঝে

দেখছে অবিনাশকে। তার দিক থেকে বাক-স্ফুরণের সম্ভাবনা না দেখে যথাসম্ভব নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, তারপর ?

ট্রামে ওঠো বাসে ওঠো ট্রেনে ওঠো—যা খুশি।

সে পরামর্শ চাইনি। এখানে দেরি হল বলে রাগ করোনি তো ?

না। অবিনাশ গম্ভীর।

করবে না জানি।...তোমাকে দেখে মনে হল অপর্ণা চন্দ্রর এ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলে। দেখছে সরমা। অপেক্ষা করল একটু।—জেনে শুনে কেন এলে বলো তো ?

ক্ষুদ্র জবাব দিল অবিনাশ, ঠিক এতটা জানতুম না।

চন্দ্র সাহেবের বাড়িতে অপর্ণার অভ্যর্থনা কি রকম হবে এ নিয়ে অবিনাশ যথার্থই মাথা ঘামায়নি কখনো। কিন্তু সকল জিজ্ঞাসা বাদ দিয়ে সরমার হঠাৎ এ প্রশ্নটা অবিনাশকে আর একদিকে সচেতন করল যেন। আজ ও বাড়িতে তার পদার্পণের উপলক্ষ সরমাই বটে, কিন্তু তার নিজের দিক থেকে কোনো আকর্ষণই ছিল না কি ?

ভাবছে...। যদি থাকেও, সেটা কোন্ জাতের ? যে আকর্ষণ নিয়ে মণিময় আসে এখানে আর আসেন চলচ্চিত্র পরিপোষকরা ?

আর একটিও কথা না বলে সরমা মুখ বুজে হেঁটে চলল। শিবাজী পার্কের ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অবিনাশের বাহুতে মৃদু আকর্ষণ করে ডাকল, এসো বসা যাক—

গ্যাস-পোস্টের আলো ছাড়িয়ে বেশ একটু অন্ধকারে জায়গা বেছে নিয়ে ঘাসের ওপর বসল সরমা। একটু তফাতে অবিনাশও। অবতরণিকা কিসের মর্মে মর্মে বুঝছে। তবু একটু অপেক্ষা করে মনের আড় কাটবার জন্যই হাল্কা হেসে বলল, বেশ নিরিবিলি জায়গাটি, ভাগ্যগুণে তেমন কেউ, ধরো বিপিনবাবুই ...হঠাৎ যদি এসে উদয় হতে পারেন, কিছুতে বোঝানো যাবে না, এক্ষুনি একটা গুরুগম্ভীর আলোচনায় মেতে যাব আমরা। ঠিক কি না বলো ?

সরমা সুবোধ মেয়ের মতই সায় দিল, ঠিক। অন্য কিছু ভাববেন হয়ত।

আ-হা, যদি আসতেন একবার।

সরমা বলল, আর একটু কাছে সরে এসো তাহলে, নইলে যদিই এসে পড়েন, ঠিক যা ভাবাতে চাও একেবারে তা নাও ভাবতে পারেন।

দূরে তারা ভরা আকাশের কোনো এক দিকে চোখ দুটোকে আটকে রাখে

অবিনাশ। সরমার অস্ফুট হাসি যেন কানের মধ্য দিয়ে শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে থাকে নিমেষ কতক। অতি সন্তর্পণে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সহজ দৃষ্টিতেই তার দিকে ফিরে তাকালো আবার।

কিন্তু ততক্ষণে গলার স্বর বদলে গেছে সরমার।—একটু আগে অপর্ণা চন্দ্রকে জব্দ করার জন্য তার ঘরের দেয়ালের সঙ্গে তুলনা করে এলে আমার। কিন্তু নিজেও কি সত্যিই তাই ভাবো?

না।

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করব না, নিজেই খুলে বলবে সব?

একটু সময় নিয়ে অবিনাশ বলল, শুনতে চাও বলতে পারি, কিন্তু তাতে ভুল বোঝার সম্ভাবনাই বাড়বে শুধু।

কাকে ভুল বুঝব, তোমাকে না অপর্ণাকে?

আমার জন্য চিন্তিত নই।

সরমা উষ্ণ হয়ে উঠল একটু, অপর্ণার জন্যও তোমার দরদের কোন কারণ দেখিনে।

স্বল্প নীরবতায় অবিনাশ কি চিন্তা করল নিজের মনে। তারপর সেদিনই সরমাদের ওখানে পার্টিতে যাবার আগে ওর কাছে চন্দ্র সাহেবের আসা এবং অপর্ণার সম্বন্ধে মানুষটির অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাসটুকু ব্যক্ত করল প্রথম। পরে সেদিন পথের ধারে অপর্ণার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ থেকে একে একে প্রায় সকল কথাই বলে গেল। নিজের সেই ক্ষণ-বিহ্বল দুর্বলতার কথাও গোপন করল না।

সরমা স্তব্ধ। সাড়া নেই অনেকক্ষণ। একজনের ব্যথাতুর শূন্যতা যত বেশি বুকে বাজে, রূপ-যৌবন বিলাসিনী আর এক নারীর এই নির্মম কৌতুকে মন তত বিরূপ হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে বলল, এর পরেও আজ এখানে এসে এক ঘণ্টা ধরে অপমান সইলে বসে বসে?

অবিনাশ জবাব দিল, সারাক্ষণ আমাকে তাঁর এই অবহেলা দেখাবার চেষ্টাকে শুধু যদি অপমান বলেই মনে করো ভুল হবে। নিজেকেই তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি হয়ত…

খানিক চুপ করে থেকে সরমা বিক্ষোভ সংযত করে নিল অনেকটা।—দাদাকে একবার পাঠিয়ে দিও তো আমার কাছে।

অবিনাশ হেসে ফেলল, গর্দান নেবে?

ঠাট্টা নয়, মাস্টারমশাইয়ের কাছে মুখ দেখানো মুশকিল হবে এর পরে।

অবিনাশ ফস্ করে বলে বসল, মাস্টারমশাইয়ের কাছে মুখ যাতে কমই দেখাও তুমি এ জন্মেই হয়ত অপর্ণা চন্দ্র তোমার দাদার নাকে দড়িটা পরিয়েছেন।

সরমা বিমূঢ়।—কি বললে?

অবিনাশ চুপচাপ বসে থাকে খানিকক্ষণ। যা বলে ফেলেছে, বলবে ভাবেনি কখনো। কিন্তু তা বলে ঢাকতেও চেষ্টা করল না আর। জবাব দিল, বললাম তোমার দাদাকে নিয়ে তোমার যেমন দুর্ভাবনা, তোমাকে নিয়ে অপর্ণারও তেমনি একটা দুর্ভাবনা থাকা অসম্ভব নয়।···আছে বলেই জানি।

সরমা হতভম্ব আবারও। আমাকে আগে বলো নি কেন এ কথা?

কি হত?

কি হত! সরমা জ্বলে উঠল প্রায়, আমি আসতুম না এখানে, এলেও অন্য-ভাবে চলতাম।

সে জন্যেই বলিনি।

যথার্থই রেগে গেল সরমা।—থাক আর তত্ত্বকথায় কাজ নেই। ছি, ছি, মাস্টারমশাইয়ের মত মানুষ—

অবিনাশ নির্বিকার প্রায়। বলল, অমানুষ নন্ বলেই অপর্ণার অস্বস্তি আরো বেশি। রাগ কোরো না, কারণ ছাড়া গণ্ডগোলগুলো যে ঘটে সেগুলি এমনি অদ্ভুতই হয়।

কি রকম? নির্লিপ্ত মন্তব্য শুনে সরমার বিরক্তি বাড়ে আরো।

পার্কে অন্ধকার ঘন হয়ে এলো আরো। অবিনাশ ওপরের দিকে চেয়ে দেখল একটা খণ্ড-মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদটা। তারপর সরমার অসহিষ্ণু প্রতীক্ষাটুকু উপলব্ধি করেই বলল যেন।—কি রকম আর, ওই মানুষটি দূরে সরে যাচ্ছেন এ সন্দেহ যদি অপর্ণার মনে জাগে, আর কেউ কাছে সরে আসছে তাঁর, এ সন্দেহই বা জাগবে না কেন। তাঁর ওপর রাগ করে আমাকেই যখন বাজিয়ে দেখতে গেল অমন করে, তোমার বেলায় এমনি একটা কিছু ভেবে নেওয়া অনেক সহজ। দুই-ই মনের অসুখ।

সরমা তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, অপর্ণা শুনলে এবারে চোখের জলে পা ধুয়ে দেবে তোমার! কিন্তু এ অসুখ হলে গারদে থাকার কথা এটা ভেবেচ?

অবিনাশ ঈষৎ হেসে জবাব দিল, থাকার তো কথা, কিন্তু পাঠায় কে।··· বিপিন চৌধুরীও গারদের বাইরেই আছেন।

সমস্ত উষ্ণতায় হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা জল পড়ল একপ্রস্থ। সরমা একেবারে চুপ।

নিরপেক্ষ আঘাত নয় শুধু। আর একটা সত্য চোখে পড়ে। অবিনাশ যত আপন হোক, পর-স্ত্রী হিসেবে সরমার ব্যবধানও আজ অপর্ণার থেকে কিছুমাত্র কম নয়। একে ডিঙিয়ে কাছে এসে চোখ রাঙাতে গেলে ও এমনি করেই সচেতন করে দেবে।

কিন্তু বোবা অভিমান নিয়ে সরমা বসে থাকল না বেশিক্ষণ। কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, আচ্ছা—বিপিন চৌধুরীর অসুখ যাতে গারদের বাইরেই সারে সে চেষ্টা করব। এ জন্যে যদি তোমার মায়া ছাড়তে হয় তাই না হয় ছাড়বো। তা বলে অপর্ণার অসুখও যদি তুমিই সারাতে যাও সেটা ভয়ানক বিসদৃশ হবে কিন্তু। ওঠো, রাত হল।

সাড়াশব্দ নেই।

নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো বসে আছে অবিনাশ। অন্ধকারে ভালো মুখ দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু ও মুখের বিবর্ণতা না দেখেও উপলব্ধি করতে পারে সরমা। আঘাত জায়গা মতোই লেগেছে। মৌন অস্বস্তি। পার্কের বাতাসও ভারী লাগছে কেমন।

আর, অনুতাপে সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে সরমা নিজেই। জীবনব্যাপী ব্যর্থতার দাহ বুকে নিয়েও যে মানুষ ওর পথ আগলে দাঁড়ায় নি একদিনের জন্যও, মায়া ছাড়বার এ ইঙ্গিতে তার শেষ সম্বল এই দুর্বলতাটুকুর এত বড় অসম্মান সেই কি না করে বসল!

আত্মস্থ হয়ে সরমা চেষ্টা করল সামলে নিতে। বাবুর রাগ হল বুঝি?

সাড়া পেল না।

পাবে না জানে। গলার স্বর একেবারে কোমলে নেমে এলো এবার।—বাড়ি যাবে না?

দূরের দিকে চোখ রেখেই অবিনাশ জবাব দিল, আমি একটু পরে যাব'খন, তুমি আর রাত কোরো না।

সরমা প্রমাদ গুনল মনে মনে। কাছে সরে এসে লঘু ঝঙ্কারে হাল্কা করে দিতে চাইল সব কিছু। বলল, কোথাকার কে অপর্ণা চন্দ্র তার জন্য নিজেরাই ঝগড়া করে সারা। একটা হাত রাখল তার কাঁধে, পরে গিয়ে কাজ নেই, চলো—

অবিনাশ বসে থাকে তবু।

কাঁধের ওপর সরমার হাতটা জোরেই নড়ে ওঠে এবার।—বলছি তো বাপু ঘাট হয়েছে, আর কক্ষনো বলব না এমন কথা। রাত হয়ে গেল, এরপর বাড়ি থেকে খুঁজতে বেরুবে আমাকে, লক্ষ্মীটি ওঠো—

উঠতে হল। আজ পর্যন্ত বহুবার আঘাত দিয়ে ফেলে সরমা অম্লান বদনে এমনি প্রতিজ্ঞা করেছে আর রাগের সময় অম্লান বদনেই ভুলেছে তা। তবু এমনি ছোট দু'টি কথায় অবিনাশ আগেও ভুলেছে, আজও ভুলল।

॥ ১২ ॥

সমাদ্দারের ল্যাবরেটারিতে সরমা যোগ দিয়েছে। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক কিছুদিন যাবত ফ্যাক্টরীর কাজে ব্যতিব্যস্ত। দৈবক্রমে প্রথম দিনই তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে সরমা কাছে আসতে তিনি চন্দ্রকে দেখিয়ে দেন,—ওখানে। আমার মরবার ফুরসত নেই এখন।

ভুটার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সরমা তাদেরই একজন জেনে ভারী খুশি। ওর প্রকাশ্য আনন্দে সরমাও বিব্রত বোধ করে প্রায়ই। হরিআনন্দ্‌এর সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে বলা যায়। মুখ তুলে আলাপ করবার মানুষ সে নয়। ভুটা এক একসময় কাছে এসে তার কানে কানে ঠাট্টা করে, মনে মনে দেখলে কি আর মন ভরে, মুখ তুলে দেখই না!

ফলে বেচারা অবনত-মুখী আরো।

কিন্তু সরমার উৎসাহ স্তিমিত-প্রায়। কোন্ অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীর সার্থক-তিলক কপালে জুটবে অনুমান করা শক্ত। বরং সেদিন প্যারেলএ ফ্যাক্টরী দেখে খুব উৎসাহ নিয়ে ফিরে এলো। ওই কর্ম-মুখরতার কিছু একটা স্থির লক্ষ্য আছে। সেখানে কাজের বেগের সঙ্গে মনের আবেগ আপনি মেশে।

চন্দ্রর কাছে প্রস্তাব করল, আমাকে ফ্যাক্টরীতে ব্যবস্থা করে দিন।

চন্দ্র অবাক, সেখানে কাজ করবে?

হ্যাঁ।

এই জায়গাটা কি দোষ করল?

জবাব দিতে পারে না। চন্দ্র হেসে সাবধান করলেন, আমাকে বললে তাই রক্ষা, সমাদ্দারের কাছে যেন মুখব্যাদানও করো না।

প্রায় জেনে শুনেই সরমা লজ্জা পেল। কিন্তু ওর যথার্থ সমস্যা ঠিক এই নয়। চন্দ্রর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় এখানকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করে নিতে পারত। কিন্তু পারে নি। সেদিন অবিনাশের ইঙ্গিতে ছাত্রী-শিক্ষকের যোগসূত্রটা ছিঁড়ে গেছে। এখন সামনে গিয়ে দাঁড়ালে নারীত্বের উপলব্ধি আগে মনে আসে।

গেল কিছুদিন। এবার সমাদ্দারের নিয়মিত উপস্থিতিতে ল্যাবরেটারির

আবহাওয়ার খানিকটা উন্নতি দেখা গেল। হাঁক-ডাক চিৎকার চেঁচামেচিতে হল-ঘর সরগরম।

কি ভু-ট্টা সাহেব, একটা সালফা-ড্রাগ অ্যানালাইজ্ করতেই যে বছর কাটালে! তোমার তড়বড়ানি কমাও বাপু একটু, নইলে হবে না কিছু।

তারপর আনন্দ! মুখখানা অমন গোমড়া কেন? একি তোমার বিলিতি ডিগ্রী যে একটার পর একটা পকেটে পুরবে? কাজ করো কাজ করো, সাম ডে দি ডেভিল পিপ্স্ ইন্—অ্যাণ্ড্ ইউ আর ফেমাস ওভার নাইট্। দাঁড়াও আমিও লাগছি তোমার সঙ্গে!

সরমা কি একটা সলিউশান চাপিয়েছে বার্নারে।

তাই তো, গিন্নি অ্যাফেয়ার বেমালুম ভুলে গেছি! ওকে কি কাজ দিলে হে চন্দ্র?

হাসি চেপে চন্দ্র মেডিক্যাল জার্নালের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। জবাব দিলেন না।

সমাদ্দার উঠে সরমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাত দু'টো ট্রাউজারের দুই পকেটে সন্নিবিষ্ট। সহসা ওর মুখের ওপর আটকে গেল যেন তাঁর দুই চোখ। ভ্রূদ্বয় বিস্ময়-কুঞ্চিত।

এ কি কাণ্ড!

সরমা থতমত খেয়ে বার্নার থেকে টেস্টটিউব সরিয়ে নিল। কোথায় ত্রুটি ঘটল না বুঝে তাকালো তাঁর দিকে। বাকি তিনজনের দৃষ্টিও এদিকেই আকৃষ্ট হয়েছে।

সমাদ্দার কণ্ঠস্বর চড়িয়ে দিলেন আরো।—কপালে সিঁদুর মাথায় ঘোমটা—বলি, কার সীমন্তিনী গো?

হঠাৎ এ ভাবে আক্রান্ত হয়ে সমস্ত মুখ টক্-টকে লাল হয়ে গেল সরমার। চন্দ্র তাড়াতাড়ি জার্নালে মনোনিবেশ করেন আবার। আর রং লাগে তরুণ-বিজ্ঞানী দুটির নির্বাক কৌতূহলে।

সমাদ্দার হেসে উঠলেন হা-হা শব্দে।—আমি লক্ষ্যই করিনি এতদিন! ভদ্রলোকটি কে গো? স্যায়েন্স্ পড়ে থাকে তো এনে লাগিয়ে দাও এই ঘানিতে—অ্যাণ্ড লেট্ মি ফাইট্ এ ডুয়েল।

শিশুর প্রগল্ভ উচ্ছলতা। টক্-টক্ করে স্বস্থানে ফিরে এসে বসেন আবার। সরমার হঠাৎ ভারী ইচ্ছে হয়, বিপিনকে এনে এ মূর্তিটা দেখায় একবার।

কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক দুনিয়ায় সমাদ্দার সাহেব আকস্মিক ব্যতিক্রম মাত্র। ব্যক্তি

গত জীবনে তাঁর আদর্শ প্রতিপদে হোঁচট [illegible]। সেখানে নিজের থেকেও দীর্ঘতর ছায়া ফেলে চলে মানুষ।

দু'টো বছর ঘুরে গেল।

রাসায়নিক সাধনার ফলাফল কিছুমাত্র উল্লেখযোগ্য নয়। বেশির ভাগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা আমূল পরিবর্তন আসছে সকলেরই। সমাদ্দার চন্দ্র ভুটা হরিআনন্দ সরমা—ক্ষুদ্র রসায়নাগারটির অভ্যন্তরে এরা পৃথক নয় কেউ। একই সম্মিলিত ইচ্ছার বেগ থেকে যে রসের সৃষ্টি তাকে উপলব্ধি করা চলে শুধু। সারা জীবনের ব্যর্থতা অনেক সময় তুচ্ছ মনে হবে এর কাছে।

কাজ নিয়ে অভিযোগের অবকাশ আজ আর নেই সরমার। বরং প্রথম প্রথম ক্ষুণ্ণ হত। অপর সকলের গবেষণার ফলাফল ধারাবাহিক ভাবে লেখা, জার্নাল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করে নোট্ রাখা-স্লীপ্ আঁটা এবং সময়কালে হাতের কাছে সেগুলি যোগান দেওয়া—এই [illegible] তার কাজ শুরু। ভাবত, আর যাঁরা আছেন, ফার্স্ট ক্লাস এম. এস্-সির ছাড়পত্র তাদের সর্বনিম্ন ছাপ—সমপর্যায়ে উঠতে সময় লাগবে। ভুটা হরিআনন্দ এমন কি চন্দ্রও দিনের কাজ সম্পন্ন করে বাড়ি চলে যেতেন, আর সে রাত পর্যন্ত বসে পাতার পর পাতা তাঁদের গবেষণার তথ্য লিখে রাখত এমন হয়েছে বহুদিন। তখনো জানে না, ডাঃ চন্দ্রর পরেই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি তার ওপর।

পরে বুঝেছে। এই কাজ আগে চন্দ্র করতেন নি[illegible] হাতে। তারও আগে সমাদ্দার। আজ এঁদেরই মত সরমারও কো[illegible] প্রকাশিত মতামত অথবা প্রবন্ধ রাসায়নিক-বিশ্লেষণে যখন আলোচনার বিষয়বস্তু রূপে দেখা দেয়, সমাদ্দার হেসে টিপ্পনী কাটেন, কি গো গিন্নি—খুব যে রাগ ছিল মনে মনে—বলি, এসব এলো কোথা থেকে?

কিন্তু ল্যাবরেটারির মত বাড়িতেও সুদীর্ঘ দু'টো বছর বিগত। তার ইতিবৃত্ত তেমন আনন্দের নয়। বাড়ির বাইরেও কিছু কাজ থাকবে সরমার, এমন একটা বোঝাপড়া অবশ্য বিয়ের আগে হয়েছিল বিপিনের সঙ্গে। কিন্তু মেরিন্ লাইন্সএ সাত-তলা বাড়ির ছক্-আঁকা মনে তখন এ শর্তটা কোন সমস্যাই নয়। উল্টে বলেছিল, সেও সহায় হবে।

সহায় না হোক বিপিন প্রকাশ্যে বাধাও অবশ্য দেয়নি কিছুতে। তবু একটা অদৃশ্য বাধা মনে লেগে থাকে সরমার।

কিন্তু বিপিন চৌধুরীই বা করবে কি ?

জীবনের পণ্য-তরী শত-ছিদ্র। একে জোড়াতাড়া দিয়ে সচল রাখার অক্লান্ত চেষ্টায় শ্রান্ত, বিপর্যস্ত। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাতে মাঝ-দরিয়ার নিরাশ্রয় পাখির মত যেদিকে তাকায় অথৈ জল। পাখার আকুলি-বিকুলি যত বাড়ে, অন্তিম রাহুর মুখব্যাদান তত কাছে মনে হয়।

আত্মবিশ্বাস বিচলিত, চিত্ত বিভ্রান্ত। নিরিবিলি সন্ধ্যায় নিতান্ত আপন কারো সান্ত্বনা পেতে মন হাহাকার করে ওঠে। তবু একবার ভেবে দেখে না, সম্পদ গেছে যাক, রিক্ততা দিয়েও যাকে বাঁধা চলে সরমা তাদেরই কেউ কিনা। সে ভাবনার ধৈর্য নেই মন নেই, চেষ্টাও নেই।

বাড়ি ফিরতে সরমার রাত হয় প্রায়ই। কোন দিন বা অসমাপ্ত কাজ হাতে করে নিয়ে আসে, নিজের ক্ষুদ্র রসায়ন ঘরটিতে বসে শেষ করবে। এছাড়া মণ্টুর আমন্ত্রণ আছেই। ভালো অনার্স পেয়েছে বি. এস্‌সি. পরীক্ষায়, এম. এস্‌-সি.তে আরো ভালোর আশা রাখে। রোজ সরমার সাহচর্য না পেলে সে রেগে আগুন।

সন্ধ্যার পর মণ্টু প্রায়ই সমাদ্দারের ল্যাবরেটারিতে গিয়ে হাজির হয়, সরমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরে। প্রথম প্রথম এ নিয়ে সরমা ঠাট্টাও করত। মণ্টু গায়ে মাখেনি। বাড়িতে একমাত্র সে-ই সহায় ওর, নইলে চারুদেবীর ক্ষুরধার রসনা এড়াতে অনেক আগেই বাড়ি ছেড়ে পালাতে হত। বিপিনও কাকীমার চোখের জলকে ভয় করে, কিন্তু ছেলের কাছে সবই ব্যর্থ। দু'বছর আগে সমাদ্দারের ল্যাবরেটারিতে যোগ দেওয়া মণ্টুর জন্যই অনেকটা সহজ হয়েছিল। বিপিনের মৌন মনোভাবটুকু বুঝে চারুদেবী হাল ধরতে এসেছিলেন। ছেলের দাপটে নাজেহাল হয়ে ফিরে গেছেন।

এই করে বছর দু'টো কাটল।

বিপিন স্থির হয়ে আসছে প্রতিদিন।...বাড়ির মধ্যে সরমা জানে এই মণ্টুকে।...আর বাইরে অবিনাশ। অব্যক্ত আক্রোশে ভেঙে তছনছ করে ফেলতে চায় সব কিছু। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায় কখনো। হিংস্র ক্রূর প্রতীক্ষায় ঘরের আলো নিবিয়ে জেগে থাকে যত রাত হোক।

ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে চেয়ে থাকে সরমা। নির্মম জড়-পেষণের মত লাগে কঠিন দুই বাহুর নিষ্পেষণ। কিছু যেন নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলতে চায় ওকে। হাড়-পাঁজরে টনটনে বেদনাটুকু বাজে বহুক্ষণ পর্যন্ত।

মেরিন্‌লাইনস্‌এ বিপিন চৌধুরীর সাত-মহল স্বপ্ন-সৌধ আগেই ধূলিসাৎ হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন যাবত সান্তাক্রুজএর ছোট বাড়িটা নিয়েও চারুদেবীর সঙ্গে একটা গোপন মন্ত্রণার আভাস সরমা পাচ্ছে। তবু এ নিয়ে তেমন কিছু কৌতূহল ছিল না তার।

পড়ার ঘরে সেদিন গম্ভীর মুখে বসে আছে মণ্টু। সামনে বই-পত্র ছড়ানো। সরমার মনে পড়ল, গতকাল কি একটা পাঠ্য বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে তার ডাক পড়েছিল। কিন্তু নিজের কাজ থাকায় সময় করে উঠতে পারেনি সরমা। ভাবল, রাগটা ওই জন্যে। হেসে বলল, মুখখানা অমন হাঁড়ি করে বসে থাকলে কি হবে, কালকের কাজ শেষ হয়নি, আজও ঘণ্টাখানেক লাগবে। ওদিকে বুড়ো রেগে আগুন—রাত দু'টো পর্যন্ত জেগে ক্যালকুলেশান শেষ করে নিয়ে যাইনি কেন।

মণ্টু শান্ত মুখে বলল, তুমি কাজ করো না, আমার তাড়া নেই কিছু।

বিনয়ের বিংশ সংস্করণ দেখি যে!

কথা না বাড়িয়ে সরমা খাতাপত্র খুলে বসল। নিবিষ্ট মনে কাজটুকু শেষ করে সেগুলি গুছিয়ে রাখল একপাশে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এবার এসো, তোমাকে নিয়ে পড়া যাক—।

হেসে ফেলেও সামলে নিলে চট্ করে, সমস্যাটা কি?

আজ থাক, মাথাটা ধরেছে কেমন—

মাথা ধরেছে তো তীর্থের কাকটির মত বসে আছ কোন আশায়, শুশ্রূষা-টুশ্রূষা যদি করি? সকৌতুকে অপেক্ষা করল একটু, আচ্ছা চলে এসো এদিকে, দেখি কে কোথায় ধরল মাথা।

মণ্টু উঠে দরজার কাছে গিয়ে দেখল পাশের ঘরে বিপিন আছে কি না। পরে তার পাশে এসে বসল। রকম-সকম দেখে সরমা বুঝল মাথা ধরা বা রাগটাগ কিছু না। কিছু একটা ঘটেছে। এতক্ষণে ভালো করে লক্ষ্য করল ওকে, শুকনো দেখাচ্ছে কেমন।

কি ব্যাপার?

তুমি এই সায়েন্সএর গবেষণা নিয়ে আর কতকাল ডুবে থাকবে? যেন বাড়ির কেউ নও, যে যা খুশি করছে—

সরমা আরও নিরীক্ষণ করে দেখে তাকে।—বাজে বোকো না, কি হয়েছে?

আজ এই বাড়ির মালিকানা বদল হয়ে গেল জানো?

সরমা বিস্ময় দমন করে ঘাড় নাড়ল।—না।

মণ্টু একটু থেমে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, দাদার কি বাইরে দেনা টেনা হয়ে গেছে?

ব্যবসায়ের বাজার ভালো না এটুকুই আঁচ করেছিল সরমা। ক্ষুদ্র জবাব দিল, জানিনে।

কিছুই তো জানো না।···মা আর দাদার নামে ছিল এই বাড়ি, আজ দাদার অংশ মায়ের নামে বিক্রি হয়ে গেল। দলিলপত্রে বিক্রি—মায়ের হাতে টাকা নেই আমি জানি।

সরমা বিপন্ন মুখে বসে থাকে কিছুক্ষণ। কিছু বলাও মুশকিল, নীরব থাকাও সহজ নয়। হাসল একটু, অবস্থা যদি তেমন খারাপই হয়ে থাকে এ ছাড়া আর উপায় কি, তোমার মায়ের অংশ নিয়ে টানাটানির আশঙ্কা ছিল হয়ত।

কিন্তু তোমার কাছে এমন ঢাকাঢাকি কেন?

হয়ত ভয় ছিল···

ছাই ভয় ছিল। উত্তেজনায় কথাটা শেষ করতে দিল না মণ্টু।—লজ্জা ভয় দাদার কিছুতে নেই শুনে রাখো। ল্যাবরেটারিতে দু'বছর ধরে গোয়েন্দা-গিরি করে আসছি তোমার পিছনে, সপ্তাহে ক'দিন তুমি অবিনাশদার বাড়ি যাও আর কখন যাও এই দেখতে—এখন আর আমাকেও বিশ্বাস করে না। বুঝেছে, আমি তোমাদের ল্যাবরেটারিতে যাই তাকে কোনো খবর এনে দিতে নয়, ভালো লাগে বলে। এই রকম ভয় তার তোমাকে—জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারো, পরোয়া করিনে। আমাকে কিছু বলতে আসে তো সাফ জবাব দিয়ে চলে যাব এখান থেকে, বাড়ি নিয়ে মায়ের সঙ্গে থাকুক।

আরক্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মণ্টু। সরমা স্তব্ধ।

বিপিনের মনোভাব অবিদিত ছিল না। তা বলে···

উঠল এক সময়। বিপিন ফেরেনি। আলো জেলে বিছানায় বসল। ভালো লাগল না বেশিক্ষণ। আলো নিবিয়ে অন্ধকারে ছাতের কার্নিশে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ভাবছে। এই অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা নিরর্থকই নয় শুধু, নির্বুদ্ধিতাও। মুখোমুখি বোঝাপড়ার গ্লানিময় ফলাফল অনুমান করতে পারে সরমা। মনুষ্যত্বের খোলসটা একবার গেলে কিছু আর বাকি থাকবে না। বাড়ির আবহাওয়াসুদ্ধু কলুষিত করে দেবে হয়ত। আত্মসম্মানের এই রূঢ় মৃত্যুকেই সকলের বড় ভয় সরমার।

মণ্টুর কথা চিন্তা করে আরো দমে গেল। বিপিন ওকে ক্ষমা করবে না কোন কালে। কিন্তু স্নেহের আকুলতা মনের অনেকটা জায়গাই জুড়ে বসেছে সরমার। ভাবে অন্যমনস্কের মত। ক'টা বছর আগের মণ্টুর সঙ্গে কত তফাৎ আজকের এই মণ্টুর।

নিঃশব্দে কাটল সে রাত।

পরদিন সরমা খুব সকালেই গত সন্ধ্যায় আনা কাগজপত্র হাতে করে মেরিনলাইন্‌স-এর উদ্দেশে বেরিয়ে গেল। ল্যাবরেটারিতে এ সময় কারো থাকার কথা নয়। সমাদ্দারেরও ওপর থেকে নেমে আসার সম্ভাবনা কম।

চন্দ্রর টেবিলে কাগজপত্র রেখে সরমা চিঠি লিখল একটা। খামে পুরে সেটা ভালো করে আটকে নাম লিখে বেয়ারার হাতে দিয়ে বলল, চন্দ্র সাহেবের হাতে দিতে হবে। দু'ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরে এলো আবার।

পড়ার ঘরে চুপচাপ বসে সময় কাটল অনেকক্ষণ। সকাল থেকে মণ্টু আজ আর ওপরে ওঠেনি। সরমাও খোঁজ করল না। নিজের হাতে একান্ত আপনার কিছু বিসর্জন দিয়ে আসার মত অনুভূতি-শূন্য স্তব্ধতায় মন আচ্ছন্ন।

সিঁড়িতে বিপিনের নেমে যাওয়ার শব্দ এলো কানে। সরমা উঠে এ ঘরে এসে চেয়ারে বসল। বিপিনের বড় ব্যাগটা চোখে পড়তে বুঝল, সে আপিসে যায়নি, এক্ষুনি ফিরে আসবে। ভাবল উঠে যাবে কি না। টেবিল থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিল চোখের সামনে।

খানিক বাদে বিপিন যথার্থই ফিরে এলো আবার। গত রাত্রি থেকে সরমার পরিবর্তনটুকু ভালো করেই লক্ষ্য করছে। আজ সকালে উঠেই কোথা থেকে ঘুরে এলো জানে না। এত বেলা পর্যন্ত বসে আছে চুপচাপ এও কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। ব্যাগে কাগজপত্র রাখার ফাঁকে তাকালো দুই একবার। খবরের কাগজে মুখ দেখা যাচ্ছে না। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে হঠাৎ কঠিন একটা হাসির রেখায় দুই ঠোঁট কুঞ্চিত হল বিপিনের। বেরুবার মুখে থামল একটু।—কাজে গেলে না?

খবরের কাগজের পাতা উল্টে ভাঁজ করে নিয়ে আবার পড়তে চেষ্টা করল সরমা।—না।

ছুটি আজ?

না।

পরে যাবে?

না।

স্বভাব অনুযায়ী বিপিনের রেগে ওঠার কথা। উল্টে খুশির আমেজ লাগল চোখের পাতায়। উৎফুল্ল পদক্ষেপে টক্-টক্ করে নিচে নেমে গেল।

বাড়ির ব্যাপারটা শুনেছে নিশ্চয়। ঠিক এই জন্যে এতটা বীতরাগ আশাতীত। বিক্ষোভের আড়ালে স্বার্থ-জড়িত সাধারণ মেয়ে সরমার নাগাল পেল যেন। ওর নিস্পৃহ অবহেলাটুকুই প্রত্যাশিত ছিল। আজ অনেক দিন বাদে বিপিন হাসল মনে মনে। এই তো স্বাভাবিক। ছেলে পড়িয়ে দিন চলত, অর্থ-সম্পদের সুনিশ্চিত আচ্ছাদনে চিড় খেলেও সেই মেয়ে বিচলিত হবে না এমন অসম্ভব ধারণাই বা ছিল কেন!

কিন্তু সবই গোলমেলে ঠেকল পরদিন সকালে। টেলিফোনের রিসিভার টেবিলে রেখে চাকরকে বলল, বৌদিকে বল্ ফোন্ আছে।

সরমা নিচে নেমে টেলিফোন ধরল। চন্দ্র সাহেব। ল্যাবরেটারি থেকে ডাকছেন। আগামী কাল দুপুরের দিকে একবার আসা চাই সরমার, বিশেষ কথা আছে। জবাবের অপেক্ষা না রেখে লাইন কেটে দিলেন তিনি।

শোনো—

বিপিনের ডাকে সরমা ঘুরে দাঁড়াল।

আজও কাজে বেরুচ্ছ না?

না।

কারণটা জানতে পাই না?

সরমা জবাব দিল না।

বিপিন একটু থেমে বলল, চন্দ্র সাহেব আমাকে একবার সন্ধ্যের দিকে তাঁর বাড়িতে বিশেষ করে যেতে বললেন।...তুমিও আসবে?

তাঁর সঙ্গে কাল আমার দেখা হবে।

মুখের দিকে চেয়ে থেকেও কিছুই আঁচ করা সম্ভব হল না বিপিনের পক্ষে। হল না বলেই কৌতূহল। আর একটু যেন অস্বস্তিও। হাসতে চেষ্টা করল।—তবু আসতে বলছি এই জন্যে যে তোমাদের ওই রিসার্চের মতো এমন একটা ব্যাপারে তোমার দু'দিন না যাওয়ার জন্য ভদ্রলোক পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করবেন হয়ত। এসব নিয়ে এখন আমার মাথা ঘামাবার সময় একটু কম।

সরমা স্পষ্ট জবাব দিল, যেও না, তিনি মাইনে-দেওয়া মনিব নন্ তোমার।

ওপরে এসে সরমা চুপচাপ বসে থাকে বহুক্ষণ। এতদিনের সব আশা

নিজে হাতেই শেষ করে এসেছে। এ দুঃখের শেষ নেই! দু'দিন ধরে একটু একটু করে অনুশোচনায় ভরে যাচ্ছে মন। বিকৃত-বুদ্ধি একজনের দ্বেষ আর হীনতায় দিশেহারা হয়ে এ কি করে বসল! শুধুই মন যুগিয়ে কাটবে সারা জীবন! বেলা দশটা না বাজতে ল্যাবরেটারির দিকে পা টানে। নিজের অজ্ঞাতে প্রতীক্ষা করে কিসের। আজ চন্দ্রর ফোন পেয়ে আশান্বিত হল, হয়ত বা সমাদ্দারকে এখনো কিছুই জানান নি তিনি।

নিচের ঘরে একা বসে জ্বলছে বিপিন চৌধুরীও! ঘরে-বাইরে সর্বত্র বুঝি কি এক ষড়যন্ত্র চলেছে তার বিরুদ্ধে। সব কিছু ধূলিসাৎ করে তবে ছাড়বে।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই চন্দ্রর বাড়ি পৌছল। যথাসম্ভব নিরুদ্বেগ সহজতায় প্রফুল্ল। চন্দ্র ফেরেন নি তখনো। অপর্ণা আছে। খবর পাঠালো।

ইতিমধ্যে দিন বদলেছে অপর্ণারও। আরো দু'তিনখানা ছবিতে তাকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা গেছে। অধুনা সাধারণের অজস্র অভিনন্দন এবং প্রযোজকের সাগ্রহ সমাদর দু'ই প্রায় উপেক্ষার বস্তু। চা স্নো পাউডারের বিজ্ঞাপনে তাঁর একটা স্বাক্ষরের আশায় ব্যবসায়ী উদগ্রীব।

কিন্তু সাফল্যের বান-ডাকা জোয়ারের তলায় তলায় একটা শুকনো ধারা বইছে কোথায়। একজনের চোখে ধরা পড়তে সহস্রের চোখে ধরা দিল, কিন্তু এর থেকে আগের সে বেদনাও যেন ছিল ভালো। আজ তার সাজের মধ্যে নেই কোন আকুতি, রূপ নিয়ে যশ নিয়ে মাধুর্য নিয়ে নিজেই ক্লান্ত। একটা অর্থহীন দুর্বার আক্রোশ জাগে কখনো বা। চূড়ান্ত পিচ্ছিলতা থেকেও শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনে নিজেকে। ভাবে, ছেড়ে দেবে এ পঙ্কিল পথ। যে পথে একটা মাত্র বিলোল কটাক্ষ উজাড় করে দেয় মানুষের সকল সঞ্চয়।

পারে না। এও এক নেশার মত পেয়ে বসেছে। কারণ অভিনয়ের আনন্দটুকুতে খাদ নেই। তার শেষের ছবিটা চন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে পরদায় দেখে এসেছে। তিনিও প্রশংসাই করেছেন। আজকাল স্ত্রীর এ জীবন-ধারা মেনে নিয়েছেন বলেই মনে হয়। চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট লোকজনের সমাগমেও তাঁর বিজ্ঞান-চর্চায় ব্যাঘাত ঘটে না আর।

কি আশ্চর্য, পথ ভুলে নাকি! বসুন, বসুন…

বিপিন হেসে বলল, আসবার ইচ্ছে তো সব সময় ষোল আনা, কিন্তু ভয় করে, এখন আর তেমন খাতির পাব কি না। কেমন আছেন?

ভালো। অপর্ণা সকৌতুকে চেয়ে থাকে তার দিকে, ভয়টা কিসের, অভিনেত্রী হয়ে যদি সব কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে থাকি?

স্তুতিকলা বিপিন আজও ভোলেনি। জবাব দিল, কি যে বলেন, নেহাৎ আসতে সময় পাইনে, নইলে আপনাকে নিয়ে গর্ব করি কত!

অপর্ণা বাধা দিল, থাক্ থাক্ ফুলে ফেঁপে অস্থির হয়ে যাব। আজ হঠাৎ কি মনে করে বলুন—

আজ পর্যন্ত বিপিন অপর্ণার একটা ছবিও দেখে উঠতে পারেনি। প্রসঙ্গান্তরে খুশি হল।—মোহিনীদার জোর তলব, কখন ফেরেন তিনি?

রাত ন'টার আগে নয়।

কি সর্বনাশ! আমাকে যে সন্ধ্যের পর আসতে বললেন ফোনে!

তাহলে এসে পড়বেন। চা দিতে বলি?

ধন্যবাদ, একটু আগে ও পর্বটি বেশ ভালো করে সেরে এসেছি।

অপর্ণা খোঁচা দিল, এখানে এসে চা পাবেন কি না ভয়টাও ছিল বুঝি?

বিপিন হাসি মুখেই জবাব দেয়, আপিস ফেরত ওটা নৈমিত্তিক ব্যাপার।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ আপনাকে জোর তলব কেন?

কি করে বলি, আসামী হাজির, তারপর দেখা যাক্।

সরমার খবর কি? সেই কবে একবার এসেছিল অবিনাশবাবুর সঙ্গে··· ভালো আছে?

হ্যাঁ। বিপিন থামল একটু, কবে এসেছিল বলুন তো?

তার প্রচ্ছন্ন কৌতূহলটুকু অপর্ণার চোখ এড়াল না।—সে অনেকদিনের কথা, দু'বছর হবে—একেবারে দেখা নেই কেন?

বিপিন গম্ভীর মুখে জবাব দিল, দেখা পাবেন কি করে, এ আমার শেয়ার মার্কেটও নয় বা আপনার ছবির অভিনয়ও নয়—একেবারে খাঁটি রিসার্চ! এক ফোঁটা ফাঁকি থাকবার জো নেই—মানুষের রোগ শোক জরা মৃত্যু সব এঁরা একেবার জয় করে তবে ছাড়বেন। আমি একটু আধটু দেখা পাই এই ঢের।

দু'জনেই হেসে ফেলল। মনে মনে অতিরিক্ত খুশি অপর্ণা। পরিহাসের আড়ালে ঝাঁজটুকু অনুমান করতে পারে। ছদ্মরাগ দেখাল মুখে।—বলবেন বই কি, নিজে শেয়ার মার্কেট নিয়ে দিনরাত ডুবে থাকেন, এখন ওর ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে—ভারী অন্যায়।

বিপিন জবাব দিতে যাচ্ছিল কি, বাইরে পায়ের শব্দ শুনে থেমে গেল। ডাঃ চন্দ্র।

তুমি এসে গেছ···আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

অপর্ণা উঠে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটি ছেড়ে দিল। তিনি বসলেন।

কতক্ষণ এসেছ?

এই তো খানিকক্ষণ, বৌদির সঙ্গে গল্প করছিলাম।

বেশ···ভালো আছ?

হ্যাঁ।

অপর্ণা বলল, তোমার অনুপস্থিতিতে শুধু গল্প করেই সমাদর করলাম অতিথির, চা খেলেন না। আজ রিসার্চের পর্ব যখন আগেই মিটল, একেবারে হাত মুখ ধুয়ে এসেই বোসো না?

চন্দ্র বললেন, থাক্, আমারও খাবার তাগিদ নেই।

ব্যস, নো ঝামেলা—হাসি মুখে একটা নিশ্চিন্ত ভাব দেখালো অপর্ণা—। আমি তাহলে চলি বিপিনবাবু, বেরুব।

এই মানুষটির ঘরে পদার্পণ মাত্রেই একটা অসাচ্ছন্দ্য অনুভূতির প্রতিক্রিয়া চলছে বিপিনের ভিতরে ভিতরে। কি ভেবে অপর্ণাকে বাধা দিল, খুব তাড়া না থাকে তো বসুন না একটু, কতকাল বাদে দেখা—আমি না হয় লিফ্‌ট দেব'খন আপনাকে।

অপর্ণা মোটর কিনেছে এবং সে গাড়ির দামে বিপিনের মত তিনখানা গাড়ি কেনা চলে। তবু যে জন্যেই হোক আপত্তি করল না।

আচ্ছা। মৃদু হেসে পাশের আরাম কেদারায় আসন নিল সে।

চন্দ্র অপেক্ষা করলেন একটু। পরে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি বলো তো?

কিসের?

সরমা এ কাজ ছেড়ে দিল কেন?

বিপিন অবাক। অপর্ণাও। নিজের অজ্ঞাতে উল্টো প্রশ্নটা আপনি নির্গত হল বিপিনের মুখ থেকে।—একেবারে ছেড়ে দিয়েছে?

তুমি জানো না? চন্দ্র ঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না।

না।···দু'দিন ধরে যাচ্ছে না দেখছি বটে। বিপিনের তীক্ষ্ণ দু'চোখ চন্দ্রের মুখের ওপর আবদ্ধ থাকে স্বল্পক্ষণ।—কারণ জানায় নি?

যেটুকু লিখেছে কিছুই নয়। নানা অসুবিধের জন্যে তার আর আসা হবে না, এই। থামলেন একটু, অসুবিধেটা কি?

স্বাভাবিক কণ্ঠেই বিপিন জবাব দিল, কি করে বলি, হয়ত এ কাজ আর ভালো লাগছে না তার।

চন্দ্র হাসলেন।—সরমা জানে যে কাজে হাত দিয়েছে সেটা ছেলে-খেলা নয়।

আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে অপর্ণা নিঃশব্দে বসে আছে। বিতর্কের জের বিবাদে দাঁড়াবার ভয়ে শঙ্কিত। কৌতূহল আরো বেশি।

বিপিন শান্ত।—তা হলে তুমি বলতে চাও ছেলেখেলা গোছের একটা কিছু আমিই করছি?…কিন্তু আমি যদি বলি সংসারটাও ছেলেখেলা নয়, পাঁচজনের প্রতি দায়িত্ব আছে কর্তব্য আছে, শুধু আদর্শের স্বপ্নে ডুবে থাকা চলে না—এও ছেলেখেলা হবে বোধ করি?

চন্দ্র ক্ষণকাল নীরব থেকে আস্তে আস্তে বললেন, এই দায়িত্বজ্ঞানটুকু তুমিই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছ কি না জানতে চাইছিলাম।… কিন্তু অবিনাশ যদি সত্যি কথা বলে থাকে, সরমার এ কাজ বরাবর মেনে নেবে বলেই তো তুমি তার কাছে স্বীকার করেছিলে?

আজই ল্যাবরেটারি ফেরত চন্দ্র অবিনাশের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ না করাই সমীচীন ছিল। বলে ফেলে অপ্রস্তুত হলেন।

নিজেকে সংবরণ করতে এবারে বেশ সময় লাগল বিপিনের।—এসব কথায় আমি অপমান বোধ করছি মোহিনীদা। কে অবিনাশ, কি করেই বা সে সরমার সম্বন্ধে এমন নাটকীয় বোঝাপড়ার অধিকার পায় ভেবে দেখার সময় বা রুচি আমার কম।…নিজের ব্যবসায়ে তলিয়ে যাচ্ছি কোথায় ঠিক নেই, এর মধ্যে সরমার কাজ নিয়ে আনন্দে লাফালাফি হয়ত করিনি, কিন্তু তা বলে কথা রাখিনি বা কাজে বাধা দিয়েছি কখনো, এ কথাই কি সরমা বলেছে তোমাকে? কেন আজ আমাকে ডেকে এনে এসব শোনাচ্ছ?

চন্দ্র অধোমুখে বসে থাকেন খানিকক্ষণ। নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে ওঠেন মনে মনে। নরম স্বরে বললেন, ছি ছি, আমার বলার দোষেই এমন রেগে গেলে তুমি—তোমাকে শোনাব কিছু এত বড় স্পর্ধার কথা আমি ভাবব কেন? তাছাড়া, সরমা কিছু বলা দূরে থাক, তোমার সম্বন্ধে কোনোদিন তার এতটুকু অভিযোগ কখনো দেখিনি। তুমি তাকে বাড়িতে

ল্যাবরেটারি করে দিয়েছ এ নিয়ে সমাদ্দারের হাসি-ঠাট্টায় লজ্জা পেয়েও তাকে খুশি হতে দেখেছি।

বিপিন শান্ত মুখে বলল, তাকেই কেন ডেকে জিজ্ঞাসা করলে না কাজ ছাড়ার কারণটা কি?

চেষ্টা করে বেশ জোরেই হাসলেন চন্দ্র।—একসঙ্গে কাজই করি বা যত স্নেহই করি, ও সেদিনের ছাত্রী আমার। বন্ধু হিসেবে তোমাকে যা খোলাখুলি জিজ্ঞাসা.করা চলে তাকেও কি চলে!

অপর্ণা নির্বাক দ্রষ্টা এবং শ্রোতা। বিপিনের ক্রোধ কিছুমাত্র প্রশমিত না হলেও চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

আমাকে কি করতে বলো এখন?

সাদা মনে বোঝাপড়া করতে গিয়ে একবার ভুল রাস্তায় পা দিয়েছেন চন্দ্র। বোঝাপড়ার ধার দিয়েও গেলেন না আর। জবাবে এবারেও বিব্রতভাবটুকুই আগে প্রকাশ পেল মুখে।

কি বলি না বলি তোমার রাগ দেখে সবই ঘুলিয়ে যাচ্ছে। অথচ, কি করে তোমাকে বোঝাই এ সময়ে ওর এই না আসার অর্থ কি। দু'টো বছরই শুধু পণ্ডশ্রম নয়, অনেক ব্যবস্থাও ওলটপালট হয়ে যাবে। সমাদ্দার নিজে ওকে পড়াচ্ছেন, কাজ শেখাচ্ছেন···আশাও রাখেন অনেক। ওর এদিকে ঝোঁক দেখে আনন্দে আটখানা তিনি—হঠাৎ এ ব্যাপার শুনলে আকাশ থেকে পড়বেন বোধ করি। আর তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত যে ধাওয়া করবেন এতেও কোন ভুল নেই।

অখণ্ড নীরবতা। দেরি হচ্ছে দেখেও বিপিনকে যাবার তাড়া দিতে ভুলে গেছে অপর্ণা। তাছাড়া চন্দ্রর এমন বিনীত সুপারিশে এক ধরনের আনন্দও পাচ্ছে হয়ত।

একটু পরে চন্দ্রই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ব্যবসার সম্বন্ধে কি বলছিলে, ভালো যাচ্ছে না?

ঝোঁকের মাথায় বিপিন দুরবস্থার কথাটা প্রকাশ করে ফেলেছে। জবাব দিল, বাজার সর্বত্রই খারাপ এখন, আমার ব্যবসা বলে কিছু নয়। উঠে দাঁড়াল, আচ্ছা আজ চলি রাত হয়ে গেল।···সরমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখব তার অভি-যোগ কি।

—শোনো, দ্বিধা কাটিয়ে চন্দ্র বললেন, তাকে কাল আমি ল্যাবরেটারিতে

আসতে বলেছি, তোমার অমত না থাকে তো কোন কথা না শুনে কাজে লাগিয়ে দেব।

দিও। বৌদি চলুন—

অপর্ণা উঠল। তার দেরিই হয়ে গেছে। এক ঝলকে যতটা দেখে নেওয়া যায় ঘরের মানুষটিকে, দেখল। চোখে মুখে ঠোঁটের কোণে কৌতুকাভাস। বসে বসে ভারি মজা দেখে উঠল যেন একটা।

কলেজ রোড ধরে গাড়ি ছুটেছে। পাশে অপর্ণা। স্টুডিও যাবে। এক সময় বলল, আপনি বেশ জোরে ড্রাইভ্ করেন তো।

বিপিন হাসল একটু।

কথা শুরু করে কথা বলাটা সহজ হল আরো। অপর্ণা হালকা হেসেই বলল আবার, আজকের এই অনধিকার চর্চার জন্য আর বোধহয় মুখ দেখবেন না আমাদের, না?

বিপিন চিন্তামগ্ন। ক্ষুদ্র জবাব দিল, তা কেন।

তবু আর একটা অনধিকার চর্চা করব আমি। অপর্ণা ভাবল একটু, আচ্ছা··· সরমাকে যতটুকু চিনেছি, ঘর-সংসার বা আপনাকে অবহেলা করবে তেমন মেয়ে তো সে নয়?

অকারণেই হঠাৎ অবিনাশের ঘরে সরমার সেই শয্যা-বিন্যাসের দৃশ্যটা চোখে ভাসল বিপিনের। জবাব দিল না।

অপর্ণা ফিরে তাকালো তার দিকে, আপনার অসুবিধের কথা তাকে বলে-ছিলেন কখনো?

না। বিপিনের দুচোখ সামনের রাস্তার ওপর।—মোহিনীদার সুবিধে-অসুবিধের কথা সব সময় আপনাকে বলার দরকার হয়?

অপর্ণা একেবারে চুপ। বিপিন কি ভেবে আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বৌদি, অবিনাশের সঙ্গে আপনাদেরও বেশ চেনাশুনা আছে, না?

অপর্ণা ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখতে চেষ্টা করল একবার। জানি তাঁকে।···কেন?

এমনি। সকলেই এই বিশেষ লোকটিকে জানে দেখছি, আমারই সুযোগ হল না।

চকিত কটাক্ষ অপর্ণার। চকিত বিশ্লেষণ। চেষ্টা করেছিলেন?

না তাও করিনি। বিপিন হাসল একটু, আচ্ছা, জানার হাতেখড়ি আপনার কাছ থেকেই শুরু হোক, বলুন শুনি—।

সহসা একটা ক্রূর অভিলাষ অপর্ণার ভিতর থেকে চাড়িয়ে ওঠে যেন। ক্ষণকাল আগে চন্দ্রর আবেদনের সুরটা লাগল কানে। ভালো ভালো ওরা খুব ভালো—এত ভালোর তুলনা নেই। কিন্তু অপর্ণা নিজে তো ভালো নয় কিছুমাত্র। দেবে নাকি এমন অসম্ভব ভালোর গায়ে একটু কালি ছিটিয়ে! বিপিনের দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করে আমোদ পেলো আরো। তার দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে বসল এবার।

অন্ধকার সত্ত্বেও অপর্ণার মোলায়েম হাসিটুকু সুদৃশ্য। মজার কিছুই যেন মনে পড়ে গেল হঠাৎ। বলল, অনেকদিন আগে কি একটা কথায় মণিময়বাবু বলছিলেন, সরমা জানে শুধু কেমিস্ট্রি পড়তে আর অবিনাশের সঙ্গে আড্ডা দিতে। ভালো করে আমি তখন জানিইনে ভদ্রলোক কে বা কি, নাম শুনতাম প্রায়ই। আপনাদের বিয়ে সবে ঠিক তখন—মণিময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ের পাত্রটি অবিনাশবাবু নন্ কেন। শব্দ করেই হাসল আবার, রেগে যাচ্ছেন না তো?

বিপিন উৎকর্ণ। না না রাগব কেন, তারপর?

মণিময়বাবু জবাব দিলেন, অবিনাশের না আছে চালচুলো না আর কিছু। তিনি তাচ্ছিল্য করেই কথাটা বলেছিলেন, কিন্তু পরে জেনেছি লোকটার সত্যিই এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কিছু নেই। চালচুলো না থাকার সঙ্গে আর কিছু না থাকাটা বড় বিষম জিনিস।

হেঁয়ালির ধার দিয়েও গেল না বিপিন। ওদের বিয়ে না হওয়ার আড়ালে এই স্থূল দারিদ্র্যের ইঙ্গিতটুকু শুনেই খুশি।

বাক-চাতুর্য এখন নিজের বিবেকেই বিঁধছে অপর্ণার। চিনলেন?

কতকটা।

আচ্ছা, ভালো করে চিনিয়ে দিচ্ছি আরো।—লোকটার ওই ভাঙ্গা কপালের দাম দিতে পারে এমন সম্পদ কারো নেই—আর এ সত্যটা সবচেয়ে ভালো জানে সরমা। তাই তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আপনি ঘরে গিয়ে ঘুমোন নাকে তেল দিয়ে। গাড়ি থামান, আমি নামব এখানে।

হঠাৎ রূঢ় কণ্ঠস্বরে হকচকিয়ে গিয়ে পথের মাঝখানে ব্রেক কষল বিপিন। নেমে সশব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে অপর্ণা হেঁটে চলল হন হন করে। রাগটা বিপিনের ওপরেও হতে পারে, চালচুলো-বিহীন অবিনাশের সম্বন্ধে এই স্বীকৃতির দরুন নিজের ওপরে হওয়াও বিচিত্র নয়।

খাওয়াদাওয়া সেরে বেশ একটু রাত করেই ওপরে উঠল বিপিন। অন্ধকার ঘরে সরমা খাটে ঠেস দিয়ে বসে আছে চুপচাপ। আলো জ্বালতে ফিরে দেখল একবার।

বিপিন চেয়ারটা তার কাছে টেনে নিয়ে বসল।—চন্দ্র সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এলাম, তাঁর স্ত্রীও ছিলেন।

নীরবে তাকালো সরমা।

তুমি কাজে একেবারে ইস্তফা দিয়ে এসেছ শুনলাম?

সরমা ঠাণ্ডা প্রশ্ন করল, তোমাকে ডেকেছিলেন কেন?

কৈফিয়ৎ নিতে। এতবড় একটা অসম্ভব ব্যাপারে দিশেহারা হয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই রীতিমত অপমান করে ছেড়ে দিলেন। তা যাক, আমার আর দামটা কি। কিন্তু ল্যাবরেটারির সব ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যাবে জেনেও তুমি এমন কাজ করে বসলে?

সরমা প্রথমে বিস্মিত। কাউকে অপমান করবার মানুষ চন্দ্র সাহেব নন্, আর অপর্ণা সহানুভূতি দেখিয়ে কিছু শোনাবে এও বিশ্বাস্য নয়। ল্যাবরেটারি-প্রসঙ্গে শেষের শ্লেষটুকু মর্মান্তিক।

বিপিন লক্ষ্য করছে ভাবান্তর। অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল আবার, হঠাৎ অপরাধটা কি করলাম জানতে পাই না?

জেনে কি হবে। সরমা স্থির শান্ত।

আর কিছু না হোক শুধরে নিতে চেষ্টা করতে পারি।

পারো? সরমা সম্পূর্ণ ঘুরে বসল তার মুখোমুখি। চোখের দৃষ্টি বুঝি অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিল তার।

কাকীমার নামে বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা আমাকে লুকিয়ে চুরিয়ে কেন? আমি বাধা দিতাম?

সশব্দে হেসে ওঠে বিপিন। আনন্দে উছ্‌লে উঠল যেন। এই! আমার ভয় ছিল কি না কি।...তা আমি তো ভেবেছিলাম টাকা পয়সা ঘর বাড়ি এসব অতি তুচ্ছ তোমার কাছে!

ঠিকই ভেবেছিলে, অতি তুচ্ছ। তেমনি চেয়ে থাকে সরমা।—আর দু'বছর ধরে মণ্টুকে আমার পিছনে লাগিয়ে রেখেচ কি করি কোথায় যাই দেখতে—সে সম্বন্ধে কি ভেবেছিলে?

অকস্মাৎ বজ্রপাত হলেও বিপিন সম্ভবত এমন চমকে উঠত না। বিবর্ণ

পাংশু ছ'চার মুহূর্ত। তীরের মত উঠে দাঁড়াল সে।—মণ্টু বলেছে এ কথা ?

মৃদু কঠিন কণ্ঠে সরমা বলল, চেঁচিও না, আমি কাছেই বসে আছি। কি ভেবেছিলে তখন ?

অন্ধ আক্রোশে বিপিন দরজার দিকে অগ্রসর হতে সরমা ঈষদুচ্চ কণ্ঠে বাধা দিল, দাঁড়াও—।

পা দুটো হয়ত বা নিজের অজ্ঞাতেই থেমে গেল বিপিনের।

সরমা বলল, মণ্টু আজ আর এতটুক ভয় করে না তোমাকে, কিন্তু আমি ভয় করি তাকে। তার আত্মসম্মান বোধ আছে। এই নিয়ে ওর ওপর তোমার একটা কটু কথায় আমাকে তুমি বরাবরকার মত তাড়াবে এ বাড়ি থেকে। খুব ভালো করে বুঝে নিয়ে তবে যাও।

বাহ্যজ্ঞান রহিতের মত বিপিন ঘুরে দাঁড়াল। নির্বোধ, বিমূঢ়। নড়াচড়ার সামর্থ্যও হারিয়েছে যেন। এক পা দু'পা করে বাইরের অন্ধকারে এসে আশ্রয় নিল সে। সরমা উঠে দেখল কোথায় যায়। পরে খাটে এসে বসল আবার।

পরদিন।

বিপিন কাগজ পড়ছে। অথবা চেষ্টা করছে পড়তে। সরমা মণ্টুকে ঘরে ডেকে পাঠালো। সে এলে বিপিনকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার গাড়িটা রাত্রিতে ছেড়ে দিতে পারবে আমাকে ?

খবরের কাগজ প্রায় মুখে ঠেকেছে বিপিনের। ঘাড় নাড়ল, পারবে।

সরমা মণ্টুকে বলল, ল্যাবরেটারি থেকে সন্ধ্যের পর আমি অবিনাশের ওখানে যাব। ফিরতে দেরি হতে পারে, উনি আপিস থেকে এলে তুমি এই··· সাড়ে আটটা নাগাদ আমাকে আনতে যাবে। হাঁ করে দেখচ কি, কাজ নেই তো কিছু ?

কোন প্রকারে মাথা নেড়ে মণ্টু ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করল। সরমা সেখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করল একটু। বিপিনের সমস্ত মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। গামছা কাপড় নিয়ে সরমা ধীরে সুস্থে স্নানের উদ্দেশে চলে গেল।

ল্যাবরেটারি।

ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করে সরমা দেখে সমাদ্দার পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে টেলিফোনে কথা বলছেন তারস্বরে। মেডিকাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ?

সমাদ্দার—। কি বাবা, স্যাম্পল্‌টা যে পাঠালাম ইম্‌প্রুভমেণ্ট্‌ দেখলে কিছু? না? রাবিশ! তোমাদের রিপোর্ট পাঠাচ্ছ না কেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

সরমাকে দেখে চন্দ্র উঠে এলেন। নিচু গলায় বললেন, তুমি এমন ছেলেমানুষ জানতুম না। সমাদ্দারকে যা হোক কিছু বলে দিও, তাঁকে চিঠি দেখাই নি।

সরমা নিজের ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়াল। ভুটা সহাস্যে কুশল প্রশ্ন করে গেল। হরিআনন্দ্‌ নিজের জায়গা থেকেই মুখ তুলে দেখল একবার। বিগত ক'টা দিনের সকল কাজ নীরস লাগছিল তু'জনেরই।

ফোন রেখে সমাদ্দার ফিরে দাঁড়ালেন, ওহে ভুটা-আনন্দ-চন্দ্র কোম্পানী—

সরমাকে দেখা মাত্র থেমে গিয়ে অস্ফুট শব্দ নির্গত করলেন একটা। মাই ডিয়ার, ডিয়ার!

ব্যস্তসমস্ত ভাবে কাছে এসে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন তার।—অসুখ করেছিল?

মৃদু হেসে সরমা বলল, না।

না মানে! বিষম অবাক তিনি, বলা নেই কওয়া নেই ডুব মেরে দিলে তু'তুটো দিন! আমি ভেবে সারা, চন্দ্রকে তাগিদ দিচ্ছি সাতবার করে, দেখে এসো অসুখ করল কি না, আর এদিকে দিব্বি আনন্দ করে বেড়াচ্ছ! আজ থেকে রোজ তু'ঘণ্টা করে জরিমানা করলাম তোমার!

সরমা নিরীহ মুখে প্রশ্ন করল, তু'ঘণ্টা করে কম খাটব?

ইউ ন'টি গার্ল, তু'ঘণ্টা বেশি খাটবে।

সরমা হাসি মুখেই তর্ক করতে ছাড়ে না।—এমনিতেই তো কাজের পর ঘণ্টা তুই বেশি থাকি রোজ।

দরাজ গলায় হাসতে হাসতে তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে সমাদ্দার নিজের জায়গায় এসে বসলেন।

অদ্ভুত ভালো লাগছে সরমার। যেন বৈচিত্র্য-হীন একটানা প্রবাস-নির্বাসনের মেয়াদ কাটিয়ে আজ নিতান্ত নিজের জায়গাটিতে ফিরে এসেছে।

ল্যাবরেটারি থেকে বেরিয়ে সরমা অবিনাশের উদ্দেশ্যে ট্রেনে চাপল। সব ভুলে ছিল এতক্ষণ। রাতে আবার বাড়ি ফিরে দেখতে হবে সেই গম্ভীর মুখ। আনন্দ নেই, হাসি নেই, অসন্তোষের প্রতিমূর্তি। অনেকদিন বাদে অবিনাশের জন্য মনটা বেশিরকম ছটফট করে উঠল। তাকে বলবে সব। সুরাহা

কিছু না হোক, বলার জন্যেও বলবে। এই দুর্বিসহ গুমট সহের সীমা ছাড়িয়েছে।

সম্প্রতি ওদের দেখা-সাক্ষাৎ দুই একটা ছুটি-ছাটার স্বল্পতায় সীমাবদ্ধ। সরমা সময় করে উঠতে পারে না। সেদিন মণ্টুর মুখে শুনেছে অবিনাশের শরীর ভালো যাচ্ছে না। কিন্তু মাঝখানের এই গোলযোগে কিছুই মনে ছিল না।

বিগত দিনের স্মৃতি বার বার মনে পড়ে।

সায়েন্স কলেজে যখন তখন উপস্থিত হয়ে তাকে অপ্রস্তুত করা, মণিময়কে রাগানো, লোকচক্ষুর কৌতূহল এড়িয়ে দূর নিরালায় বালুর ওপর পা ছড়িয়ে বসা, মানুষটার ব্যঙ্গোচ্ছ্বাস…সমুদ্রের কলধ্বনি।

সরমা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে কেমন। ভাব-প্রবণতার জায়গা নেই মনে, প্রতিষ্ঠার সার্থক-মাল্য একমাত্র লক্ষ্য। তবু আগের দিনগুলি ভাবতে গেলে আত্মবিস্মৃত নিঃশ্বাস পড়ে দুই-একটা। অতীতে নির্বাসিত ওরা। কোনো দিন কোনো ছলেই ফিরে আসবে না আর।

ভারী ইচ্ছে করছে অবিনাশকে নিয়ে আজ সমুদ্রের ধারে সেই পুরানো জায়গাটিতে গিয়ে বসে। হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল, ওর শরীর সুস্থ থাকলে তাই যাবে আজ। অসুস্থতার প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল ক'টা বছর আগে শঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময়েও ওষুধ আর পথ্য খাওয়া নিয়ে তার সেই চপলতা।

সচেতন হল সরমা। অপ্রস্তুতও। নিজের মনেই হাসছে সে। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে অপরিচিত যাত্রীদের নীরব কৌতূহল।

সেই সঙ্গে অলক্ষ্য দেবতাটিও নিঃশব্দে হাসছিলেন বোধ করি।

সামনে বই খুলে অবিনাশ বিছানায় সমাসীন। নারী সমাগম উপলব্ধি করে খোলা বইয়ের দিকে চেয়েই জোরে জোরে পড়তে শুরু করল, রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা, বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনি কাহারো কথা, বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে—

সরমা বই টেনে নিয়ে দেখে, কমার্সিয়াল বিজ্ঞাপনের গাইড একটা। রাগ করে চৌকির এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা। হেসেও ফেলল। ওর ঠাট্টার নমুনা শুনে মনে মনে বিস্মিত, বিগত কটা দিনের ঘটনা জানে কি না বোঝা গেল না।

বলল, মেজাজপত্র ভালো না আমার, রাগিও না বলচি। ভাঙ্গা চেয়ারটা মুখোমুখি টেনে নিয়ে বসল, কেমন আছ?

ভালো।

সরমা আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করল, ভালো তো দেখচি না?

দেখবে না তো। তড়বড় করে বলে গেল অবিনাশ, লোকে বলে দেহের সঙ্গে মন আর মনের সঙ্গে দেহের যোগ—একেবারে বাজে কথা। নাছোড়বান্দা ঐহিক দেহটার সঙ্গে পেরে উঠছি না বটে কিন্তু মনটা একদম পারত্রিক জগতের সিংহদ্বার ঠেলে আধ্যাত্মিকতার সিঁড়ি ছুঁয়েছে।—আমি বিদ্রোহী!

এটুকুই সারাপথ ভাবতে ভাবতে আসছিল সরমা। খুশির ছোঁয়া লাগে। ধমকের স্বরে বলল, বিদ্রোহী কি এখন বেরুবেন না এই ভর-সন্ধ্যেয় চাদর গায়ে বিছানায় বসে থাকবেন?

অবিনাশ ততোধিক গম্ভীর। জবাব দিল, বিদ্রোহী মন জীবনের সাতস্তরে টপাটপ্ লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। কিন্তু নশ্বর দেহ সম্প্রতি নচ্ছার ডাক্তারী বিধি-নিষেধের নাগপাশে আবদ্ধ। নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু—।

ঠাট্টায় কান না দিয়ে সরমা চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করল, হয়েচে কি?

মেণ্টাল্ থ্রম্বসিস্। হেসে উঠল অবিনাশ, ছাই হয়েছে। এই মাত্র সাত-রাজ্য ঘুরে এলায়, একসঙ্গে বেশি চলাফেরা বারণ···একটু বাদে বেরুব'খন। যাবে কোথায়?

সরমা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। না আর বেরিয়ে কাজ নেই, বেশি চলাফেরা বারণ কেন—ওই হার্টেরই ট্রাবল্ তো?

যেতে দাও। স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ একেবারে বাতিল করে দিতে চায় অবিনাশ, সতের বছর বাদে এসে উনি এখন স্বাস্থ্য-চর্চা শুরু করলেন, আমি এদিকে হাঁস-ফাঁস করছি মান-ভঞ্জনের পালাটা শুনব বলে।

সরমা নীরবে অপেক্ষা করল একটু। পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, শুনলে কার কাছে?

ভবিষ্যৎ রিসার্চের ভরাডুবি ভেবে দুশ্চিন্তায় যিনি সর্ষেফুল দেখছিলেন চোখে—অর্থাৎ, চন্দ্র সাহেব। আজ ল্যাবরেটারি থেকে আসছ?

হ্যাঁ।

কাজ করলে? অবিনাশ হাসছে মিটিমিটি।

করলাম।

গুড্। মাস্টারমশাইকে তখনি বলেছিলাম, নির্ভাবনায় অপেক্ষা করুন. না ভদ্রলোক ভেবেই অস্থির!

তোমার ভাবনা হয়নি? সরমা তেতে উঠছে ভিতরে ভিতরে।

পাগল! বরং এতদিনে বুদ্ধির তারিফ করেছি তোমার। অনুরাগ-চর্চার একঘেয়েমি কাটাতে মাঝে মাঝে এই রাগ-বিরাগের দাম বোধ হয় নিজেই বুঝছ এখন। এর অভাবে কেমিস্ট্রি পর্যন্ত নীরস লাগে। লাগবেই।—'শুধু নির্মাণ নেশায় যদি মাত, সৃষ্টি হবে গুরুভার, তার মাঝে লীলা রবে না তো'—আহা, হাইক্লাস্!

প্রতি কথায় তার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসটুকু লক্ষ্য করছে সরমা। গম্ভীর মুখে বলল, ফাজলামো করতে হবে না।—ওদিকে নিজের ব্যবসা নিয়ে ডুবছেন হয়ত, আর যত ঝাল বাড়ির ওপর। তোমার কাছে লজ্জা করে লাভ নেই, দু'বছর ধরে এই চলছে। আর সহ্য হবে না, একটা পরামর্শ দাও।

অবিনাশ বিস্ফারিত প্রথম। বুঝতেও সময় লাগে যেন। পরে সোল্লাসে বলে উঠল, বা বা বা বা! পরামর্শের কি আছে, দলিলপত্রে বিয়ে, ছিঁড়ে ফেলতে কতক্ষণ লাগে!

সরমা নির্বাক খানিকক্ষণ। ঠাট্টা করচ?

কি মুশকিল! বিব্রত ভাব দেখাবার মধ্যেও বিদ্রূপটুকুই স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরো।—বাংলা দেশের রক্ষণশীলতারও গোড়া নড়েছে, এ তো কেতাদুরস্ত বোম্বাই শহর, পরামর্শটা খারাপ হল?

সরমা আবারও নীরব ক্ষণকাল। সান্ত্বনা পেতে আসা যার কাছে, উল্টে তারই মুখে এ শ্লেষ বৃশ্চিক দংশনের মত লাগে। এখানে আসা এবং এসে ভালো লাগার অনুভূতিটুকু নির্মমভাবে মুছে যেতে লাগল যেন। দেখছে ওকে। ক্ষোভ আর অপমানের ছায়া ঘন হয়ে আসছে মুখে। বলল, দুরবস্থার কথাটা শুনে আনন্দ চেপে রাখতে পারছ না আর, কেমন?

ওই মুখ আর ওই ঠাণ্ডা স্বর অবিনাশ চেনে। তবু আপসের চেষ্টা করল না একটুও। মাথা নেড়ে জবাব দিল, তাই তো! কিন্তু সরমা যা বলেছে, তার পক্ষেও বরদাস্ত করা সহজ নয় খুব। ভিতরে গিয়ে বিঁধছে। ধাক্কা খেয়েছে। তার চোখে চোখ রেখে সরাসরি বলল আবার, তা কি পরামর্শ চাইছ তুমি? আমি যদি বলি, বিপিন চৌধুরীর এই দুঃসময়ে সারাক্ষণ তোমার এই ল্যাবরেটারির গবেষণায় তার খুব উৎসাহ পাবার কথা নয়, বরং অনেক জোর পায় বল পায় শুধু তুমি কাছে বসে থাকলে, খুশি হবে?

এবার নিজেকে সামলে নিল সরমা। খুব শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল,

যেন পরামর্শই করছে কিছু, সব ছেড়েছুড়ে বসে থাকি তাহলে, কি বলো ?

ছাড়তে গেলেই ছাড়া যায় না এ তো চেষ্টা করে দেখলে। অবিনাশ নির্লিপ্ত।—তোমাদের কাজে আমার কোন অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু তা বলে বিপিন বাবুকেই বা অমানুষ ভাবব কেন ?

না বিল্ব-পত্র দিয়ে পুজো করোগে যাও। সরমার সব সহিষ্ণুতা ভেঙে পড়ল যেন। তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, আর যদি শোনো ছোট ভাইকে দিয়ে দিনের পর দিন তিনি গোয়েন্দাগিরি করিয়ে বেড়াচ্ছেন, কবে কখন তোমার কাছে আসি না আসি খবর নিতে, শ্রদ্ধার মাত্রাটা তোমার উথলে উঠবে বোধ করি ?

নিস্পন্দের মত বসে থাকে অবিনাশ। হার্টের গোলযোগবশতই হয়ত বাতাসের অভাববোধটা বেশি লাগছে। গায়ের চাদর সরিয়ে রাখল।

সরমা ঝাঁজিয়ে উঠল আবার, জবাব দিলে না ?

তবু সময় লাগে একটু।—আমার জবাব শুনলে তোমার রাগ আরো বাড়বে সরমা। তোমার ভেতরের সন্ধান তেমন করে পেতে দাওনি বলেই হয়ত আজ তোমার বাইরের সন্ধানটা এমন করে হাতড়ে বেড়াচ্ছে ভদ্রলোক।

স্থির নেত্রে সরমা তাকে দেখছে চেয়ে চেয়ে। অব্যক্ত রোষে পলক পড়ে না চোখে। দু'বছর আগে অপর্ণা চন্দ্রর প্রতি সহানুভূতি আর আজ বিপিন চৌধুরীর জন্য এই দরদ দুইয়েরই একটি মাত্র নিগূঢ় হেতু যেন সুস্পষ্ট দেখতে পেল। রাগের মাথায় বহুদিন যে ইঙ্গিতটা করে ফেলে অবিনাশকে আঘাত দিয়েছে এবং পরে অনুতপ্ত হয়েছে নিজে—আজ তারই শেষ প্রহসন। কঠিন হাসির আভায় মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আরো। অস্ফুট স্বরে বলল, মনে মনে এত জ্বালা তোমার! আজ যদি আমার সব সাধ একসঙ্গে ডোবে তুমিই বোধ করি আনন্দে হাততালি দেবে সকলের আগে, না ?

থামল একটু। অপেক্ষা করল। দেখল।—তোমার ওই রোগেভোগা মন নিয়ে মিছেই তুমি আমার শেষ দেখার আশায় বসে আছ অবিনাশ। আজ বলে যাই, বেঁচে থাকলে দেখবে, একজন ছেড়ে দশজন বিপিন চৌধুরীরও সাধ্য নেই সরমাকে নিঃশেষ করে তোমাকে আনন্দ দিতে পারে।

অবিনাশের মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে একটু একটু করে। সমস্ত হৃৎপিণ্ড কে যেন মুচড়ে নিঙড়ে একাকার করে দিল। একটা নিবিড় ব্যথা গোপন

করার তাড়নায় কপাল ঘেমে উঠেছে। সময় লাগল সামলে নিতে। খুব আস্তে আস্তে বলল, আমার রোগেভোগা মন কখনো আশা যদি করেও থাকে কিছু, কোনদিন যে একে প্রশ্রয় দিইনি নিজেই তো জানো সরমা।...তোমার মত একজন এমন করে বড় একটা আসে না কারো জীবনে। তাই নিজের অদৃষ্টের কথা ভেবে নিঃশ্বাস হয়ত দুই একটা পড়েছে কখনো। কিন্তু এ নিয়ে কোনদিন তোমার ওপর এতটুকু নালিশ নেই আমার, আমার চিন্তা দিনরাত তোমার মঙ্গলই চেয়েছে।

কিছুক্ষণ।

অনেকক্ষণ।

মণ্টু গাড়ি নিয়ে এসে দেখে সরমা বসে আছে মূর্তির মত আর অবিনাশ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে।

কি ব্যাপার অবিনাশদা, এমন চুপচাপ যে! শরীর ভালো তো?

অবিনাশ কাছে এলো, হ্যাঁ ভালো।

মণ্টু বসার উদ্যোগ করতে সরমা উঠে দাঁড়াল, আর বসতে হবে না, এসো, কাজ আছে বাড়িতে।

কোনদিকে না তাকিয়ে সরমা গাড়িতে গিয়ে উঠল। মণ্টু বিলক্ষণ ঘাবড়ে গেছে মনে মনে। অবিনাশের দিকে চেয়েও স্বস্তিজনক ঠেকল না পরিস্থিতি।

গাড়ি চলে গেল।

অবিনাশ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। কতক্ষণ ঠিক নেই একসময় বিছানাটা কম্বলসুদ্ধ গুটিয়ে নিল বেশ করে। সুটকেসে জামা কাপড় বই ইত্যাদি ভরে নিল। ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে বিছানা বাক্স সমেত দাদরের ট্রেনে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে এসে নামল। দূরের ট্রেন ধরবে।

শান্ত, নিরুদ্বেগ। সরমা সুখী হোক। শান্তি পাক বিপিন চৌধুরী। বিগত দিনের স্মৃতি নিয়ে আগাছার মত আর ওদের সামনে পড়ে থাকা নয়। সে লজ্জা আর গ্লানির অবসান একেবারেই হয়ে যাক আজ।

পর পর দু'দিন ঘর তালাবন্ধ দেখে মণ্টু ফিরে গেছে। সেদিন খটকা লাগল কেমন। সার্শি টেনে ঘরের ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করল সে। পরিত্যক্ত দশা।

সরমা শুনে বিমূঢ় চোখে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। পরে সামলে নিয়ে বলে.

হয়ত চেঞ্জে-টেঞ্জে গেছে কোথাও। ওর কৌতূহল এড়াবার জন্যেই একটা বই খুলে বসল।

পরদিন সকালে সরমা নিজেই কথাটা তুলল আবার।—আচ্ছা মণ্টু, সেদিন অবিনাশের শরীর খারাপ দেখে এসেছিলাম···তার বাড়ির কাছেই হাসপাতাল, একবার খবর নেবে ?

নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও সরমার উদ্বেগটুকু গোপন থাকে না মণ্টুর কাছে। বলল, শরীর ভালো নয় আমিও জানি, কিন্তু বাক্স-বিছানা বই-পত্র নিয়ে কে আর হাসপাতালে যায়।

তাও তো বটে, চেঞ্জেই গেছে বোধ হয়···।

কঠিন একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চায় সরমা। গেছে যাক্। আর বার বার ক্ষমা চাওয়া নয় আর। কিন্তু নিজেকে ক্ষমা করতে না পারার যাতনা আরো বেশি। যথার্থই মানুষটাকে তাড়াতে সমর্থ হয়েছে এতদিনে।···একদিন সে বলেছিল, কারো করুণার বোঝা হয়ে থাকবে না কোনদিন। থাকলও না। সেদিন ভয় পেয়েছিল সরমা। আজ ? সাফল্যের গরিমা সকল ভয়কে ছাপিয়ে উঠেছে বইকি। অবসন্ন স্তব্ধতায় দিন কাটে। ল্যাবরেটারিতেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কাজ ভুল করে সমাদ্দারের কাছে বকুনি খায়।

চন্দ্র সেদিন একটা চিঠি হাতে কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, অবিনাশ বাইরে গেছে জানতুম না তো!

সরমা উদগ্রীব নেত্রে অপেক্ষা করে। চন্দ্র আবার বললেন, কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে, পাছে আমরা ওর জন্যে ভাবি তাই লিখেছে।

সরমা মৃদু-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছে—

ভালই তো লিখেছে, পড়ে দেখ না—ঠিকানাটা নোট করে আমাকে ফেরত দিও।

চিঠি রেখে চলে এলেন চন্দ্র। নিশ্চিত বুঝলেন, অবিনাশ এখানে নেই সরমা জানে। এবং তার হেতুও। হঠাৎ এই স্থান পরিবর্তনের উদ্দেশ্য আর যাই হোক স্বাস্থ্যোদ্ধার যে নয় জায়গার নামেই তার প্রমাণ। কবে পর্যন্ত ফিরবে কোনো উল্লেখ নেই।

সরমা চিঠি পড়ল। ওর এই উধাও হয়ে যাওয়াটা কারো ভাবনার কারণ হয় এ ও চায় না। যা হোক একটা হদিস পেয়ে সরমার দুশ্চিন্তা গেল।

রাগ বাড়ল। একটা মুখের কথাই যদি এত বড়, থাক যেখানে গিয়ে খুশি। চিঠি সে লিখবে না। বিজ্ঞাপন আঁকা বন্ধ রেখে ক'টা দিন আর বাইরে থাকা চলবে?

কাজের উৎসাহ ফিরে আসে আবার। তবু অবিনাশের একটা ইঙ্গিত বাড়িতে সকল সময় সচেতন রাখে তাকে। বিপিন চৌধুরীর তিক্ত গাম্ভীর্য হাসি মুখেই বরদাস্ত করে আসছে তারপর থেকে। পাঁচটা কথার একটা জবাব না পেলেও কাছে আসে এবং চেষ্টাও করে তাকে কাছে টানতে।

ছ'মাস গেল। অবিনাশের ফিরে আসার কোনো লক্ষণ নেই। চন্দ্র দু'তিনটে চিঠি লিখেও জবাব পান নি। সরমা ভাবছে, আর চুপ করে থাকা উচিত কি না। অবকাশ কম, ল্যাবরেটারির সুনামের সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপ বেড়েছে।

অকল্পিত একটা দুর্যোগে সকল ভাবনা চিন্তা একেবারে স্থগিত থাকল বেশ কিছুকাল।

দেহের নিম্ন অংশ প্যারালিসিস্ হয়ে সমাদ্দার শয্যা নিলেন। আর উঠবেন না এও সুনিশ্চিত। কিছুকাল কাটল দুশ্চিন্তায় এবং বিশৃঙ্খলায়। ল্যাবরেটারির সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরীরও সকল দায়িত্ব পড়ল চন্দ্রর ওপর। নিচেই কোণের একটা ঘরে সমাদ্দার নিজের ব্যবস্থা করে নিলেন। এ আবহাওয়া ছেড়ে নিরালায় থাকতে রাজী নন্। সেখান থেকে ডাকাডাকি চিৎকার চেঁচামেচির বিরাম নেই। কেউ সংবাদ নিতে এলে ঝাঁজিয়ে ওঠেন, গো টু ইওর ওয়ার্ক, ডোণ্ট্ ওয়েস্ট টাইম্ প্লীজ!

দৈনন্দিন কাজ সেরে রাত্রিতে চন্দ্রর সঙ্গে সরমাও তাঁর কাছে গিয়ে বসে খানিকক্ষণ। তিনি খুশি হন।—দেখ গিন্নি, আশী বছর বাঁচলুম আবার কি! যতদিন পেরেছি থামিনি—নিজেদের বেলায় এ যেন মনে থাকে তোমাদের।

কিন্তু এদিকে বিপিন চৌধুরী তার শেষ প্রহরের ঘণ্টা শুনেছে।

গলা পর্যন্ত বাজারের দেনা। যে কোন একটা শেয়ারের দাম চড়লে আরো কিছুকাল টিকে থাকতে পারে। কিন্তু তা যেন আর হবার নয়। একটানা পড়তি দশা শেয়ার বাজারের। ঘনশ্যামবাবু পৃথক হয়ে অনেকটা সামলে নিয়েছেন। তবু স্বার্থের যোগ এখনো আছে কিছু। তাঁর পরামর্শে কতগুলি দরকারী কাগজপত্র বিপিন সেদিন বাড়িতে সরিয়ে আনল। দলবল সমেত গোপনীয় আপিসটা এবার থেকে বাড়িতেই বসবে। সেদিনের মত কাগজপত্র সব চারুদেবীকে দিল রাখতে।

সরমা বাড়ি ছিল না। সে বাড়ি ফিরতে চারুদেবী সেগুলো আবার তার হেপাজতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

পরদিন যথাসময়ে ঘনশ্যামবাবুর সমাগম। সঙ্গে দিনকে রাত করতে পারেন এমন একজন ব্যবহারজীবী পরামর্শদাতা। ব্যস্ত হয়ে বিপিন সেই কাগজপত্র সব চাইতেই প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন চারুদেবী।—সে সব তো আমি বৌমা আসতেই তার হাতে দিয়ে দিয়েছি সাবধান করে রাখার জন্য।

বিপিন তেতে উঠল। কিন্তু বাক্যব্যয়ের সময় নেই আপাতত। নিজের ঘরে এলো। সরমা তার কাজে বেরিয়ে গেছে। চাবি বিছানার নিচে থাকে তাই রক্ষা। হয় দেরাজে নয়তো ট্রাঙ্কে রেখেছে। দেরাজেই পেল। কাগজপত্র সব বার করে নিয়ে বিপিন নিচে নেমে গেল।

মোটামুটি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে মূল্যবান তথ্যগুলি একে একে উক্ত পরামর্শ-দাতার দিকে এগিয়ে দিতে লাগল।

সকলের শেষে একটা খাম।

উল্টে পাল্টে দেখল বিপিন, কিছু লেখা নেই। ভাবল, আপিসের কাগজ-পত্রের সঙ্গে এসে গেছে। তবু দরকারী কি না দেখার জন্য ভেতরের লেখা কাগজটা বার করল।

সহসা প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে তাড়াতাড়ি ওটা হাতের মুঠোয় আড়াল করে ফেলল সে। ঘর টেবিল চেয়ার সব কিছু দুলছে চোখের সামনে।

'অবিনাশ, তুমি জান তোমাকে কত ভালবাসি আমি, অথচ মুখ ফুটে

কিছুই তুমি বললে না আজও। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না বাঁচব না বাঁচবই না—এই শেষ কথা বলে দিলাম। নরক-কুণ্ডে পড়ে আছি, এখান থেকে তাড়াতাড়ি আমাকে উদ্ধার করবে তো করো, নইলে চিরদিন দুঃখ করতে হবে।—সরমা।

মণিময়কে রাগাবার উদ্দেশ্যে সরমার লেখা নকল-করা অবিনাশের সেই চিঠি।

সরমা যত্ন করে রেখে দিয়েছিল, কতটা পারে অবিনাশ, তার নমুনা। সেদিনের ক্ষুদ্র পরিহাসটুকু নিয়ে নির্মম পরিহাসের জাল ফেলে বসে আছে অদৃষ্ট। মণিময়ের ক্রোধের শতগুণ ফলাফল নিয়ে ওটা আজ বিপিন চৌধুরীর চিন্তাধারার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবেই।

বিস্ময়-বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে আছেন অপর দু'জন ভদ্রলোক।

বিপিন বলল, আজ আর কিছু হবে না, আপনারা যান।

কিন্তু ব্যাপার কি? ঘনশ্যামবাবু প্রশ্ন করেন তবু।

কিছু না। কাগজপত্র ফেলে রেখেই চিঠি নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিসের একটা ঝন্‌ঝনানি অবিরাম বাজছে কানে। শেষ কিছুর ইঙ্গিত যেন। চিঠি বুকপকেটে। পড়ে পড়ে কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। ভাবছে, কিছু একটা করা চাই—কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

বেশি রাত্রিতে বাড়ি ফিরল। সকালের কাগজপত্র তেমনি ছড়ানো পড়ে আছে টেবিলে। স্ফীতকায় দেনার অঙ্কটা ভাসছে চোখের সামনে। সুমসৃণ রজ্জু-খণ্ডের মত অমোঘ ক্রূরতায় ওটা এগিয়ে আসছে কণ্ঠ বেষ্টন করতে।

পরদিন সকালে বেরুল আবার। আজও ঘর তালাবন্ধ অবিনাশের। কালও এসে ফিরে গেছে বিপিন। বাড়ি ফিরে কি ভেবে সরমার সামনে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, কাজে বেরুচ্ছ?

হ্যাঁ, বলবে কিছু?

না, কি আর বলব···।

ইদানীং ব্যবসায়ের দুশ্চিন্তায় দিবারাত্র তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখছে সরমা। নতুন কিছু চোখে ঠেকল না। তবু বলল, দিনরাত খেটে খেটে হয়রান হয়ে গেলে, দু'দিন বিশ্রাম নাও না।

বিপিন হাসল। চমৎকার অভিনয়ের মত লাগছে।

নেব।

আমি যাই ?

এক মিনিট। বেশ সাদাসিধে মুখে বলল বিপিন, অবিনাশবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, ঘর তালাবন্ধ দেখলাম। তিনি নেই এখানে ?

সরমা অত্যন্ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। মনের ভিতরটা খলখলিয়ে হেসে ওঠে বিপিনের।

সে একবছর ধরেই নেই এখানে।...কেন বলো তো ?

কাজ ছিল। ঠিকানা জান না তুমি ?

জানি। চাই তোমার ?

এখন থাক। বিপিন বিছানায় শুয়ে পড়ল ওপাশ ফিরে। তবু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সরমা। এক বছর বাদে এ কিসের সূত্রপাত আবার বুঝছে না। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে বেরিয়ে গেল।

কি ভেবে বিপিন উঠে বসল। লেটার-প্যাড আর কলম টেনে নিল। বুক-পকেট থেকে চিঠি বার করে বয়ানগুলো তুলল যথাযথ। নিচে সংক্ষিপ্ত পত্র লিখল চন্দ্রর নামে —আসল চিঠিখানা এখানে এসে দেখে যেতে পারো। ভাবছি, সরমা কেন সোজাসুজি এ নরক-কুণ্ড থেকে বিদায় চাইল না ? সে শুধু প্রিয় ছাত্রীই নয়, আদর্শ ছাত্রী বলে গর্বও আছে তোমার। তাই আদর্শের একটা নমুনা পাঠিয়ে বিলক্ষণ আনন্দ পাচ্ছি।—বিপিন চৌধুরী।

ল্যাবরেটারি। চন্দ্র সারাক্ষণ তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন সরমার ওপর। কিন্তু এতটুকু ব্যতিক্রম চোখে পড়ল না। একাগ্র আনন্দে হরিআনন্দ এবং ভুটার সঙ্গে রাসায়নিক তথ্যে ডুবে আছে।

পরদিনও তাই।

চন্দ্র বিভ্রান্ত। অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও অবিনাশেরই শরণাপন্ন হলেন শেষ পর্যন্ত। লিখলেন, শিগগীরই আসা চাই, অত্যন্ত জরুরী।

সন্ধ্যার পর সরমা বাড়ি ফিরে দেখে বিপিন শুয়ে আছে।

সকাল থেকেই হাবভাব অন্যরকম দেখছে। জিজ্ঞাসা করল, শরীর খারাপ নাকি ?

না। বিপিন নির্লিপ্ত।

এ সময় শুয়ে যে ?

এমনি।

তবু ভালো···মাস্টারমশাইও হঠাৎ আজই আবার জিজ্ঞাসা করছিলেন তুমি কেমন আছ না আছ—

বাইরে যত নিস্পৃহ দেখাক, ভিতরে ভিতরে বিস্ময়ের অবধি নেই বিপিন চৌধুরীর। মনে মনে প্রশংসা না করে পারছে না, অন্তর্দ্বন্দ্বের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাচ্ছে না সরমার মুখে।"

০

প্রায় এক ঘণ্টা আগে অপর্ণা দোতলা থেকে অবিনাশকে তাদের বাড়ির গেটে ঢুকতে দেখেছে। এতক্ষণে নিচে নেমে বসবার ঘর প্রায় অতিক্রম করেও ফিরে দাঁড়াল। চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কাজে যাবে না আজ?

হ্যাঁ, এইবার উঠব।

অবিনাশের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অপর্ণা কাছে না এসে পারল না। অবিনাশ নমস্কার জানালো দু'হাত তুলে।

অপর্ণা আবার স্বল্পক্ষণ নিরীক্ষণ করল তাকে।—আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন, অসুখ নাকি?

না, ভালোই আছি।

চন্দ্র অনুযোগ করলেন, আমার কথা বিশ্বাস হল না, এখন দেখো—।

অবিনাশ বলল, সারা রাত ট্রেনের ধকলেই এমন দেখাচ্ছে বোধ হয়।

কোথায় গিয়েছিলেন? প্রশ্ন অপর্ণার।

অবিনাশ হাসল অল্প একটু। চন্দ্র বললেন, ও তো এই এক বছর ধরেই বাইরে কাটালো, আজই সকালে এসেছে।

অপর্ণা একটু অপেক্ষা করে চলে গেল। খবরটা জানা ছিল না।

অবিনাশও উঠে দাঁড়াল।—চলি, আজ কালের মধ্যেই বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করব।

ল্যাবরেটারিতে চন্দ্র সরমাকে অবিনাশের আসার খবরটা জানালেন। শোনামাত্র ওর প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্যটুকু দৃষ্টি এড়ালো না। হাতের টেস্ট-টিউবে চোখ রেখে নিস্পৃহ কুশল প্রশ্ন করল।—ভালো আছে?

চন্দ্র বললেন, ভালো নেই বলেই তোমাকে দুই একটা কথা বলা দরকার। ওটা রাখো হাত থেকে···

টেস্ট-টিউব তাড়াতাড়ি ফাইলে রেখে সরমা পাংশু মুখে ঘুরে দাঁড়াল।

চন্দ্র সামলে নিলেন, না ভয়ের কিছু নয়—তবু যতদূর মনে হল এই একটা বছর অনিয়ম করেছে খুব।

মুহূর্তের জন্য সরমা ভুলে গেল সে ল্যাবরেটারিতে দাঁড়িয়ে, এবং সামনের মানুষটি তার ভূতপূর্ব শিক্ষক। তিক্ত শ্লেষে বলে উঠল, এখনই বা আসতে গেল কেন, আর চলছিল না ?

অপ্রস্তুত পরক্ষণে।

চন্দ্রর মুখে হাসির আভাস। একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, একটা জরুরী দরকারে আমিই তাকে বিশেষ করে আসতে লিখেছিলাম।

সরমার জিজ্ঞাসু চোখে চোখ রেখে থামলেন একটু।—তা দেখো, ওকে সামলাবার মত তিনকূলে নেই কেউ এ আর তোমার থেকে ভালো কে জানে··· আবারো যাতে শরীরটা না মাটি করে বসে সেদিকে একটু নজর রাখতে বলি।

অবিনাশ বলেছিল, সরমার ভিতরের সন্ধান পায়নি বলেই নাকি বাইরের সন্ধানটা এমন করে হাতড়ে বেড়াচ্ছে বিপিন চৌধুরী। আজও ভোলেনি সরমা। শান্ত মুখে বলল, আমি আর কি করতে পারি।

জবাবটা অপ্রত্যাশিত। চন্দ্র হাসলেন একটু।—না যদি পারো তাহলে আর কথা কি। যাকগে, আজ-কালের মধ্যেই ও তোমাদের বাড়ি যাবে বলছিল, বিপিনের সঙ্গে কি কথা আছে। আচ্ছা, কাজ করো তুমি।

বাকি সারাক্ষণ ওর অন্যমনস্কতায় ভুটা এমন কি হরিআনন্দও বিস্মিত।

বাড়িতে রাত দশটা পর্যন্ত নিষ্ফল আগ্রহে অপেক্ষা করে কাটল সরমার। অস্বস্তি দ্বিগুণতর। অবিনাশকে চন্দ্র ডেকে আনিয়েছেন জরুরী দরকারে। অথচ কি দরকার বললেন না। অন্যদিকে, একটা দিনের জন্যেও যে মানুষ তাদের বাড়িতে পদার্পণ করল না, আজ এক বছর বাদে সকলকে ছেড়ে সঙ্গেই তার নাকি কথা আছে এবং সেজন্যেই তার এ বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। বিপিনের গোলমেলে লাগছে সব কিছু। সম্প্রতি বিপিনের দিক থেকেও এমন কিছু পরিবর্তনের আঁচ পাচ্ছে সরমা, যার সবটাই ব্যবসায়গত দুর্বিপাকের কারণ বলে মনে হয় না।

অবিনাশ সেদিন এলো না।

পরদিনও সকাল ন'টা বেজে যায়, তার দেখা নেই। বিপিন তখন পর্যন্ত বাড়িতেই ছিল। সরমা ইচ্ছে করেই কিছু বলেনি তাকে। এলে দেখা তো হবেই।

গঙ্গাবাঈ সংবাদ দিল, ফোনে কে ডাকছে দাদাবাবুকে। বিপিন নিচে নেমে গেল। একটু বাদেই ফিরে এসে তাড়াতাড়ি জামা টেনে নিল একটা। সরমা জিজ্ঞাসা করল, বেরুচ্ছ নাকি?

উত্তরে অস্ফুট একটা স্বর নির্গত হল শুধু। উদভ্রান্ত ব্যস্ততায় আবার নেমে গেল সে। সরমা ছাতের কার্নিশের কাছে এসে দেখে, বাড়ির দরজা থেকেই রীতিমত জোরে স্টার্ট পড়ল গাড়িতে।

সরমা আর অপেক্ষা করবে কি না ভাবছে। কিন্তু একটু বাদেই অদূরে অবিনাশের রোগা লম্বা মূর্তি চোখে পড়া মাত্র এক রকম দৌড়েই নিচে নেমে এলো সে।

চন্দ্রর আশঙ্কা মিথ্যে নয়। পাঁচ সাত বছর বয়েস বেড়ে গেছে যেন অবিনাশের। দু'চার মুহূর্তের নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়।

সরমা বলল, বোসো।

দেখছ কি, চিনতে পারছ না?

সরমা নিরুত্তরে তার কাছেই আর একটা চেয়ার টেনে নিল।

অবিনাশ মৃদু হেসে কুশল প্রশ্ন করল, কেমন আছ?

ভালো।

বিপিনবাবু?

ভালো।

বেশ, গ্রেট মণ্টু কোথায়, তাকে ডাকো—

বেরিয়েচে।

গুড্।...আমি একটু আগেই আসব ভেবেছিলাম, হয়ে উঠল না। তোমার ল্যাবরেটারির সময় উতরে যাচ্ছে না তো?

গেলেও পার্সেণ্টেজ কাটা যাবে না, বোসো তুমি। সরমা উঠে দাঁড়াল।

শোনো, অবিনাশ বাধা দিল, চা ছাড়তে হয়েছে, আর অসময়ে খাবার তাগিদ থেকে একমাত্র তোমার কাছেই রেহাই পেয়েছি, ওসবের চেষ্টায় যাচ্ছ না তো?

সরমা শান্ত চোখ মেলে অপেক্ষা করল ক্ষণকাল। কোন কথা না বলে আবার বসে পড়ল।

মৃদু হাসিটুকু ঠোঁটের ফাঁকে লেগে আছে অবিনাশের। ঘরের আসবাবপত্র এবং দেয়ালের সাজ-সজ্জা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। পরে বলল, বিপিনবাবুর সঙ্গে

আজ আর দেখা হল না তা হলে—খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন দেখলাম। কখন ফিরবেন বলতে পারো ?

না। তাঁকে দরকার কেন ?

চন্দ্রর অনুমান সত্যি বলেই মনে হল অবিনাশের। চিঠির প্রহসন সরমা এখনো জানে না। বিপিনের গোপনতা বিস্ময়ের কারণ। মনোভাবও স্পষ্ট নয়। তবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অবিনাশ, সরমার কাছে এ প্রসঙ্গ তুলে গ্লানি বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন।

জবাব দিল, দরকার আবার কি, বাড়ি এসেও মালিকের খবর নেব না ?

সরমা অনুসন্ধিৎসু।—ডাক্তার চন্দ্র বলছিলেন তোমার কি কথা আছে তাঁর সঙ্গে ?

অবিনাশ মনে মনে মুণ্ডুপাত করল ওই ভদ্রলোকটির। পরে বলল, ছাপোসা মানুষ, এক বছর ধরে বাজারের সঙ্গে সংস্রব নেই, চেনা লোক হিসেবে কাজ-কর্মের দাবি নিয়েও তো আসতে পারি !

সরমা বিশ্বাস করল না। আঘাত পেল। একদিন ওর আপদ-বিপদে সেই বড় সহায় ছিল নিঃসন্দেহ। কিন্তু আজ তার হাজারগুণ অসহায় হয়ে পড়লেও বিপিন চৌধুরী তো দূরের কথা, তাকেও যে জানতে পর্যন্ত দেবে না মানুষটা এ এখন সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে।

অবিনাশই হালকা হেসে বলল আবার, এতদিন বাদে দেখা, কেমন আছি না আছি খবর নিলে না তো ?

দেখতেই তো পাচ্ছি।

বেশ। উঠি তা হলে ?

বোসো।

ইচ্ছে আছে। কিন্তু তোমার ওই দু'শব্দ আর তিন শব্দের কথায় অস্বস্তি লাগছে। স্কুলের হেড-মিস্ট্রেসের সামনে বসে আছি যেন।

সামান্য একটু হাসি দেখা দেয় সরমার মুখে।—কথা বলছি এই ঢের; না যদি বলি ?

কেঁদে টেঁদে ফেলব হয়ত। অবিনাশ চেষ্টা করে আগের মতই সহজ হতে।

সরমা সোজাসুজি চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। পরে চট্ করে উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দোতলার দিকটা নিরীক্ষণ করে এলো। চেয়ারটা অবিনাশের আরো কাছে টেনে নিয়ে বসল আবার।

অবিনাশ অবাক। কি ব্যাপার ?

কিছু না। একটা কথার জবাব দাও, কার ওপর এ অভিমান নিয়ে এমন করে কাটালে এক বছর, আমি তো নিজের স্বার্থ না দেখে এক পা চলিনে কখনো ?

মনে মনে শঙ্কিত হলেও ছদ্ম-বিস্ময়ে বিস্ফারিত দেখায় অবিনাশকে।—মাটি করেছে। ভালো লাগছিল না, চলে গেলাম, আবার ইচ্ছে হল ফিরে এসেছি, ব্যস্।

ইচ্ছে করে তুমি আসনি, তোমাকে ডেকে আনা হয়েছে।

অবিনাশ হাসল। এই তো তোমার বুদ্ধি, ইচ্ছে না থাকলে ডেকে কাউকে আনা যায়! পরে যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বলল, দেখ সরমা, এবারে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি ওসব গুরু-গম্ভীর আলোচনা আর কোন দিন নয়—ও আমার ধাতে পোষায় না, পারিও না তাল রাখতে।

সবেগে মাথা নেড়ে সরমা রুদ্ধ-কণ্ঠে বাধা দিয়ে ওঠে, ওসব কথা আমি শুনিনে, সব পারো তুমি। টেবিলে তার একটা হাতের ওপর নিজের কনুই পর্যন্ত প্রায় জোর করেই চেপে রাখল সে।—তোমার তুলনায় কত তুচ্ছ আমি জানো না, আমার গা ছুঁয়ে বলো, আর কোনদিন কোন কারণে নিজের অযত্ন করবে না।

অবিনাশ বিব্রত। ছি, সরমা—কেউ এসে পড়বে!

আসুক, তুমি বলো।

সহসা দুকূল ছাপিয়ে জল ভরে আসতে চায় অবিনাশের দুই চোখে। এ আনন্দের কি বেদনার জানে না। সামলে নিল।—কথা দিচ্ছি। ঠিক হয়ে বোসো।

সরমা শাড়ির আঁচলে ভালো করে চোখ মুছে নিয়ে শান্ত হল।

একান্ত নীরবতায় অনাস্বাদিত অনুভূতির মত কি যেন ঘুরে ফিরে বার বার আনাগোনা করছে অবিনাশের মনে। সকল ব্যর্থতা, সকল নিষ্ফলতার এ অমূল্য সঞ্চয় চিরদিন সে স্মরণ রাখবে। নিজের মনেই বলল বারবার, তুচ্ছ চাওয়া-পাওয়ার শেষ অভিমানটুকু পর্যন্ত আজ এতবড় প্রাপ্তির গভীরে যেন নিঃশেষে মিলিয়ে যায়। এই দেহটা সুস্থ রাখতে আসমুদ্র-হিমাচল ঘুরে আসতেও পিছ-পা হবে না। উঠল। জিজ্ঞাসা করল, কাল দুপুরে বিপিনবাবুর আপিসে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে ?

সরমা নীরবে ঘাড় নাড়ল শুধু।

সরমার কথা নেওয়া এবং অবিনাশের কথা দেওয়ার আর একদিকে সুসম্পন্ন কাল-পুরুষের চক্রান্ত।

শেয়ার মার্কেট।

বেদনা-বিবর্ণ মুখে বসে আছে বিপিন চৌধুরী। অদূরে ঘনশ্যামবাবু। বিরস বদন তাঁরও। রুক্ষ-কণ্ঠে বলে উঠলেন, কতদিন আপনাকে সাবধান করেছি, এখন সব ডুবল তো!

স্টপ্! উগ্র-কণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে ওঠে বিপিন চৌধুরী। অসম্বৃত পদক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় ঘর থেকে।

বাড়ি।

সিঁড়িতে চারুদেবীর সঙ্গে দেখা।—এত বেলা পর্যন্ত না খেয়েদেয়ে…ওকি! অসুখ করেছে নাকি?

সব ঠিক আছে।

পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে এসে বিপিন মাথায় হাত দিয়ে বসল। মনে হল ঘুমে চোখ বুজে আসছে। শুয়ে পড়ল। না তাও না…।

খাবার তাগিদ দিতে এলেন চারুদেবী। মস্তিষ্কের ক্রিয়া সুস্থ রাখার জন্যই নিঃশব্দে উঠে চান করে খেয়ে এলো। খর মধ্যাহ্নেও চোখের সামনে বার বার ঝাপসা দেখছে সব কিছু।

ব্যবসায়ের সকল পরিণাম আজ ভয়াবহ শূন্যতায় এসে ঠেকেছে।

নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে নেই আর এমন মরীচিকারও সম্বল।

বাইরে আকণ্ঠ ঋণের বোঝা।

ঘরেও দেউলে সম্পূর্ণ।

ভবিষ্যতের এই নিঃসীম যূপ-কাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেবে?

অবজ্ঞার কানাকানি আর ব্যঙ্গমিশ্রিত করুণা।

পাওনাদারের ভ্রূকুটি আর আদালতের কাঠ-গড়া।

সম্মান নেই সম্ভ্রম নেই অর্থ নেই বাড়ি নেই, আজ যা আছে তার নেই কিছুই। বীভৎস কঙ্কালময় পরিণতি।

আর তার স্ত্রীও থাকবে না।

কিন্তু সরমা থাকবে।

…অবিনাশও।

নিঃশ্বাস নিতে লাগছে কেমন। সব বাতাস যেন হাল্‌কা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে। আর একদিন, বড় জোর দু'দিন, যত ভাবনা এরই মধ্যে শেষ করতে হবে। কিন্তু পারছে না কেন!…ঘুম পাচ্ছে আবার। হাসিই পেল, ভারী আশ্চর্য তো!…আচ্ছা পরে ভাববে।

মুক্তির রুদ্ধ আগলটা সহসা ভেঙ্গে গেল খান্ খান্ হয়ে। খোলা উন্মুক্ত পথ। জোরে আরো জোরে! পঁচিশ…ত্রিশ…চল্লিশ…পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটেছে গাড়ি। স্পীডোমিটারে একটা পা আটকে আছে আঠার মত। পাশে সরমা—স্থির, আড়ষ্ট। আড়চোখে একবার দেখে নিল বিপিন। হিংস্র উল্লাসে সমস্ত হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে চলল গতির আগে আগে। স্পীডোমিটারে চাপ পড়ল আবার। আরো, আরো—

গাড়ি থামাও!

মৃত্যুর আতঙ্কে তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে সরমা।

বিপিনের উন্মত্ত অট্টহাসিতে ডুবে যায় কণ্ঠ-স্বর।

গাড়ি থামাবে? কেন? অ্যাক্‌সিডেন্ট হবে? হোক না! ভুটো চূর্ণ-বিচূর্ণ তালগোল-পাকানো দেহ খুঁজে পাবে সকলে।

সে থাকবে না, সরমাও না—শুধু অবিনাশই থাকুক।

আকাশে বাতাসে ঝন-ঝন ঝন-ঝন শব্দে বাজছে মৃত্যুর আমন্ত্রণ।

চমকে উঠে বসল বিপিন। ভরা শীতকালেও ঘামে সমস্ত গা ভিজে গেছে। কাঁপছে থরথর করে। খাট থেকে নেমে ঘরের আলো জ্বালল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ অনেকক্ষণ।

নিজেই এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল। পরে চেয়ার টেনে বসল নিস্পন্দের মত। এখনো গোলমেলে লাগছে সব কিছু।

সরমা ঘরে ঢুকে থমকে গেল একটু। পরে হাতের কাগজপত্র টেবিলে রেখে জিজ্ঞাসা করল, এমন করে বসে যে?

বিপিন নীরবে মুখ তুলে একবার তাকালো শুধু।

সরমা আবার জিজ্ঞাসা করল, কখন ফিরলে?

নিরুত্তর।

সরমা কয়েক নিমেষ দাঁড়িয়ে রইল তেমনি, পরে দরজার দিকে এগোলো।

শোনো—

ফিরে দাঁড়াল।

বিপিন ডেকেছে। কেন ডেকেছে? চলে যাচ্ছিল বলে ডেকেছে। কিন্তু এখন কি বলবে? চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। ভাবল। বলল, মনটা ভালো নয়, দিনকতক বাইরে থেকে ঘুরে আসব ভাবছি। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

সরমা নীরব কিছুক্ষণ। বিগত ক'টা দিনে বিপিনের আচরণে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করেছে সরমা। তার স্তব্ধতার আড়ালে কি এক ক্রূর প্রতীক্ষার আভাস যেন। আজকে এই আহ্বানও এমন নয় যাতে করে ডাকা মাত্র হাতের সব কাজ ফেলেই সঙ্গে আসার কথা ভাবতে পারে। একটু থেমে জবাব দিল, মন ভালো নয় সে তো অনেক দিনই দেখছি। বাইরে যাবে ভালো কথা, কিন্তু আমি যাই কি করে।

তোমার কাজ আছে, না?

হ্যাঁ। একটু অপেক্ষা করে সরমা চলে গেল ঘর থেকে।

ঘড়িতে এগারটা বাজে রাত্রি। সরমা একাগ্রচিত্তে খাতায় নোট্ করছে কি। সমাদ্দার পঙ্গু হয়ে বেশ ভালো রকমে আবদ্ধ করেছেন ওদের। বিপিন ঘরে প্রবেশ করল।

মনোযোগ তিরোহিত। তবু ইচ্ছে করেই সরমা মুখ তুলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে বিপিন তার কাজ দেখল স্বল্পক্ষণ। ঘরের মধ্যেই নিঃশব্দে পায়চারি করল বার দুই। রাসায়নিক দ্রব্য-সম্ভার সাজানো কাঁচের আলমারিটার সামনে দাঁড়াল একবার। অন্যমনস্কের মত খানিক চেয়ে রইল শিশিগুলির দিকে।

অকস্মাৎ কি মনে পড়তে চেতনার সূক্ষ্মতম পরদায় প্রচণ্ড এক ঘা খেয়ে বিপিন চমকে উঠল যেন।

মাটি সরে যাচ্ছে পায়ের নিচে থেকে।

স্বপ্নে শোনা ওই মৃত্যুর ঝন্-ঝনানি যথার্থই কানে বাজছে এবার। এক নিমেষে দেহের সকল তন্ত্রী কেঁপে উঠল ভয়ে। ধীরে ধীরে সামলে নিল। সরমার দৃষ্টি গবেষণার খাতায় নিবিষ্ট তখনো। এক পা দু'পা করে বিপিন পাশে এসে দাঁড়াল আবার। বেশ সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা সরমা, পৃথিবী উল্টে যাক, তোমার বিজ্ঞান-চর্চার ব্যাঘাত ঘটবে না তাতেও, না?

খাতার ওপর হাত থেমে গেল সরমার। মাত্র মুহূর্তের জন্য। মুখ না তুলেই হাসল তারপর। বলল, পৃথিবী উল্টে যাবে কেন হঠাৎ—।

যদি যায়, তোমার সায়েন্স কি বলে?

এবারে সোজাসুজি তার দিকে তাকালো সরমা।—সায়েন্স বলে, মনের বিকার দেখা দিলে এ ভয়টা আসে বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু সত্যি সত্যি পৃথিবী ওলটায় না কখনো।

হাসতে চেষ্টা করছে বিপিন। দেখছে নিষ্পলক। আর একটা ক্রূর আনন্দ যেন উপচে উঠছে ভিতর থেকে।

রয়ে-সয়ে খুব মোলায়েম করে জিজ্ঞাসা করল, অবিনাশকে বিয়ে করোনি কেন?

সহসা বাক্‌স্ফূরণ হল না সরমার। বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

বুঝল একটা বোঝাপড়ার স্থির সঙ্কল্প নিয়েই এত রাতে তার এখানে পদার্পণ। সকালে অবিনাশের এখানে আসার পর থেকে সব কিছুর বিকৃত পরিবেশন ঘটেছে কি-না কারো মারফত, চকিতে এ সন্দেহও জাগল একবার। হাতের কাগজপত্র সরমা সরিয়ে রাখল একধারে।

হঠাৎ এ কথা?

হঠাৎই। অবিনাশকে ফেলে এসেছিলে তোমার বিজ্ঞান-চর্চার উপকরণ যোগাতে সে অক্ষম বলে। আর, আমিও ওই জন্যেই একটা উপলক্ষ মাত্র, কেমন না?

সরমা অবাক বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। একটু একটু করে রক্তিম দেখায় সমস্ত মুখ।

মুক্তি চাও তুমি?

কি রকম? বিপিন হাসছে।

তোমার ঐশ্বর্য আর এই ল্যাবরেটারি এক মুহূর্তও ধরে রাখতে পারবে না আমাকে, তাই চাও?

তোমাকে ধরে রাখতে পারবে না কিছুই সে আমি জানি। হাসল আবার, সমাদ্দারের ওখানে আগে জায়গা পেলে ছেড়ে আসতে না অবিনাশকে এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে।

বিয়ের আগেই সমাদ্দারের ওখানে স্থান নির্দিষ্ট ছিল, প্রতিবাদের ছলেও কথাটা বলতে বাধছে সরমার। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে।

মুক্তি চাই আমি! ঘর ফাটিয়ে বিপিন হেসে উঠল। সময় লাগল সে হাসি থামতে। হাসির দমকে হাঁপিয়ে উঠেছে প্রায়। দম নিয়ে বিড়বিড় করে বলল—কিন্তু সেটা কতবড় বাঁধন হবে তোমার জানলে শিউরে উঠতে!

আবার হাসতে হাসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

সরমা নির্বাক্।

শীতকালের সমস্ত রাত্রি ছাতে পায়চারি করে কাটল বিপিনের। অন্ধকারে নিজের আবছা ছায়া দেখেও চমকে উঠেছে বার বার। রাত্রির স্তব্ধতায় যেন কোন্ অশরীরী বার বার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তাকে।

পর দিন।

ল্যাবরেটারিতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সরমা খোঁজাখুঁজি করতে লাগল কি। বিগত রাত্রির ব্যাপারটার মীমাংসা এখনো বাকি। সুস্থ মাথায় কিছু চিন্তা করার জন্যই একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চায় বাড়ি থেকে।

বিপিন শুয়ে আছে। শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, কি খুঁজছ?

চাবিটা—

বিপিন পাশ ফিরল।

সরমা প্রস্থানোদ্যত হয়েও ফিরে দাঁড়াল। মানুষটাকে দেখে মনে হয় না আজ বাজে বেরুবে…কিন্তু অবিনাশ শেয়ার-মার্কেটে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে হয়ত। তথাপি কিছু জিজ্ঞাসা করতে প্রবৃত্তি হল না। চলে গেল।

বহুক্ষণ স্থাণুর মত পড়ে থেকে বিপিন উঠল এক সময়। মণ্টুকে ডেকে বলল, একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে। আধঘণ্টার মধ্যেই চিকিৎসক সাধারণ সর্দি-কাশির প্রেস্ক্রিপশান লিখে দিয়ে গেলেন। মণ্টু ওষুধ এনে দিল।

বিপিন মণ্টুকে নির্দেশ দিয়ে রাখল, তাকে কেউ ডাকতে এলে বা টেলিফোন করলে যেন বলা হয় সে বাড়ি নেই।

দুপুর। চারুদেবী একবার খোঁজখবর নিয়ে একটু আগে গিয়ে শুয়েছেন। তিন তলায় আর কারো আসার সম্ভাবনা নেই। ওষুধের শিশি নিয়ে বিপিন পাশের ঘরে তালা-বন্ধ আলমারির সামনে এসে দাঁড়াল।

জামার পকেটে সরমার চাবির গোছা। শিশি বোতলের আড়াল থেকে বিপিন সাইনাডের শিশিটা বার করল।

সোনার ওপর অ্যাকশান্ দেখতে এনেছিল মণ্টু।

ওষুধের শিশিতে সন্তর্পণে খানিকটা গুঁড়ো মিশিয়ে ওটা জায়গা মত রেখে আলমারির তালা বন্ধ করল আবার।

শেয়ার বাজারের আপিসে অবিনাশ অপেক্ষা করছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বার

তিনেক ফোন করিয়েছে ঘনশ্যামবাবুকে দিয়ে। ... দিকে চেয়ে আর অনুরোধ করার সাহস নেই।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ।

বিপিন শুয়ে আছে চুপচাপ। অদূরে টেবিলে ওষুধের শিশি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু পরে পরেই চোখ পড়ছে ওটার ওপর। পাশের ঘরে মন্টু পড়তে বসেছে। নিচে চারুদেবী রাতের আহার তদারকে ব্যস্ত।

সরমার পায়ের শব্দ শোনামাত্র বুকের ভেতরটা কেমন গুড়গুড় করে উঠল বিপিনের। যথাপূর্ব শান্ত তারপর।

ওষুধের শিশি গ্লাস চোখে পড়তে সরমা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখল একবার। হাতের বাঁধানো খাতা এবং ব্যাগ টেবিলে রেখে চেয়ারে বসে জিরিয়ে নিল একটু। উঠল। মুখ হাত ধুয়ে কাপড় বদলে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলো আবার। আগের শাড়িটা ভাঁজ করে আল্‌নায় রাখল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়ে নিল। ব্যাগ থেকে কলম বার করে বাঁধানো খাতাটা হাতে তুলে নিল। পাশের ঘরে গিয়ে বসবে। বিপিন চেয়ে আছে নিষ্পলক নেত্রে।

শোনো—

ফিরে দাঁড়াল।

ওগুলো রেখে এখানে এসো।

সরমা খানিক অপেক্ষা করে খাতা কলম রেখে সামনে এলো।

বোসো—

কি বলবে ?

আজ আর তোমার পড়াশুনা হবে না, বোসো। হাসল সে, সেই দুপুর থেকে অপেক্ষা করছি···

মোলায়েম কণ্ঠ-স্বরের সঙ্গে রক্ত-রাঙা দুই চোখের অদ্ভুত অমিলটা চোখে ঠেকছে সরমার। বসল পাশে।

বিপিন বলল, তাড়া কিসের, এতক্ষণ তো করে এলে কাজ—

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে সরমা। পরে নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করল, ওষুধ কিসের ?

আমার।

খাওনি ?

খাব।

চোখ দু'টো তেমনি হাসছে বিপিনের। সহসা দু'হাতে সবলে বুকের ওপর টেনে নিয়ে এলো তাকে। সরমা নীরব বিস্ময়ে চেষ্টা করল ছাড়িয়ে নিতে। পারল না। বাধা দিতে গিয়ে অস্ফুট একটা স্বর নির্গত হল শুধু। বিপিনের ঘন ওষ্ঠদ্বয় ওর সমস্ত অধর বিদীর্ণ করে দেবে যেন। ঘরের দরজা খোলা মণ্টু পাশের ঘরে পড়ছে।

নিবিড় আকর্ষণে বিপিন কান খাড়া করে ওর বুকের স্পন্দন শুনল অনেকক্ষণ। ছেড়ে দিল তারপর।

খাট থেকে নেমে চকিতে বসন সম্বৃত করে নিয়ে সরমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।

বিপিন হেসে উঠল, ভ পলে নাকি? বোসো।

সরমা দরজার দি এগোতে সানুনয়ে বাধা দিল, আচ্ছা, একটু দাঁড়াও—এক দাগ ওষুধ দিয়ে যা আমাকে।

তীক্ষ্ণ চোখে সরমা আবার নিরীক্ষণ করল তাকে। অবাক পরক্ষণে।

বিপিন চৌধুরীর চোখে জল।

নীরবে কাঁচের গ্লাসে এক দাগ ওষুধ ঢেলে তার হাতে দিল সরমা। সেটা নিয়ে বিপিন অন্য হাতে বালিশের তলা থেকে বার করল কি।—এই তোমার চাবি।

কিছুই ঠাওর করে উঠতে পারছে না সরমা।—কোথায় ছিল?

আমার কাছেই।—হাসছে।—মানুষ সব চেয়ে প্রিয় কারো ওপর সকলের বড় প্রতিশোধ কি করে নিতে পারে জানা আছে তোমার?

সরমা বাক্‌শক্তিরহিত।

হাসছে বিপিন।—সোনার ওপর সাইনাইডের অ্যাক্‌শান তো অনেক দেখেছ, মানুষের ওপর দেখেছ কখনো?

নির্বোধ বিমূঢ় নেত্রে চেয়েই থাকে সরমা।

বিপিন হাসছে। দেখনি তো? আচ্ছা, দেখো। ওষুধ তুমি ঢেলে দিয়েছ কাউকে বলো না যেন।

তীক্ষ্ণ, তীব্র আর্তনাদ করে উঠল সরমা। মিল আছে বিপিনের স্বপ্নে-শোনা সেই আর্ত-কণ্ঠের সঙ্গে। কিন্তু সে শুনল কি?

ঘর দরজা সব কিছু সবেগে দুলে উঠল সরমার চোখের সামনে। একটা

ভয়াল অন্ধকার যেন গ্রাস করতে আসছে তাকে। দৌড়ে কাছে এলো। দেখল চোখ টান করে। শিশির মুখ খুলে খানিকটা তরল পদার্থ হাতে ঢালল। দেখল বিহ্বল নেত্রে। তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে সভয়ে সরে দাঁড়াল দু'পা। শাড়িতে হাত ঘষতে লাগল স্তব্ধ আতঙ্কে।

মণ্টু চারুদেবী গঙ্গা-ঝি চাকর সবাই ছুটে এসেছে ততক্ষণে। সরমা বাইরে দাঁড়িয়ে তেমনি হাত ঘষছে শাড়ির আঁচলে। বুকের দ্রুত স্পন্দনে নিঃশ্বাস রুদ্ধ। ঘরের মধ্যে আর্ত-রোল উঠেছে মণ্টু এবং তার মায়ের।

শীতের রাত্রি। অঝোরে হিম পড়ছে। বাইরে একটানা পায়চারির বিরাম নেই মানুষটার। অবিনাশ। বিগত অনেকগুলি রাত এই করে কাটাল। সান্ত্বনা নেই, অহর্নিশি একটা দাহ কেবল। বসে দু'দণ্ড ভাববার স্থৈর্যও হারিয়েছে। পাগলের মত পটাপট্ চুল উপড়ে তোলে মাথার। অবিশ্রান্ত অভিশাপ দেয় নিজেকে।

সরমা দু'মাস জেল-হাজতে।

চন্দ্র এবং সমাদ্দারের তাকে জামিনে ছাড়িয়ে আনার সকল চেষ্টা ব্যর্থ। প্রধান অন্তরায় সরমার নিজের স্বীকৃতি—ওষুধ সেই ঢেলে দিয়েছে, বিষ মেশানো ছিল জানত না। কিন্তু আত্ম-হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ ওষুধে মেশানো নিষ্প্রয়োজন। সরমার হাত দিয়েই বা বিপিন চৌধুরী সেটা নেবে কেন?

স্বপক্ষের উকিল বলেন, দুপুরে আনা ওষুধ বিপিন রাত্রিতে খেল প্রথম দাগ। কেন? বাকিটুকু তেমনি আছে, সামান্য যেটুকু হাতে ঢেলেছিল সরমা, তারও দাগ পাওয়া গেছে ওর শাড়ির আঁচলে।

হাতের লেখা বিশারদের পরীক্ষা, মণিময়ের সাক্ষি এবং অবিনাশের জবানবন্দিতে সরমার নাম লেখা চিঠি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। চিঠি বিপিনের জামার পকেটেই ছিল। সম্প্রতি এ-তরফের আইনজীবীও আশ্বাস দিচ্ছেন, সরমা মুক্তি পাবে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু এতটুকু শান্তি পাচ্ছে না অবিনাশ।

আগে প্রকাশ্যেই বিরক্ত হয়েছেন চন্দ্র।—এ সময়ে এত অধীর হলে চলবে কেন, সরমাকে তো বাঁচাতে হবে! তা ছাড়া তোমার অপরাধ কি?

কিছু না।

তবে?

অবিনাশের ঘরের সামনে পথের ধারে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। অদূরে একটা কুকুর শুয়ে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। অবিনাশ ছোট একটা ঢিল তুলে হঠাৎ তাড়া করতে দেখা গেল তিন পায়ে ভর দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে ওটা—একটা পা ভাঙ্গা।

চন্দ্রর দিকে চেয়ে অবিনাশ হাসল একটু।

কি ?

অবিনাশ বলল, এক সাইকেলওয়ালা সেদিন বিষম তাড়ায় ভিড় কাটাতে গিয়ে বেমালুম ভেঙ্গে দিয়ে গেল ওর ঠ্যাংটা। কিন্তু অপরাধ ছিল না বলে ওর ভাঙ্গা পায়ের বেদনা যাবার নয়।—যাক, আপনি ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন ?

হ্যাঁ, সেদিকে সব ঠিক আছে।

বিপিনবাবুর কাকীমা ?

চন্দ্র ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, তাঁকে ঠিক বোঝানো গেল না।

বস্তুতঃ, সেখান থেকে নিরাশ হয়েই ফিরেছেন চন্দ্র। রাগে গর্জে উঠেছেন চারুদেবী। এতবড় ছেলে গেল ওর জন্যে, একটা দিন শান্তি পেল না—কক্ষনো ওকে ক্ষমা করবেন না তিনি, লোহার গারদ থেকে জীবনে যাতে আর না বেরুতে পারে সে চেষ্টাই করবেন, ইত্যাদি—

কিন্তু সম্প্রতি সে আশঙ্কাও অপগত। বিচারের পরিবেশটা অহরহ ভাসছে অবিনাশের চোখে। আশা নিরাশার সঙ্কটময় পরিস্থিতি। সাক্ষির চত্বরে চারুদেবী, অদূরে কাঠগড়ায় একটা টুলে সরমা বসে। ক্লান্ত শুষ্ক পাংশু মূর্তি।

বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ মোচড় দিয়ে উঠেছিল চারুদেবীর, ক'টা মাস বাদে এই প্রথম সাক্ষাৎ।…ও যেন আর কেউ।

ওঁদের বিয়ে দিয়েছিলেন কতদিন ? সরকারী উকিলের জেরা।

আমি দিইনি, নিজেরাই করেছে।

কতদিন ?

পাঁচ বছর।

বনিবনা কেমন ছিল ?

বাঙ্গালীর ঘরে যেমন থাকে।

তবু ?

বনিবনা না থাকলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত, কাগজের বিয়ের দাম কি।

আশায় আশ্বাসে নিঃশ্বাস রুদ্ধ মণ্টুর, ডাঃ চন্দ্রর…। জবাবের ধরনে সরকারী উকিলও ঈষৎ বিস্মিত। এই মহিলাটির প্রতিকূলতা আশা করেছিলেন তিনিও। সরাসরি শেষ প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন, বিপিনবাবুর ওষুধে উনি বিষ মেশাতে পারেন বলে মনে হয় আপনার ?

চারুদেবী তাকালেন সরমার দিকে। হঠাৎ একটা কান্না যেন গুমরে উঠতে

লাগল ভিতর থেকে। সামলে নিলেন। স্পষ্ট করে জবাব দিলেন, না, দরকার হলে ও নিজে পারে বিষ খেতে।

আনন্দে সব কিছু ঝাপসা ঠেকে মণ্টুর চোখে। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে চন্দ্র সোজা হয়ে বসেন।

অবিনাশের তলব পড়েছে।

খানিকটা চেতনা ফেরে যেন সরমার। উঠে ধীরে ধীরে কাঠগড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। সাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে সরমা একমাত্র তাকেই ডেকেছিল, কিন্তু একদিনও দেখা করতে আসেনি অবিনাশ। আজও একবার ফিরে তাকালো না ওর দিকে। সোজা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? উকিলের প্রশ্ন।

আমি অসুস্থ।

সরমা দেবীর সঙ্গে আপনার জানাশোনা কতদিন?

দশ বারো বছর।

কোথায় প্রথম আলাপ আপনাদের?

কলেজে একসঙ্গে পড়তাম।

ও, কিন্তু বয়সে তো অনেক বড় মনে হয় আপনাকে?

সাত বছর ফেল করে ওকে ধরেছিলাম।

অস্ফুট হাস্যগুঞ্জন। অবান্তর প্রশ্নের এই জবাবে কক্ষের গুরুভার লাঘব হল খানিকটা।

সরমা শান্ত। চন্দ্র উদগ্রীব।

পরের প্রশ্নটা সচকিত করল সকলকে।—সরমা দেবীকে ভালবাসতেন আপনি?

এখনো বাসি।

তিনি?

তাঁর ভালো লাগত আমাকে···

এখন?

এখনো লাগে।

বিপিনবাবুর সঙ্গে তাঁর বিয়ের আগে আপনি বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন কখনো?

না।

কেন ?

ক্ষয়রোগ সন্দেহে আমাকে ভয় পেতে দেখেছি মেয়েদের। তাছাড়া সামর্থ্যও ছিল না।

পরিবেষ্টনী আবার শান্ত। অনুকম্পা নয়, নিঃসার পাণ্ডুর মানুষটির ব্যক্তিত্ব নয়, এ অনুভূতির নাম হয়ত আর কিছু। সরমা মাথা নিচু করল।

অবিনাশের উক্তির সত্যতা তার স্বাস্থ্য এবং চেহারায় পরিস্ফুট।

পূর্বের জেরাই নিক্ষিপ্ত হল আবার।—সরমা দেবীর সঙ্গে বিপিনবাবুর বনিবনা ছিল ?

অবিনাশ ভাবল একটু।—ছিল না।

ডাঃ চন্দ্র মণ্টু চারুদেবী এমন কি সরমাও সবিস্ময়ে তাকালো তার দিকে। সরকারী উকিলের মনের মত খোরাক মিলেছে এতক্ষণে।—কি রকম ?

থাকলে নিজের স্ত্রীকে এভাবে জড়িয়ে যেতেন না।

জড়িয়ে গেছেন জানলেন কি করে ?

বিষ কেউ এ ভাবে দেয় না, দিলেও বলে না।…তাছাড়া ও চিঠি মিথ্যে হলেও আমাকে নিয়ে আগাগোড়াই বিপিনবাবুর সন্দেহ ছিল। ডাঃ চন্দ্রর কাছে তাঁর লেখা চিঠিও এর প্রমাণ।

সন্দেহ সত্যি কি মিথ্যে একবারও যাচাই করে দেখেন নি বিপিনবাবু ?

না। ব্যবসায়ের দুর্বিপাকে বহুদিন থেকেই তিনি অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন, আর এ যে তাঁর মত মানুষের কাছে কতবড় দুর্ঘটনা এ খবর তাঁর আত্মীয়রা দেবেন। এতে না ডুবলে হয়ত সব ঠিক হয়ে যেত, তিনি নির্বোধ ছিলেন না।

প্রশ্নের মোড় বদলালো হঠাৎ।—বিপিনবাবুর প্রতি সরমা দেবীর মনোভাব কি রকম ছিল ?

অবিনাশ শান্ত জবাব দিল, ল্যাবরেটারির গবেষণা ছাড়া আর কোনদিকে তাঁর মন দেবার অবকাশ ছিল না। এ ত্রুটি বিপিনবাবু কোনদিন ক্ষমা করেন নি।

ত্রুটি ছিল ?

ছিল।

বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত সকলের। প্রস্তরমূর্তির মত সরমা দাঁড়িয়ে তেমনি।

ঘনশ্যামবাবু এবং পাওনাদারদের বিবৃতি অনুকূল।—তিনি লক্ষ টাকা দেনা এবং ব্যবসায়ে সর্বস্ব হারানোর ফলে বিপিন চৌধুরীর আত্মঘাতী মনোভাব :

সুস্পষ্ট ছিল। তার বাড়ির অংশ-বিক্রয়ের রহস্য এবং কারণও ব্যক্ত করে দিলেন ঘনশ্যামবাবু।

সন্ধ্যার দেরি আছে তখনো। সমুদ্রের ধারে সেই নিরিবিলি জায়গাটিতে অবিনাশ বসে আছে। সব ভুলে অনুভব করতে চায়, ওই বিরাটের সঙ্গে তারও আছে কিছু রূপের মিল। কিন্তু মানুষ তার ব্যথা বেদনার গণ্ডি ছাড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ।

চন্দ্র সাহেব বলেন, তার কোন অপরাধ নেই।

নিজের সঙ্গেও এই বোঝাপড়া চলছে অনুক্ষণ, কোন অপরাধ নেই।

কিন্তু নেই কি ?

সরমার জীবনে প্রথম থেকে নিজেকে বাদ দিলে কি দাঁড়ায়। ব্যবসায়ে এর শতগুণ দুর্বিপাকেও বিপিন চৌধুরীর জীবনের প্রলোভন এমন তুচ্ছ হয়ে যেত কি ?

ব্যবসায়ে ডুবেছে, কিন্তু কেন ডুবল ?

অদূরদর্শিতা ?

দুর্মতি ?

কিন্তু আগে তো এমন হয় নি ?

সহসা নারী-কণ্ঠ শুনে সবিস্ময়ে ঘাড় ফেরাল অবিনাশ। অপর্ণা। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে আসায় অভিনব কিছু নেই, তবু এখানে তার আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত। যোগাযোগটা আকস্মিক অথবা ইচ্ছাকৃত সঠিক বুঝল না।

আপনি !

অপর্ণা জবাব দিল, বলেন তো ফিরে যাই—

বিব্রত ভাবটুকু দমন করে অবিনাশ হাসল একটু।—বসুন, কিন্তু এখানে কোথা থেকে ?

এলাম বেড়াতে বেড়াতে। করছেন কি, ঢেউ গুনছেন বসে ?

মনে যাই থাক, বাইরের হাসিখুশিতে বোঝবার উপায় নেই একদিন এই লোকটার বিরুদ্ধেই অপর্ণা ছুরি শানিয়েছে।

অবিনাশ ঈষদহাস্যে জবাব দিল, চেষ্টা করছি। বসে আপনিও গুনুন না দু'চারটে।

মাঝখানে খানিকটা ব্যবধান রেখে অপর্ণা বসল। সমুদ্র-বায়ু-বিলাসীর

ভিড় এবং যশস্বিনী চলচ্চিত্র-অভিনেত্রীর প্রতি তাঁদের সাগ্রহ দৃষ্টিবাণ এড়িয়ে যথার্থই বেড়াবার উদ্দেশ্যে এই নির্জন দিকটায় এসেছে অপর্ণা। অনেক দূর থেকে ধ্যানমূর্তির মত একা বসে থাকতে দেখেই আঁচ করেছে লোকটি কে। বিগত ক'টা মাসের ঘাত-প্রতিঘাত অজ্ঞাত নয়, কিন্তু ইতিমধ্যে তার সাক্ষাৎ আর পায়নি। আজ লোভ সংবরণ করতে পারল না অপর্ণা।

অবিনাশই কুশল প্রশ্ন করল প্রথম, কেমন আছেন?

অপর্ণার অনুসন্ধিৎসু চোখ দু'টি খানিক নিবদ্ধ থাকে তার মুখের ওপর।— কেমন দেখচেন?

সহাস্যে জবাব দিল অবিনাশ, ভরসা করে দেখে উঠতে পারিনি এখনো।

ভয়টা কিসের?

কি জানি।...আপনি ছাড়াও আর যাঁকে ভয় তিনি শুধু শিক্ষাগুরুই নন্, দরকার হলে ভদ্রলোক তুলে আছড়ে দিতে পারেন আমাকে।

দরকার হলে তো! মুখ টিপে হাসছে অপর্ণাও।

তবেই তো ভয়ের কথা!

বিপিন চৌধুরীর মৃত্যু এবং সরমার মুক্তির অনিশ্চয়তা কতটা নিয়ে গেল, অপর্ণার কৌতূহল সেদিকে। সঠিক ঠাওর করে উঠতে পারল না। চন্দ্র অন্যরকম আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু অপর্ণা স্তুতিতে ভুলল না আজ আর। ওর সংযমের পরীক্ষা ভালো করেই হয়ে গেছে। চেয়ে আছে তেমনি, অধরে মৃদু হাসির রেখা। বলল, তুলে আছড়ে দিতে পারেন তেমন করে ভদ্রলোকটির জিনিস আপনি দেখতেই বা যাবেন কেন।

হাসতে লাগল অবিনাশও। আসন্ন গোধূলির এই পরিবেশ হঠাৎ ভারী ভালো লাগছে যেন। বিগত ক'টা মাসের চিন্তাধারায় দেহ মন আচ্ছন্ন। দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা অপগত নয় আজও। ক্ষণিকের এই অনাবিল বিস্মৃতি-টুকু সম্পদের মত মনে হয়। নিতান্ত অকারণেই খাপছাড়া আর একটা অনুভূতি মনে জাগে। যে নারীকে পরম সম্পদের মত আগলে রাখবে পুরুষ, সরমা তাদেরই একজন—আর তাদের একজন অপর্ণাও। সরমার সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে গেছে হতভাগ্য বিপিন চৌধুরীর। চন্দ্রর ও দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়, যদি কোন দিন কোন কারণে অপর্ণাকে তাঁর হারাতে হয়।

জবাব দিল, নিজের চোখকে বিশ্বাস নেই তাই বলছিলাম। থামল একটু, একা বসেছিলাম, আপনাকে দেখে সত্যি কত ভালো লাগছে বলতে পারিনে।

খুশি হয়েছেন ?

খুব। আরো হই যদি আর একটা কথা মনে মনেও বলেন একবার। অপর্ণার জিজ্ঞাসু নেত্রের সম্পূর্ণ মুখোমুখি হল সে।—শুধু বলবেন, অবিনাশবা… আর আমার কোন রাগ নেই আপনার ওপর।

মুহূর্তে একটা কঠিন রেখা মিলিয়ে গেল অপর্ণার মুখে। হেসেই প্রশ্ন করল, আমার রাগ-অনুরাগে আপনার কি আসে যায় ?

অবিনাশ উৎফুল্ল মুখে জবাব দিল, ভাগ্য-ক্ষেত্রের চাঁদে রাহু মহারাজের শ্যেন দৃষ্টি—শেষেরটার দুরাশা রাখিনে, দুঃখ আপনার রাগটুকুর জন্যই।

আমাকে দেখে দুঃখটা মনে পড়ল ?

সত্যিই তাই।

কিন্তু এই না বললেন খুশি হয়েছেন ?

মিথ্যে বলিনি। খুশি হয়েছি আপনাকে দেখে, দুঃখ পাচ্ছি আপনার চোখে নিজেকে দেখে।

অপর্ণা স্বল্পকাল নিরীক্ষণ করল তাকে।—আমার চোখ আমারই থাক্।… আপনার শরীর তো একেবারে সারেনি দেখচি ?

না…রোজই জ্বর হচ্ছে এর ওপর।

ডাক্তার দেখাচ্ছেন ?

যতটা সম্ভব।

আপনার মাস্টারমশাইয়ের ধারণা, আপনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, সত্যি নাকি ?

মনে মনে সচকিত হল অবিনাশ। লঘু হাস্যে পাল্টা প্রশ্ন করল, এতক্ষণ কথা বলে তাই মনে হল আপনার ?

তবে শরীর সারচে না কেন ?

তেমনি হালকা করেই বলল অবিনাশ, মাস্টারমশাইয়ের অতিরিক্ত স্নেহে অতিশয়োক্তি নেই বলতে পারলে খুশি হতাম। এ দুর্দিনে উপার্জনের অক্ষমতা এমন একটা কিছুতে চাপা দিতে পারলে আত্মসম্মানটা অন্তত বাঁচে।

স্বাস্থ্য-হানির প্রসঙ্গে স্থূল দারিদ্র্যের উল্লেখ শ্রুতিমধুর তো নয়ই উপরন্তু কোথায় যেন লাগে অপর্ণার। নিজের বর্তমান উপার্জনের স্ফীত অঙ্কটা চকিতে মনে পড়ে। বিক্ষোভ বাড়ে আরো। নিজের সব টাকা লোকটার ঘাড়ে চাপিয়ে এমন দার্শনিক দারিদ্র্যের দম্ভ চূর্ণ করতে পারলে ঝাঁজ মিটত। সম্ভব

নয়। নিঃশব্দে কাটে কিছুক্ষণ। দিনের আলোয় প্রদোষের ছায়া পড়ছে একটু একটু করে। সামনে উচ্ছল জলরাশির ক্ষ্যাপা উন্মত্ততা।

কি ভেবে অপর্ণা কথা-বার্তার মোড় ফিরিয়ে দিল হঠাৎ।—শুনলাম, অনেক-দিন আগে সরমা আপনার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেয়েছিল।···আপনি নাকি দেখা করেন নি। কেন বলুন তো?

অবিনাশ প্রস্তুতই ছিল। এ প্রসঙ্গ উঠবে জানত। নিস্পৃহ জবাব দিল, কি আর হত দেখা করে।

অপর্ণা মন্তব্য করে, তার জানাশুনা সকলের মধ্যে একমাত্র আপনাকেই সে ডেকেছিল, আর কিছু না হোক মনে বল পেত খানিকটা।

একটু ভেবে অবিনাশ শান্ত মুখে জবাব দিল, তার জানাশুনা সকলের মধ্যে একমাত্র আমার কাছেই খানিকটা দুর্বলও হয়ে পড়তে পারত সে।

সামনে ঢেউয়ের তাণ্ডব-লীলা দেখছে অবিনাশ। অপর্ণা আড় চোখে নিরীক্ষণ করল তাকে।—কিন্তু আপনি এমন উদাস মনে ভাবছিলেন কি একা বসে, সরমা ছাড়া তো পাবেই!

অন্যমনস্কের মত অবিনাশ বলল, অপরাধ যখন করেনি কিছু, ছাড়া না পাওয়ার কোন কারণ নেই।

ওকে আঘাত দেবার অভিসন্ধি অপর্ণার হয়ত ছিল না আজ। থাকলেও সহানুভূতির দাক্ষিণ্যে প্রকাশ পেত না কিছু। কিন্তু জবাব শুনে মরচে-ধরা ছুরিতে নতুন শান পড়ল একপ্রস্থ। নীরব ক্ষণকাল। ঠোঁটের কোণে অকরুণ হাসির রেখা।

বেশ।···সরমা ছাড়া পেয়ে ফিরে আসবে আনন্দের কথা, কিন্তু তার আগে যে ভদ্রলোকটি গেলেন তাঁর আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই কোন কালে। একেবারেই গেলেন তিনি।

উদ্গত একটা নিঃশ্বাস রোধ করল অবিনাশ। বড় একটা ব্যথার জায়গায় কাঁটার মত বিঁধছে কি। দুর্বলতা আছে বলেই জবাবটা নির্মম শোনাল আরো। আস্তে আস্তে বলল, জানাশুনা কারো মৃত্যুতে বেদনাবোধটুকু এমনই হয় বটে। যে জায়গায় গেছেন সেখান থেকে ফিরে আসা চলে না আর, চরম নিবুর্দ্ধিতার সময়েও ভদ্রলোকটির এ জ্ঞানটুকু ছিল বোধহয়।

ও। আর এ নিবুর্দ্ধিতার জন্য সরমার কোন কৈফিয়ৎ নেই? প্রায় রূঢ় শোনায় কণ্ঠস্বর।

কিছুমাত্র না। অবিনাশ নির্লিপ্ত।—ব্যবসায় যেদিন ডুবেছেন সেই দিনটাই বিপিনবাবুর মৃত্যুর তারিখ, আত্মহত্যায় দেহটা গেছে শুধু। সরমা এই দুর্ভোগ ভুগছে বলে মাঝে মাঝে এখনো তাঁকে ধাওয়া করার বাসনা জাগে আমার।

সত্যি? অপর্ণা ব্যঙ্গ করে উঠল।

সত্যি।

কিন্তু কোর্টে তো সে কথা বলেন নি!

কোর্টে ভাবাবেগের জায়গা কম, সেখানে কিছুটা ছলাকলার দরকার।

অপর্ণা তীক্ষ্ন-কণ্ঠে প্রশ্ন করে আবার, কিন্তু বিপিনবাবুর আত্মহত্যায় আপনার নিজের দিক থেকেও জবাবদিহি করার নেই কিছু?

আদালতে করেছি। অবিনাশ নির্বিকার, আমার লেখা ওই চিঠি পাঁচ বছর আগের একটা হাস্যকর উপলক্ষ ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু হাস্যকর উপলক্ষও কতবড় মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়ায়, এ শিক্ষা হল বোধহয়?

অবিনাশের ক্লান্ত দু'চোখ কিছুক্ষণ যেন আটকে থাকে অপর্ণার মুখের ওপর। আস্তে আস্তে বলল, এমন শিক্ষা আর আমি কখনো পাইনি বৌদি, কিন্তু বড় দেরিতে পেলাম, এ আর আমার কোন কাজে লাগবে না।...তবু, সময় থাকতে মাস্টারমশাইয়ের কথা ভেবে এ থেকে আপনিও যদি কিছু শিখতে পারেন, আমার শিক্ষা পাওয়া একেবারে ব্যর্থ হবে না হয়ত।

অকস্মাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সিড়সিড় করে উঠল অপর্ণার। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে যেন ভস্ম করে দিতে চাইল তাকে। তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়াল পরমুহূর্তে।

যাচ্ছেন? চলুন আমিও যাব, জ্বর এলো বোধ হয়।

উঠল অবিনাশও। অদূরে পথের ধারে অপর্ণার গাড়ি দাঁড়ানো দেখে মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে আবার বলল, আপনার গাড়ি দেখছি... আমাকে পৌঁছে দেবেন? ভারী ক্লান্ত লাগছে—

দু'চোখে তখনো আগুন ঠিকরে পড়ছে অপর্ণার। এক ঝলকে তার আপাদ-মস্তক দেখে নিল আবার। কোন কথা না বলে হন্ হন্ করে হেঁটে চলল গাড়ির দিকে।

যতক্ষণ দেখা যায় তাকে, অবিনাশ দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। তার পরেও অনেকক্ষণ। মুখে ব্যথাতুর হাসির প্রয়াস একটু।

পিছনে একটা বড় ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দে চমক ভাঙলো।

॥ ১৫ ॥

সরমা জেল-আঙিনার বাইরে এলো প্রায় ছ'মাস বাদে। অদূরে মণ্টু অপেক্ষা করছিল। পরিচিত আর কেউ নেই। সরমা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল তার দিকে। তিমির রাত্রির অবসানে শান্ত স্তব্ধতার মত আচ্ছন্ন। মণ্টুকে দেখে উদ্গত অনুভূতি দু'চোখ ছাপিয়ে ভেঙে আসতে চায়।

ভালো আছ?

জবাবে দ্বিধা কাটিয়ে মণ্টু জিজ্ঞাসা করল, গাড়ি ডাকি?

কোথায় যাব?

মণ্টু বলল, মা পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে…।

ও বাড়িতে প্রবেশের পথ বিপিন চৌধুরী রুদ্ধ করে দিয়ে গেছে বরাবরকার মত। ইচ্ছেও নেই। অষ্ট-প্রহর সেখানে কানে বাজবে এক ব্যর্থোন্মত্ত জীবনের নিঃশ্বাস। বুকের ভিতরটা সরমার পুড়ে যাচ্ছে আজও। জলজ্যান্ত মানুষ, অভিশপ্ত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বে এমন করে এ যদি এক মুহূর্ত আগেও জানত! তার শেষের উদভ্রান্ত স্পর্শটুকু যেন দাহ্য অনুভূতির মত এখনো লেগে আছে সমস্ত দেহে। বিগত পাঁচ ছ'টা বছর ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত সরমা শান্তি পাবে না।

আর কারো কথা ভাববার অবকাশ পায়নি জেলে বসে। মণ্টুকে কাছে দেখে সহসা মনে হল, বুকের ক্ষত তার যত বড়ই হোক, ওই একজনের মৃত্যুতে ক্ষতির পরিমাণ তো এদেরও কম নয়। আজ ওই বাড়িতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলতেও দুঃসহ যাতনার মত লাগছে।

তবু সরমা শান্ত মুখেই বলল, কেউ না পাঠালেও তুমি আসতে জানি, কিন্তু এর পরে তুমিও কি আমাকে বুঝবে না মণ্টু?

এরকম কিছু শুনবে সে ভয় মণ্টুর একেবারে ছিল না এমন নয়। তবু বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে তাকে এ বিশ্বাসটুকু ছিল। কিন্তু সামনাসামনি এসে কেমন যেন হয়ে গেল ও নিজেই। জোর করতে মন সরল না একটুও। একটু থেমে শুধু জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যেতে চাও?

ঠিক করিনি। ওর দিকে চেয়ে ওর নীরব আকূতিটুকুই যেন উপলব্ধি করল

সরমা। বলল, আর কারো জন্য না হোক তোমার জন্য আমার মন কাঁদবে মণ্টু। যেখানে থাকি খবর দেব।…আসবে তো?

হাঁ না কিছুই বলল না মণ্টু। একটু বাদে দেখা গেল ডাঃ চন্দ্র লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে আসছেন তাদের দিকে। কি ভেবে মণ্টু জানালো, অবিনাশদার খুব অসুখ বৌদি।

সরমা চেয়ে থাকে তার দিকে। অবিনাশের এখানে না আসার হেতু যে অসুস্থতার দরুন হতে পারে ভাবেনি।

কি হয়েছে?

অসুখ অনেকদিনই, মাসখানেক হল হাসপাতালে আছেন। আগে একবার সেখানে গেলে হয় না?

অন্তস্তলের একটা ব্যাকুল আলোড়ন সংবরণ করেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সরমা।

চন্দ্র সাহেব কাছে এসে বললেন, দেরি হয়ে গেল…তুমি বাড়ি যাচ্ছ?

সরমা ঘাড় নাড়ল শুধু, না।

কোথায় যাবে?

নিরুত্তর।

চন্দ্র বললেন, সমাদ্দার সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন, এসো—

সেখানে থাকব আমি?

হ্যাঁ, কোন অসুবিধে হবে না।

সরমা একটা বড় রকমের নির্ভর পেল যেন। বলল, চলুন।

থামল আবার। মৃদু-কণ্ঠে মণ্টুকে বলল, আমার যাওয়া সম্ভব নয় এখন…. যদি পারো কেমন থাকে না থাকে মাঝে মাঝে দেখে এসে আমাকে জানিও।

চন্দ্র বিস্মিত নেত্রে তাকালেন মণ্টুর দিকে। সরমা এগিয়ে গেছে ততক্ষণে।

সকাল থেকে সমাদ্দারের হাঁকডাকে চাকর-বাকর তটস্থ। শয্যাশায়ী হলেও তাঁর তাগিদের জোর কম নয়। দোতলার একটা ঘরে সরমার থাকার ব্যবস্থা। এত বড় বাড়ির প্রায় সব ক'টা ঘরই বারোমাস খালি পড়ে থাকে, এই উপলক্ষে সেগুলিরও সংস্কার ঘটল কিছু কিছু। ভাবছেন আর কি করা যায়।

সরমাকে দেখা মাত্র একটা অজ্ঞাত ব্যথা হয়ত মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত করল তাঁকে। কিন্তু বিজ্ঞানীর মুখোশে আসল মানুষটা তলিয়ে গেল পরক্ষণে। ডাক-লেন, এসো। থাক, প্রণাম করতে হবে না, এক বছর শুয়ে আছি, পায়ে আর

ধুলো কোথায়! হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে বসালেন তাকে। দেখলেন একটু।

তারপর···এখানেই থাকবে ঠিক করলে?

সরমা নীরব।

এ প্রশ্ন চন্দ্রও প্রত্যাশা করেন নি। অদূরের কোচে বসলেন তিনি। বললেন, সেই ব্যবস্থা মতই তো নিয়ে এলাম।

সমাদ্দারের মুখে ব্যবসায়ীর ছদ্ম গাম্ভীর্য।—বেশ। থাকা খাওয়া বাবদ এবার থেকে ওর হাতখরচটা কাটান যাবে তাহলে।···তাতেও কুলোবে না, সি উইল্ হ্যাভ্ টু ওয়ার্ক মোর।

এক সময় ছিল, যখন সরমা এসব কথায় হাসিমুখে ঝগড়া করতে ছাড়ত না। আজ ও সান্ত্বনাই পেল্। অনুগ্রহের ছলেও কাউকে এঁরা ছোট করে দিতে চান না।

চন্দ্র হেসে বললেন, এসব হিসেব-নিকেশ পরে হবে'খন, ওপরে কোন্ ঘরে থাকবে পাঠিয়ে দিন, বিশ্রাম নিক আপাতত।

সমাদ্দার তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, এখানেই বা পরিশ্রমটা হচ্ছে কিসে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সরমার দিকে তাকালেন তিনি। সি লুক্স্ বেটার, কোনো দিন হয়তো বা সত্যিই সাইনটিস্ট্ হবে। হবেই বলছি না, হলেও হতে পারে।··· সি নিডেড্ দিস্···পারহ্যাপস্ মোর ···।

সরমার আড়ষ্ট পাংশু মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। বললেন, সাধনার পথে দুঃখ বড় ভূষণ···কেমন সুন্দর কথাটা বললাম! এ ক্যাম্ জিনিয়াস্—চন্দ্র হাসছ? ও, আরো কেউ বলেছে বুঝি? বলবেই তো, সত্যি কথা সকলেই বলবে। অভিজ্ঞতা চাই, নইলে মন স্থির হয় না।

নিরীহ মুখে টিপ্পনী কাটলেন চন্দ্র, আপনার দুই একটা অভিজ্ঞতার কথা বলুন না শুনি।

বিপদগ্রস্ত হয়ে গম্ভীর মুখে গাল দিলেন তিনি, তুমি পণ্ডিত-মূর্খ। আমার আবার অভিজ্ঞতার দরকার কি, আমি অনুভবজ্ঞানী।

নিজের অজ্ঞাতে হয়ত বা অতি বড় সত্যি কথাই নির্গত হল মুখ দিয়ে। হেসে উঠলেন হা-হা করে। সরমাকে বললেন, যাও গিন্নি, চন্দ্র বলছে তোমার বিশ্রাম দরকার—সেই তো মাতব্বর এখন, করোগে বিশ্রাম যত খুশি। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডান দিকে তোমার ঘর।—বেয়ারা!

আদেশ মত বেয়ারা সরমাকে নিয়ে গেল। কি ভেবে সমাদ্দার গম্ভীর মুখে ডাকলেন, চন্দ্র—

বলুন।

ওকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দেবে না।

কিন্তু…

তিনি বাধা দিয়ে উঠলেন, আমি ডাক্তার ভুলো না, ছ'মাস জেলে বিশ্রাম করেছে—কোল্ড্ রেস্ট্! মাথা খারাপ হবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট সময়।

দু'টো দিন কাটল। সরমা ওপর থেকে নিচে নামেনি। চন্দ্র এসে তত্ত্বাবধান করেছেন, বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে একতরফা আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন কখনো। কিন্তু অন্য দিক থেকে সাড়াশব্দ নেই। ভুটা এসে সমবেদনা জানিয়েছে। পরে রিসার্চের কথাবার্তা তুলতে গেছে সেও। মৌন আবহাওয়ায় টিকতে পারেনি বেশিক্ষণ।

মুখচোরা হরিআনন্দ্ সিঁড়ি পর্যন্ত এসেও ফিরে গেছে বার দুই।

চন্দ্র সেদিন কি ভেবে তার ঘরে এসে বসলেন। ঈষৎ ভারাক্রান্ত। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার শরীর ভালো আছে তো?

সরমা জানালার ধার থেকে কাছে এসে দাঁড়াল।

চন্দ্র বলল, বুড়োকে তো চেন, নিচে নামছ না বলে ভেবে অস্থির। বোসো। একটু থেমে বললেন, অবিনাশের অসুখ… শুনেছ?

নীরবে শয্যার একধারে বসল সরমা।

চন্দ্র বললেন, সকালে তাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। বার বার জিজ্ঞেস করল তোমার কথা…এখানে আছ শুনে খুব খুশি।

সরমা শান্ত মুখে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে।

দ্বিধা কাটিয়ে চন্দ্র সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে দেখতে যাচ্ছ কবে?

এবারো জবাব নেই।

নিজের মনেই চন্দ্র কি যেন ভাবলেন একটু। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, দেখো, অবিনাশের সেদিনের সাক্ষিতে শুধু তুমি কেন, আমরাও অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখা গেল সে ভালই করেছে।…তোমাকে নিয়ে বিপিনের অশান্তিটুকুও সত্যি নয় এ প্রমাণ করতে গেলে শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসায় এসে পৌছানো যেত না।…অবিনাশের অসুখটা এবারে একটু বাড়াবাড়ি রকমের, ভয়ের কারণ আছে।

সরমার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে নিজেও অ[illegible]বোধ করছেন চন্দ্র। যে অপরিসীম মর্ম-যাতনায় তিলে তিলে দগ্ধ হতে দেখেছেন অবিনাশকে, এ সময়ে তার কতটুকু ব্যক্ত করা চলে ওঁর কাছে ভেবে পাচ্ছেন না। এ পরিস্থিতি নিঃসংশয়ে সামলে নিতে পারত যে, সে অপর্ণা। একটা বড় নিঃশ্বাস সঙ্গোপনে বাতাসে মিশল।

হাসপাতালের ফটকে গাড়িটা ভালো করে থামার আগেই নেমে পড়ে সরমা ছুটল ভিতরের দিকে। একটা সাধারণ ওয়ার্ডে সন্ধান মিলল অবিনাশের। আরো পাঁচ-সাতজন রোগী ভাগ্য গুনছে সেখানে শুয়ে। হঠাৎ তাকে দেখে খুশিতে সমস্ত মুখ ভরে উঠল অবিনাশের। নিঃশব্দে শীর্ণ হাত দু'টি বাড়িয়ে দিল তার দিকে। দ্রুত কাছে গিয়ে সরমা ধরল সে হাত। পাশে বসে পড়ে ওই হাতেই মুখ ঢাকল নিজের।

অপরাপর শয্যাশায়ীরা স্বল্পক্ষণের জন্যও রোগ-যন্ত্রণা ভুললো। ভোরের হাসি অবিনাশের রোগ-পাণ্ডুর মুখে।

সমাদ্দারের ল্যাবরেটারি। রাত হয়েছে। শ্রান্ত পায়ে সরমা সিঁড়ির দিকে এগোতে বাধা পড়ল। কে যায়, গিন্নি!

সরমা দাঁড়িয়ে পড়ল।

সমাদ্দারের ঘরে প্রবেশ করতে তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, বাসো। ঘরের সবুজ আলোয় তাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন আ[illegible]।—কাজে নামছ না কেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সরমা জবাব দিল, নামব। কাজ করব বলেই তো এখানে এসেচি।

হুঁঃ। ছদ্ম-অসন্তোষে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি। বললেন, অনাহারে আধমরা কচি শিশুর মায়ের মত একটা জ্বালা সবার আগে তোমাদের থাকা চাই আমার ল্যাবরেটারির জন্য—রোজ তার ব্যবস্থা করে তারপর যত খুশি ভাবগে নিজের দুঃখ বেদনার কথা।

পাশ ফিরে শুতে চেষ্টা করলেন তিনি। সরমা সাহায্য করল। পরে চুপ-চাপ অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। আজ এই প্রসঙ্গ তিক্ততাই আনল শুধু। ভাবল বলে দেয়, অনাহারে বুভুক্ষু শিশু তার না থাক, আছে এমন কেউ, যার সম্পূর্ণ

পরিচর্যার আগে আর কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব হবে না তার দ্বারা।

ওপরে উঠে এলো। নিজের অজ্ঞাতে ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস পড়ল একটা। কিন্তু অবিনাশের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে গুরুভার যত বাড়ুক, মন সচেতন হয়েছে সন্দেহ নেই। ভাবল, এমন একটা পরিপূর্ণ আশ্রয় পেয়েছে বলেই নিজের বোঝা বয়ে কাটিয়ে দিল ক'টা দিন এও তো মিথ্যে নয়।

পরদিন। ল্যাবরেটারিতে যে যার কাজে লেগে গেছে এতক্ষণে। ছ'মাস অনভ্যাসের অবসাদ সহজে কাটিয়ে উঠতে পারছে না সরমা। সঙ্কোচ লাগছে কেমন। ভুটার মুখে শুনেছিল নতুন সহকারীর সমাগম হয়েছে আরো জনা কতক। নীরব কৌতূহলে হয়ত তারা চেয়ে দেখবে ওকে। এতবড় একটা বিচার-পর্ব আর কিছু না দিক, পরিচিতি দিয়েছে নিদারুণ।

হঠাৎ খেয়াল হতে দেখে, সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত উঠে হরিআনন্দ্ দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। লাজুক মানুষ, নিচ থেকে ওপরের ব্যবধানটুকু অতিক্রম করে ফেলেছে শেষ পর্যন্ত।

সরমা কাছে এসে হাত ধরে ডাকল, এখানে দাঁড়িয়ে কেন আনন্দ, ঘরে এসো।

তাকে বসতে দিয়ে সরমা কাছেই দাঁড়াল। হরিআনন্দ্ ঘরের ভিতরটা একবার নীরবে পর্যবেক্ষণ করে সুগম্ভীর মনোযোগে হাত দেখতে লাগল নিজের। আগে ওকে নিয়ে ভুটার ঠাট্টা কানে এলে সরমা রাগ করত না বরং হাসত মনে মনে। আজও তার এ নিঃশব্দ আগমনের সবল সুস্থতাই অনুভব করল যেন।

এতদিন আমার খবর নাওনি যে আনন্দ?

হরিআনন্দ্ মুখ তুলে তাকালো একবার। পরে আস্তে আস্তে বলল, কাজে আসছ না কেন, মন ভালো থাকত—

অনাড়ম্বর সহানুভূতিটুকু অন্তর স্পর্শ করে। বৃথাই মন দ্বিধান্বিত ছিল এতক্ষণ। মানুষের বেদনাকে ওরা মর্যাদা দিতে জানে।

আজ যাব। তুমি এলে ভালই হল, চলো।

ল্যাবরেটারি। বার্নারের ঘষ্ ঘষ্ আর স্টীমের মৃদু শোষণগর্জনে সেই সমাহিত স্বপ্নময় পরিবেশ। সরমার জায়গা খালি পড়ে আছে তেমনি। এগিয়ে গেল সেদিকে। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে হরিআনন্দ্ নিজের ডেস্ক্ এ গিয়ে দাঁড়াল। ভুটা মহাখুশি। চন্দ্রর মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। অন্য দু'চারজন নবাগতর

চোখে কৌতূহল ছাড়া আরো যে অভিব্যক্তি পরি[illegible]কে অবিমিশ্র সম্ভ্রম বলা চলে। তারা জানে, এই একজনের অপেক্ষায় ভুটা হরিআনন্দ চন্দ্র এমন কি শয্যাশায়ী বৃদ্ধ সমাদ্দার পর্যন্ত দিন গুনছেন।

সরমার লেশমাত্র সঙ্কোচ নেই আর। সমাদ্দারের গত সন্ধ্যার অনুযোগটুকু যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করল এখন। অনাহারে আধমরা কচি শিশুর মায়ের মত ওমনি একটা জ্বালা তাদের থাকাই চাই ল্যাবরেটারির জন্য।

দিন অবসানে সহকারীরা বিদায় নিয়ে গেছে। চন্দ্র ফ্যাক্টরীর হিসেবপত্র দেখছেন। সমাদ্দারের ঘরে প্রবেশ করল সরমা।

একগাল হেসে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন, এসো এসো গিন্নি এসো—সব বুঝে টুঝে নিলে ওদের থেকে?

হ্যাঁ।

বোসো।

সরমা কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পরে সকল দ্বিধা কাটিয়ে শান্ত মুখে বলল, আমা[illegible] কিছু টাকা চাই।

সমাদ্দারের মেজাজ প্রসন্ন। ছদ্ম-ভীতি প্রকাশ পেল মুখে, সে আবার কি! একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, কত চাই?

সরমা নীরবে চিন্তা করল ক্ষণকাল।—ঠিক জানিনে, যা লাগে দেবেন।

ও বাবা! একেবারে তৃতীয় পক্ষের গিন্নির মত আব্দার দেখি যে! হাঁক পাড়লেন, ওহে চন্দ্র শুনছ!

সরমার দিকে চেয়ে থেমে গেলেন, আচ্ছা যাও, চন্দ্রকে ব[illegible] দেব'খন।

সরমা নিজের ঘরে চলে আসার একটু বাদেই চন্দ্রও উঠে এলেন।

টাকা কি অবিনাশের জন্য দরকার?

হ্যাঁ, তাকে আলাদা কেবিনে নিয়ে যাব।

সে রাজী হয়েছে?

তাকে বলিনি কিছু।

চন্দ্র একটু মৌন থেকে বললেন, আমি চেষ্টা করেছিলাম, দেখো তুমি…।

সুপ্রশস্ত কেবিনেই আসতে হল অবিনাশকে। বাধা দেবার অবকাশও পেল না। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা করে সরমা স্ট্রেচারে করে সোজা সরিয়ে আনল তাকে।

অতনিদূরের জানালায় ঠেস দিয়ে সরমা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে বাইরের

দিকে চেয়ে। অস্তগামী সূর্যের গৈরিক আভায় ওকেও পাণ্ডুর দেখাচ্ছে কেমন। খানিকটা অন্যমনস্ক, খানিকটা ক্লান্ত। সেদিকে চেয়ে চেয়ে দু'চোখ সজল হয়ে আসে অবিনাশের। গলা পর্যন্ত টেনে দিল চাদরটা। কঙ্কালসার জরাজীর্ণ দেহ যতটা আড়াল পায়। ডাকল, এখানে এসে বোসো সরমা, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন।

সাড়া পেল না। হয়ত শুনতে পায়নি, হয়ত বা শুনেও ইচ্ছে করেই এলো না। অনেকক্ষণ বাদে একজন নার্স ঘরে প্রবেশ করতে ফিরে দাঁড়াল। ওষুধ খাইয়ে এবং জ্বর দেখে নার্স চলে গেল। সরমা কাছে এলো।

বোসো।

শয্যাপাশে বসল সরমা। অবিনাশের বড় বড় দুই প্রতীক্ষাতুর চোখের সঙ্গে মিলল তার চোখ।

এমন ঢেকে ঢুকে শুয়ে আছ কেন, শীত করছে ?

না, ভাল লাগছে।

আবার নীরব কিছুক্ষণ। তারপর সরমা মৃদু গলায় বলল, সেদিন আমাকে কথা দিয়েছিলে শরীরের যত্ন নেবে, রাখলে না তো ?

অবিনাশ হাসতে চেষ্টা করল একটু।—কিন্তু এর পরে যা ঘটল তার জন্যে কে আর প্রস্তুত ছিল বলো। বিপিনবাবু যাবেন আর যাবার আগে খুনের দায়ে তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাবেন এমন করে, এ কথাও তো ছিল না।

খুনের দায়ে তো জড়াতে চান নি আমাকে…।

চান নি ?

শান্ত মুখেই সরমা জবাব দিল, না। বলেছিলেন ওষুধ আমি দিয়েছি এ যেন না বলি। তখন বুঝিনি…।

শান্তির নিঃশ্বাস ফেলল অবিনাশ।—বাঁচালে, তিনি পুরুষমানুষ বলেই বোধ হয় এত বড় অমানুষিকতা নিজেরই কোনো অপরাধের মত লাগছিল। এ খবর জানতুম না।

সরমা আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু তার বদলে আমার হাত থেকে বিষ নিয়ে যে আঘাত দিয়ে গেলেন সেও কি ভোলবার। সেও কি পুরুষমানুষের সাজে ?

অবিনাশ নিরুত্তর।

জবাব দিলে না ?

কি বলব ?

সেদিন আদালতে যা বলে এলে তাই কি ঠিক ? আমিই দায়ী তাঁর এ মৃত্যুর জন্য ?

অবিনাশ হাসল। বলল, কিছুদিন আগে অ চন্দ্রও এ প্রশ্নই করেছিলেন, তাঁকে জবাব দিয়েছি। দেখা হলে শুনে নিও।

তোমার জবাব শুনতে অপর্ণা চন্দ্রর কাছে যেতে হবে আমাকে ?

সে কথা নয়।···কিন্তু এ আলোচনা থাক সরমা।

সত্যি কথা শুনতে আর আমি ভয় পাব না, বলো শুনি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়ে রইল অবিনাশ। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো তার দিকে। সরমার চোখে আগ্রহ নেই, শুধু শ্রান্ত প্রতীক্ষা। বলল, দায়ী নও বললেও তো মন মানবে না তোমার।···তা ছাড়া নিজেই ঠিক বুঝিনে। অবিনাশ ভাবল আবারও একটু, তোমাদের বিজ্ঞান বলে, কত জীবাণুর মৃত্যুর কারণ আমাদের প্রতিটা নিঃশ্বাস, আবার কত মানুষেরও মৃত্যুর কারণ ওরাই। এর মধ্যে কার জন্যে দায়ী কাকে করব, যা হবার তাই হয় শুধু। দু'টো মানুষ যখন পাশাপাশি চলে, সমস্যা থাকে না, কিন্তু একই রাস্তায় যখন উল্টো দিকে আনাগোনা শুরু হয় তাদের, ইচ্ছে না থাকলেও ঠোকাঠুকি লেগে যায় কখনো। এর জন্যে দায়ী যদি কাউকে করতে হয় সে অদৃষ্ট।

অন্যমনস্কের মত বসে থাকে সরমা। কথাগুলো তার কানে গেছে বলেও মনে হয় না।

ল্যাবরেটারিতে কর্ম-নিবিষ্ট সকলে।

শুধু সরমাই কাজে মন দিতে পারছে না।

সমাদ্দারের মেজাজ উগ্র। নতুন গবেষণার কিছু ফলাফল আশা করছেন। মেডিকাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জবাবের প্রতীক্ষায় থেকে বিরক্তি ধরে গেছে। বিকেলের দিকে আবার হাঁক পাড়লেন, গিন্নি!

সরমা!

কাজ ফেলে সরমা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ভিতরে আসব ?

না। গাধাগুলো জানালে কিছু ?

সরমা বিপন্ন মুখে চন্দ্রর দিকে তাকাতে তিনি ইশারায় ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ, শান্ত থাকেন এমন কিছু বলো।

সরমা জানাল, অ্যানিমেল বডিতে এবার রিঅ্যাক্‌শান দেখা যাবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

ছ্যাটস্‌ ফাইন্‌! সময় নষ্ট কোরো না, কাজে যাও।

সরমা জায়গায় ফিরে এলো আবার। এমনি বুঝ দেওয়া ছাড়া উ নেই। কোনো প্রকার উত্তেজনা সহ্য হবার কথা নয় সুমাদ্দারের।

সরমার শুষ্ক মূর্তি লক্ষ্য করে চন্দ্র মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন, ক্লান্ত লাগছে খুব?

না।

হলেও ক্ষতি নেই, ওষুধটা বেরুলে নিজেরাই আগে খানিকটা করে খেয়ে নেব'খন।

সরমা চেষ্টা করল হাসতে। কিন্তু দুশ্চিন্তার পাষাণভার অপসৃত হবার নয়। ঘড়িতে পাঁচটা না বাজতে ডেস্ক গুটিয়ে ফেলল। চন্দ্রকে বলল, আমি যাই?

হ্যাঁ, যাও।

এ সময়টায় নিয়মিত হাসপাতালে আসছে সরমা। কাছাকাছি গিয়ে পা কাঁপে রোজই। কি শুনবে, কি দেখবে। একটা ক্লান্তির বোঝা নিষ্ক্রিয় করে ফেলছে তাকেও। চোখ ছলছল করে ওঠে যখন তখন। মন বলে, আবার একটা কিছু ঘটবে শিগগীরই।

দরজার বাইরে নার্সকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, কেমন?

এক রকমই। নার্স গম্ভীর মুখে অন্য দিকে চলে গেল।

প্রতিদিনই ঝিমিয়ে আসছে অবিনাশ।

ঘরের সবুজ আলোয় আজ আরো বেশি নিঝুম দেখাচ্ছে তাকে। চোখ বোজা। ঘুমিয়ে কি জেগে বোঝা গেল না। শব্দ না করে পাশে গিয়ে বসল সরমা।

বহুক্ষণ বাদে চোখ মেলল অবিনাশ। হাসল অল্প একটু। কখন এলে?

এই তো।

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজল সে।

মাঝে মাঝে ডাক্তার আনাগোনা করছেন। তাঁদের কথাবার্তা উদগ্রীব হয়ে শোনে সরমা। একটা হিম-শীতল অনুভূতি যেন পা বেয়ে নামছে তার। নামছেই।

রাত হয়েছে।

সরমা এক সময়ে উঠে এখানে থাকার অনুমতি নিয়ে এলো।

বসে আছে। রোগীর পাশে নিস্পন্দের মত দেখায় তাকেও। প্রায় মা-রাত্রিতে আবার চোখ মেলে তাকালো অবিনাশ।

যাওনি এখনো, রাত কতো?

বেশি না, তুমি ঘুমোও।

আর ঘুম আসবে না, ক'টা বাজল?

তিনটে···আজ আমি এখানে থাকব বলেই এসেছি।

অবিনাশ বিস্মিত নেত্রে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।—কিন্তু কাল তো আবার খাটুনি আছে—

ছুটি নেব'খন। এখন কেমন লাগছে তোমার?

ভালই···ঠিক বুঝছি না···।

চোখ বুজে অনেকক্ষণ স্থাণুর মত পড়ে থাকে সে।

সরমা—

বলো।

ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে তোমার, যখন একসঙ্গে পড়তাম—

আছে।

আমারো প্রায়ই মনে পড়ে। তুমি আমার ওপর মাঝে মাঝে রেগে যেতে খুব, না?

প্রবল এক কান্নার ঢেউ সবলে দমন করে ফেলে সরমা। তারপর প্রফুল্ল কণ্ঠে জবাব দেয়, তুমিই তো রাগিয়ে দিতে।

প্রসন্ন হাসির মত দেখা দেয় অবিনাশের মুখে।—আর সায়েন্স কলেজে গিয়ে কেমন হাজির হতুম···মনে আছে?

তা আর নেই, প্রায়ই যা জব্দ করতে আমাকে!

আর একবার অসুখের সময় বার্লি খাওয়া নিয়ে কেমন জ্বালিয়েছি? তুমি রেগে আগুন—

তার সঙ্গে হাসতে গিয়ে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হবার উপক্রম সরমার। হাসছে তবু। বলল, চন্দ্র সাহেবের সামনেও নাস্তানাবুদ করেছিলে একদিন।

শিশুর মত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে অবিনাশ। আবার কি মনে পড়ে যায় তার। —আর, সমুদ্রের ধারে আমাদের সেই বসার জায়গাটা? লোকজন নেই দেখে কতদিন মুঠো মুঠো বালি নিয়ে আমার পিঠময় ছড়িয়ে দিয়েছ তুমি!

তুমিও ছাড়তে না।

বড় একটা নিঃশ্বাস উন্মোচন করে অবিনাশ আস্তে আস্তে বলল, তোমার বিয়ের পর আমি একাই গিয়ে বসতাম সেখানে···ভালো লাগত।

সেরে ওঠো, দুজনে একসঙ্গে যাব আবার। নিজের অজ্ঞাতে শাড়ির আঁচলটা মুখে গুঁজে দিয়েছে সরমা।

মেরিন লাইনস্।

সরমা দিনের আলোর প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু একা ঘরে টিকতে পারল না বেশিক্ষণ। যথাসময়ে নিচে নেমে এসেছে। নৈমিত্তিক কাজও শুরু করেছে সকলের সঙ্গে। নিজেকে ভুলতে চায়, অবিনাশকে ভুলতে চায়, ভুলতে চায় সব কিছু। গবেষণার আসন্ন ফলাফলের প্রতি উন্মুখ সকলে, ওর দিকে লক্ষ্য নেই কারো।

টেলিফোন্ বেজে উঠল।

একটু বাদে চন্দ্র রিসিভার নামিয়ে রেখে চকিতে সরমার কাছে এলেন।—কাল অবিনাশকে কেমন দেখে এসেছিলে?

সরমা আঁতকে উঠল প্রায়। কেন, কে ফোন্ করেছে?

মণ্টু ডাকছে হাসপাতাল থেকে···আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে।

অবিনাশের ঘরে ঢোকার মুখে নার্সকে দেখে থামল সরমা। কেমন···?

ভালো না।

অ্যাঁ! অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে সরমা।

নার্স জানালো, জ্ঞান আছে রোগীর।

ঘরে প্রবেশ করতে অবিনাশ তাকালো চোখ মেলে। চন্দ্রকে দেখে হাসতে চেষ্টা করল একটু।

সরমা তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল প্রায়। কেমন আছ অবিনাশ?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বলতে চায়, ভালো আছে।

একটু ভালো আছ? অবিনাশ?

গলা কাঁপছে সরমার।

অবিনাশের মুখে হাসির আভাস একটু। চন্দ্র দাঁড়িয়ে চিত্রার্পিতের মত। মণ্টু নির্বাক দ্রষ্টা।

ডাক্তার এসে গম্ভীর মুখে ইন্‌জেকশান দিয়ে গেলেন একটা।

কিছুক্ষণ…।

মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে আসছে মুখে। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে অবিনাশ ধরতে চাইল কি যেন। খুঁজে পেল সরমার হাত। বিবর্ণ ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা সুস্পষ্ট হল।

সরমা ঝুঁকে পড়ল আবার। ভুলে গেল চন্দ্র সামনে দাঁড়িয়ে। ভুলে গেল মণ্টু বসে আছে। দিশেহারার মত বলে উঠল, আজ একটু ভালো আছ শুনে খুব খুশি হয়েছি অবিনাশ, শুনছ ?

চেয়ে দেখো আমার দিকে, আর কাজ করব না, তোমাকে নিয়ে দূরে চলে যাব কোথাও, বুঝলে ?

অবিনাশ—?

সেখানে আমি তোমাকে দেখব, তুমি ভালো থাকবে, বুঝেছ ?

অবিনাশ—?

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল অবিনাশ।

সরমা মুখ গুঁজল তার বুকের ওপর।

চন্দ্র স্থির দাঁড়িয়ে।

মণ্টু পালিয়ে গেছে ঘর ছেড়ে।

মাথার ওপর সূর্যগোলকের অগ্নি-উদ্‌গিরণ। সরমা শ্লথ গতিতে পথ চলেছে। মণ্টুর সাহায্যে লোক ডেকে শবদাহ সম্পন্ন করতে গেছেন চন্দ্র সাহেব। একটু বাদে দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বিপিন চৌধুরীরও তাই হয়েছে। সবারই এই পরিণতি --। তবু এমন লাগছে কেন ?

সরমা শান্ত হয়ে ভাবতে চেষ্টা করল, অবিনাশ মারা গেছে। আর দেখা হবে না। যা সে বলত আর বলবে না। এই যে লোকগুলো যাতায়াত করছে পথে, কেউ ওরা জানে না অবিনাশ মারা গেছে। ডেকে বলবে ?

কাঁদবে চিৎকার করে ?

মুখোমুখি মণিময়ের সঙ্গে দেখা।

দাদা ? অবিনাশ মারা গেছে।

নিজের কানেই ভারী অদ্ভুত শোনায় কণ্ঠস্বর। হাঁ করে চেয়ে আছে মণিময়। সরমার হাসি পায়, অবিনাশ মারা গেছে এই সহজ কথাটাও বুঝছে না নাকি !

ল্যাবরেটারি।

ভুটা, কাজ করছে, হরিআনন্দ্ কাজ করছে। কাজ করছে আর সব ছেলেরা। সরমার বাইরের চোখ দু'টো অবাক হয়ে দেখছে তাদের। ভেতরটা ডুকরে উঠছে থেকে থেকে, অবিনাশ মারা গেছে, শুনেছ তোমরা? শব্দ বেরোয় না।

ভুটা, হরিআনন্দ্, সকলে ঘিরে ধরল তাকে। নির্বাক প্রশ্ন তাদের।

কিছু না, অবিনাশ মারা গেছে।

ওদিক থেকে হাঁক পাড়লেন সমাদ্দার সাহেব, সরমা এদিকে এসো।

ঘরে গেল।

কি হয়েছে?

অবিনাশ মারা গেছে স্যার।

আরাম-কেদারায় দেহ এলিয়ে দিল সে।

অবিনাশ মারা গেছে এটুকুই মনে আছে, আর কিছু মনে নেই।

বাড়ির দরজায় অপর্ণার গাড়ি দাঁড়িয়ে। বৈঠকখানায় মণিময় বসে আছে। বাইরে থেকে চন্দ্র ঘরে প্রবেশ করলেন। মণিময় উঠে দাঁড়াল তাড়াতাড়ি।

নমস্কার, ভালো আছেন?

চন্দ্র নীরবে একবার তার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করলেন শুধু। দোতলায় উঠে এলেন তারপর। অপর্ণা বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছে।

কোটটা আলনায় ফেলে কাছে এলেন, যাচ্ছ কোথাও?

কেন?

কেন পরে শুনো, আগে জবাবটাই দাও না।

অপর্ণা তাঁর উস্কো-খুস্কো মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে কয়েক নিমেষ। কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন রুক্ষতায় ঈষৎ বিস্মিত। সম্প্রতি ল্যাবরেটারি থেকে তাঁর বাড়ি ফেরার সময়টাও লক্ষ্য রাখছে। আজও দশঘণ্টা অনুপস্থিতির পরে হঠাৎ এ সম্ভাষণ বরদাস্ত হল না। তবু জবাবই দিল আগে।

হ্যাঁ—।

কোথায়?

নাইট-শুটিং আছে।

না গেলে নয়?

না। কিন্তু বারণ করছ কেন?

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে চন্দ্র পাশের ঘরে চলে গেলেন।

একটু বাদে নিচেথেকে মোটর ছাড়ার শব্দ কানে এলো।

অপর্ণা এক কোণ ঘেঁষে নীরবে বসে আছে। রাস্তায় মোটরের দ্রুতগতি। মণিময়ই কথা বলল প্রথম, ডাঃ চন্দ্র হয় পছন্দ করেন না আমি যখন তখন এখানে আসি···।

অন্ধকারে অন্যদিক থেকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল একটা।

কেন?

মনে হল···

অপর্ণার বিরক্তি বাড়ল। কৌতূহলও।—এমন সম্মানটা নিজেই নিজেকে দিচ্ছেন, না কোন কারণ ঘটেচে?

আহত মুখে মণিময় ফিরে তাকালো। সম্মান!

অপছন্দর হেতু যখন আমি, সম্মান বই কি। কি বলেছেন তিনি?

অপমানিত বোধ করলেও আর ঘাঁটাবার সাহস নেই মণিময়ের। অধুনা অপর্ণার উগ্র মেজাজের খবর স্টুডিও মহলে সর্বজনবিদিত। তা ছাড়া, সম্প্রতি ওর মত আর্টিস্ট প্লে করতে রাজী হলে মণিময়ের লেখা যে কোন গল্প চড়া দামে বিকিয়ে যাচ্ছে। করুণা-সৃজনের প্রয়াসই শ্রেয় মনে হল।

বলেন নি কিছু, সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করতে কোন জবাব না দিয়ে চলে গেলেন।···হয়ত শুনতেই পাননি···মনটা আমারই এমন খারাপ হয়ে আছে সেই দুপুর থেকে। তবু তো রাত হোক দিন হোক, কথামত সব জায়গায় হাজিরা না দিলে চলে না।

বিনম্র ভঙ্গীটা বিরক্তিকর আরো। অপর্ণা অন্ধকার পথের দিকে চেয়ে থাকে আবার। মণিময় বলে গেল, কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে সরমাকে দেখলাম প্রায় পাগলের মত চলেছে রাস্তা দিয়ে। আমাকে দেখে ছোট মেয়ের মত কেঁদে ফেলল একবারে।

অপর্ণার হুঁশ ফেরে এতক্ষণে। মন খারাপের প্রসঙ্গে কি বলতে চায় লোকটা খেয়াল করেনি। সরমা পাগলের মত পথ চলছিল, রুক্ষ শুষ্ক মূর্তিতে চন্দ্রর বাড়ি আসা···ঘুরে বসল অপর্ণা।—কি হয়েছে?

মণিময় বিস্মিত, আপনি শোনেন নি?

না, কি শুনব?

অবিনাশ মারা গেল আজ।

হঠাৎ যেন একসঙ্গে হাজার মুগুরের ঘা পড়ল বুকের মধ্যে। অপর্ণা নির্বাক বিমূঢ়। মণিময়ের বাকী বক্তব্য কর্ণগোচর হল না একবর্ণও।

স্টুডিও পৌঁছে গাড়ির দরজা খুলে দিল মণিময়। নিজের অজ্ঞাতে ঘরে এসে বসল অপর্ণা। মেক্‌আপ-ম্যান্‌ তাড়া দিয়ে গেল ক'বার। দেরি দেখে স্বয়ং পরিচালক এলেন খবর নিতে।

অপর্ণার সম্বিত ফিরল যেন। উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, আমার শরীর অসুস্থ—

কোনদিকে না চেয়ে সোজা গিয়ে মোটরে উঠল আবার।

বাড়ির চাকরদের মুখে সংবাদ পেল, বাবু একটু আগে স্নান করে শুয়ে পড়েছেন, কিছু খান নি।

নিঃশব্দে ওপরে উঠে এলো অপর্ণা। শোবার ঘরের আলো নেবানো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

বাইরের বারান্দায় এসে বসল চুপ করে।

সমুদ্রের ধারে বসে অবিনাশ সানুনয়ে অনুরোধ করেছিল সেদিন, একবার যদি অপর্ণা মনে মনেও অন্তত বলে, আর কোন রাগ নেই তার ওপর।

সময় দিল না অবিনাশ। ওর বিদ্বেষটুকুই জেনে গেল শুধু।···তার শেষ সময়েও কেউ ওকে একবার ডাকলে না পর্যন্ত।

অব্যক্ত যাতনায় আতপ্ত প্রতিটি নিঃশ্বাস। বেদনাভারে সরমার বাহ্যজ্ঞান রহিত, কিন্তু বুকচাপা অন্ধকারে সমস্ত রাত্রি নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে কাটলো আরো একজনের। কেউ তার খবর রাখে না।

রূপহীন রসহীন বেদনাচ্ছন্ন জীবনের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির মধ্যে সরমা দাঁড়িয়ে আবার।

দীর্ঘ দু'টো বছর অতিবাহিত।

এর মধ্যে ওদের একটানা কাজে শুধু একটি দিন ছাড়া আর ছেদ পড়েনি। বৃদ্ধ সমাদ্দারকে যেদিন তাঁর ল্যাবরেটারি প্রদক্ষিণ করিয়ে বরাবরকার মত বার করে নিয়ে যাওয়া হল। ঘটা করে সেদিন শোক প্রকাশ করেছে বাইরের বিজ্ঞানী মহল। খবরের কাগজগুলি বড় বড় হরফে তাঁর জীবনের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। কাছের মানুষ যারা, শোক প্রকাশের অবকাশ তাদেরই ছিল না শুধু। বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গম্‌গমে অসহিষ্ণুতাটুকু রেখে গেছেন সমাদ্দার সাহেব,—গো টু ইওর ওয়ার্ক, ডোণ্ট্ ওয়েস্ট টাইম!

ব্যবসায়ী মহলে ল্যাবরেটারি সুনাম অর্জন করেছে বোঝা যায়। নামজাদা দুই একটা প্রতিষ্ঠান থেকে হরিআনন্দ্ এবং ভুটার কাছে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রলোভন এসেছে একাধিক বার। চন্দ্র অথবা সরমাকে ছাড়িয়ে আনা যাবে না তাঁরা জানেন। ভুটা ইতস্তত করেছিল, চন্দ্র আটকে রেখেছেন। সমাদ্দারের লেখাপড়া অনুযায়ী ল্যাবরেটারি এবং সমগ্র ব্যবসায়ের বিধি-ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। তবু যাবে কি না ভাবছিল ভুটা, কারণ, ওর স্বভাবে ল্যাবরেটারির এ গুমোট আবহাওয়া দুঃসহ। হরিআনন্দ্‌কে ঠেকাতে হয় নি। উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের আমন্ত্রণ একপাশে সরিয়ে রেখে শান্ত মনে কাজ করে যাচ্ছে। অবসাদ আসে না এমন নয়। হাত গুটিয়ে তখন চুপ করে চেয়ে দেখে সকলকে, বিশেষ করে ভুটাকে। ভুল করেও সে যদি আগের মত টিপ্পনী কাটে দুই একটা।

ওদের পরে যারা ল্যাবরেটারিতে এসেছে তাদের নিয়ে অবশ্য কোন সংশয় নেই। এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারাটাই তারা বড় বলে জেনেছে।

ফ্যাক্টরী তত্ত্বাবধানের পর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে নিয়মিত হাজিরা দেন চন্দ্র। সেখান থেকে ল্যাবরেটারিতে। অন্য সকলের বাড়ি ফেরার সময় হয়ে আসে তখন।

বাইরের কাজ সরমার তত্ত্বাবধানেও ছেড়ে দিয়েছেন কিছু কিছু। কিন্তু পারতপক্ষে সে ল্যাবরেটারি ছেড়ে যায় না কোথাও। কাজে নেমে আসে

সকলের আগে, যায় সকলের পরে। প্রায়ই তাকে তাগিদ দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে তবে বাড়ি ফেরেন চন্দ্র। কোন দিন বা কথা শোনে না সরমা।—আপনি যান, আমার দেরি হবে একটু।

চন্দ্র বসে থাকেন চুপ করে।

গেলেন না?

তুমি না উঠলে আমার যাওয়া হবে না।

জবাব না দিয়ে হাতের কাজ গুটিয়ে ফেলে সরমা। কাজের প্রসঙ্গ ছাড়া ক্বচিৎ কথার বিনিময় হয়।

এ হেন নিস্তব্ধ পরিবেশে মণ্টু নবাগত।

এম. এস্‌সি ভালো পাশ করেছে। চন্দ্র তাকে ডেকেছিলেন ব্যবসায়ের দিকটা দেখবার জন্য। ঈষৎ চঞ্চল হলেও ছেলেটার বুদ্ধি আছে জানতেন। সংগঠনের ব্যস্ততায় থাকতও ভালো। কিন্তু ব্যবসায়ে দক্ষতা অর্জনে তার কোন আগ্রহ দেখা গেল না। ঝোঁক চাপল, ল্যাবরেটারিতে আসবে।

সরমা মনে মনে কৃতজ্ঞ থাকে চন্দ্রর কাছে। তবু সংশয় প্রকাশ করল একটু, ওর কি ভালো লাগবে এখানে—

চন্দ্র বললেন, দেখা যাক, ভালো না লাগলে নিজেই বলবে'খন।

প্রথম দিনকতক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে কাটল মণ্টুর। সরমার কাছে আসে, কথা বলে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। একজনের স্তব্ধতায় সকলেই আচ্ছন্ন-প্রায়।

হঠাৎ দেখা গেল কাজ করা থেকে কাজ পণ্ড করার দিকে মণ্টুর ঝোঁক বেশি। সুগম্ভীর অন্যমনস্কতায় কখনো গ্যাস ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। নয়ত, আগুন লাগিয়েছে স্পিরিটের আরকে। এক্সপেরিমেণ্ট ভুল করে নিজেকে গাল দিচ্ছে জোরে জোরে, মণ্টুরাম তুমি আস্ত গাধা। অ্যাপারেটাস হাত থেকে ফেলে ভাঙ্গা কাঁচ কুড়োতে গিয়ে আঙুল কেটে এসে দাঁড়াচ্ছে সরমার কাছে, বেঁধে দাও—। বায়না ধরছে যখন তখন, এটা শেখাও, ওটা বলে দাও।

সরমা আঙুল বেঁধে দেয়, কাজ শেখায়, বলেও। বিরক্ত হয়ে আবার হেসেও ফেলে দৈবাৎ। ভুটার ভালো লাগতে শুরু করল আবার। হালকা নিঃশ্বাস ফেলল স্বল্প-ভাষী হরিআনন্দ। খুশির উন্মেষ মণ্টুর সমবয়সীদের মুখে। চন্দ্রর নির্বিকার গাম্ভীর্যে প্রশ্রয়ের আভাস।

সকলে বিদায় নিয়ে গেলে সেদিন রাত্রিতে সরমা চন্দ্রকে বলল, ফ্যাক্টরীতে কোন কাজের ভার দিন মণ্টুকে, এখানে মিছিমিছি সময় নষ্ট শুধু।

সে বলেছে নাকি?

না, আমিই বলছি।

অন্য ব্যবস্থা চন্দ্রর মনঃপূত কি না বোঝা গেল না। জবাব দিলেন, জিজ্ঞেস করে দেখব তাকে।

জিজ্ঞাসার ফল বিপরীত দাঁড়াল। উপর্যুপরি এক সপ্তাহ মণ্টুর দেখা নেই আর। কার ওপর অভিমান বুঝেও সরমা চুপ করে থাকে ক'টা দিন। শেষে টেলিফোনে ডেকে পাঠালো তাকে, একবার এসো, কথা আছে।

রাত্রিতে সরমা নিজের ঘরে একটা বই খুলে বসেছে। মণ্টুর সাক্ষাৎ মিলল। তার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারবে না এবং আসবে আজই এ একরকম জানাই ছিল।

বোসো। বই থেকে মুখ না তুলেই দুই একবার লক্ষ্য করল তাকে। কি ব্যাপার?

খাটে হেলান দিয়ে বসল মণ্টু, কি আর—।

দেখা নেই যে?

চাও না এখানে কাজে আসি, কি করে দেখবে।

দুই একটা পাতা উল্টে বই বন্ধ করল সরমা।—কিন্তু সত্যিই কি এখানে কাজে আসো তুমি?

না।

তা হলে?

তা হলেও ফাক্টরিতে চালান যেতে রাজী নই।

কিসে রাজি বলো—

মণ্টু নিরুত্তর।

সরমা আবার জিজ্ঞাসা করে, কি জন্যে এমন ফাঁকি দিচ্ছ নিজেকে?

মণ্টু অধোমুখে বসে থাকে অনেকক্ষণ। পরে আস্তে আস্তে বলল, চন্দ্র সাহেবের মুখে তোমার কথা শুনে সত্যিই লেগেছিল বৌদি···যদিও বুঝি তুমি ঠিকই বলেছ, এখানে আমার দ্বারা হবে না কিছু। না হোক, তবু তোমাকে একবার সেই আগের মত দেখবার জন্য সারাজীবন এমনি ফাঁকির মধ্যে কাটিয়ে দিতেও আপত্তি হবে না আমার।

খুব ঠাণ্ডা গলায় সরমা বলল, কিন্তু আমার তো হবে মণ্টু। তোমার দাম তো আমার কাছে কারো থেকে কম নয়। আই. এস্‌সিতে ফেল করছিলে বছরের পর বছর—সেখানে থেকে এ পর্যন্ত আমি টেনে তুলেছি তোমাকে, এখন আমিই বাধা হয়ে বসব ?

অনেকক্ষণ বাদে মণ্টু উঠে দাঁড়াল।—এবার থেকে কাজে আর গাফিলতি হবে না বৌদি। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমি চেষ্টা করব।

বেশ, আর একটা কথা—

মণ্টুর নীরব জিজ্ঞাসার উত্তরে দ্বিধা কাটিয়ে বলল, আমাকে বৌদি ডেকো না আর, দিদি ডেকো।

এমন একটা নিষেধ কোনদিন আশা করেনি মণ্টু। নামের পর সরমা আবার ব্যানার্জী লিখতে শুরু করেছে অনেক দিনই জানে। এ নিয়ে দুঃখ করার ছিল না কিছু। কিন্তু আজ আঘাত পেল। বিপিন চৌধুরীকে ভুলতে হলে ওর সঙ্গে এ সম্পর্কটুকুও নিশ্চিহ্ন হওয়া প্রয়োজন, আগে ভেবে দেখেনি।

ল্যাবরেটারিতে বৌদির উদ্দেশ্যে একজনের মিষ্টি হাঁক ডাক আর কোনদিন শুনল না কেউ। মণ্টু কাজ করে মুখ বুজে, কামাই করে প্রায়ই। মাস দুই বাদে হঠাৎ একেবারেই আর সন্ধান মিলল না তার। খবর নিতে গিয়ে বিস্ময়ের সীমা নেই চন্দ্রর। বাড়ি ঘর বিক্রি করে দিয়ে চারুদেবী দেশে চলে গেছেন। মণ্টুর খবর রাখে না কেউ।

সেদিন সন্ধ্যার আগেই সরমা ওপরে উঠে গেল। জানালার কাছে চেয়ার টেনে বসল চুপ করে। হাতের নীল খাম থেকে চিঠিখানা বের করে পড়ল আর একবার।

বৌদি গো, নিষেধ মনে আছে, তবু অন্য ডাকে মন ওঠে না। দাদার জন্যে দুঃখ হয়, কিন্তু আমার পাওয়াও ব্যর্থ হবে কেন ?

সাগর পাড়ি দিলুম। আগে জানাই নি বলে দুঃখ কোরো না। তুমি বাধা দিতে না হয়তো, কিন্তু আমি বাঁধা পড়তুমই। তোমার কাছে থাকলে তোমার থেকেও তোমার কাজকে বড় করে দেখা এখন অন্তত সম্ভব হবে না আমার দ্বারা। একদিন বাইরে তোমার নাম ছড়াবে নিশ্চয় জানি। যেখানেই থাকি সার্থকতার খবর কানে আসবেই। যোগ্য মণ্টুর সন্ধান যেন পাও সেদিন এই আশায় দূরে চলেছি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর কাজের তাড়ায় তখন অনেক ব্যথা তুমি ভুলবে, অনেক কথা আমিও ভুলব। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের গম্ভীর গবেষণায়

আর তখন ফাঁকি থাকবে না। কিন্তু আজ কিছুতে [illegible]তে পারছি না তুমি শুধু বৌদি আমার। শতকোটি প্রণাম নিও। তোমার মণ্টু।

চিঠি কোলের ওপর পড়ে থাকে। অন্যমনস্কের মত সরমা হাসতেও চেষ্টা করে একটু। কিন্তু শুকনো দু'চোখ জ্বালা করে আসে থেকে থেকে।

মণিময় এসেছিল স্টুডিওর সংবাদ নিয়ে। ছাড়া পায় নি এখনো। অপর্ণার ভিতরে ভিতরে অনেকদিন ধরে একটা ভাঙচুর চলছে সর্বক্ষণ সেটুকু উপলব্ধি করতে পারে। অস্বস্তির দুর্ভোগ তারও। প্রযোজক পাঠিয়েছেন পরদিন নাইট্-শূটিং এর নোটিস সই করে নিয়ে যেতে। কিন্তু ঘণ্টা পার হতে চলল এই উপলক্ষে। একথা সেকথায় আসল কাজ চাপা দিয়ে অপর্ণা একেবারে চুপ এক সময়।

এগারোটা বাজে রাত্রি।..

অপর্ণা আড় চোখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ঘড়ির দিকে।...এর পর মানুষটি ফিরবেন। কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে ওপরে উঠে যাবেন সোজা। কথার বিনিময় হবে না একটিও। রাত্রিতে পড়াশুনার অজুহাতে ঘর বদলে নিয়েছেন অনেক দিন।

কি খেয়াল হতে উঠে দাঁড়াল অপর্ণা। চলুন বেরুব।

মণিময় হাঁ।—এত রাত্তিরে!

হুঁ।

কোথায় যাবেন?

চলুন না—।

আর জিজ্ঞাসাবাদের সাহস হল না। চুপচাপ তাকে অনুসরণ করে মণিময় গাড়িতে উঠল। অপর্ণা মৃদুকণ্ঠে ড্রাইভারকে গন্তব্য স্থানের নির্দেশ দিল, মেরিন লাইনস্—

অন্ধকারে বসে ঘামতে লাগল মণিময়।

ল্যাবরেটারি। অপর্ণা নেমে পড়ল।—আপনি বসুন, আমি আসচি।

চন্দ্র একটু আগে বিদায় নিয়ে গেছেন। সরমা তখনো একাগ্র মনে লিখছে কি। দূরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তাকে নিরীক্ষণ করছে কেউ, খেয়াল নেই। এক পা দু'পা করে তার পাশে এসে দাঁড়াল অপর্ণা।

আপনি...!

খুব অবাক হয়ে গেলে তো? উৎফুল্ল হাস্যধ্বনি, এলাম একবার দেখতে রোজ এত রাত্রি পর্যন্ত কিসের এমন গবেষণা। আর একজনকে দেখচিনে যে...?

একটু আগে বেরুলেন।

ও···। ইচ্ছে করেই অপর্ণা হাত-ঘড়ির দিকে তাকালো একবার।—তারপর, তুমি কেমন আছ?

ভালো। বসবেন? বলল বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে আমন্ত্রণও নেই, আগ্রহও নেই।

উল্টে অস্বস্তির মত লাগছে অপর্ণারই। এই সরমাকে সে কোনদিন দেখে নি। কিন্তু তা বলে নিজের জ্বালা ভুলতে পারল না একেবারে। বলল, থাক। ···সম্প্রতি সাইনটিস্ট কি তোমরা দু'জনেই না আরো কেউ আছেন?

বহুদিন আগে অবিনাশের একটা ইঙ্গিত মনে পড়ে যায় সরমার। ক্ষুদ্র জবাব দিল, আরো আছেন।

এত রাত পর্যন্ত খাটাও তাঁদেরও? অপর্ণার লঘু বিস্ময়।

তাঁরা আগেই যান।

ও, তোমাদেরই বুঝি আর জ্ঞানের পিপাসা মেটে না! উচ্ছল-কণ্ঠে হেসে উঠল অপর্ণা। ল্যাবরেটারির চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখল একবার। বলল, জায়গাটি বেশ তো···। তোমাকে বিরক্ত করলাম খুব না।

না। সরমা চেয়ে আছে চুপচাপ।

তোমার দাদা আবার বাইরে বসে আছেন গাড়িতে। চলি, কি বলো?

হ্যাঁ, আসুন। সরমা শান্ত মুখে তাকালো তার দিকে, কিন্তু একটা অনুরোধ, আবার যদি কখনো এখানে আসেন, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন এটা সায়েন্স ল্যাবরেটারি, স্টুডিও-ফ্লোর্ নয়। নমস্কার।

স্বস্থানে এসে লেখায় মন দিল সে। হতভম্বের মত অনেক দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল অপর্ণা। গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করল সশব্দে। গাড়ি চলল।

সাহস সঞ্চয় করতে সময় লাগে মণিময়ের, ডাঃ চন্দ্র নেই?

জবাব পেল না।

একটু থেমে মণিময় আবার বলল, সরমা আমার বোন অপর্ণা দেবী, তাকে আমি জানি···আপনি যা ভাবছেন ঠিক তেমন নয় সে।

এবারে অপর্ণা ফিরে তাকায় তার দিকে! রুক্ষ কণ্ঠে ফিরে প্রশ্ন করে, কি ভাবচি আমি?

ওই দৃষ্টির মুখোমুখি পড়ে মণিময় হক্‌চকিয়ে গেল কেমন। বার কতক ঢোঁক গিলল শুধু।

বাড়ির দরজায় গাড়ি থামতে নামল দু'জনেই। ছুটির আবেদন জানাল মণিময়, আমি যাই···?

অপর্ণা থমকে দাঁড়াল। তাকালো।—আপনি এসেছিলেন কেন?

শুটিং-নোটিস···

সই নিয়েছেন?

না···।

আসুন।

বাইরের ঘরেই মুখোমুখি বসে আছে আবার। চন্দ্রর আগেই ফিরেছে তারা। ট্রেনে আসছেন তিনি. বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক।

সামনে স্টুডিওর ছাপানো নোটিস ফর্ম এবং নিজের কলম রেখে মণিময় অপেক্ষা করছে। তাকে সচকিত করে হঠাৎ হাসতে লাগল অপর্ণা। হাসির দমকে ভেঙে পড়ল যেন। পরে বলল, আপনার বোন যেমনই হোক, তার মত একজনের পাশে দাঁড়িয়ে শুধু কাজই করছেন ল্যাবরেটারির—এমন মানুষই যদি হন আমার ভদ্রলোকটি তাহলেও ভাবনার কথা। হাসি থামিয়ে দম নিল একটু, বুঝতে পারলেন?

ধাঁধায় পড়ে তার সঙ্গে হাসিতে যোগ দেওয়াই নিরাপদ মনে হয় মণিময়ের।

দরজার কাছে চন্দ্র দাঁড়িয়ে। বাইরে থেকে হাসির শব্দ শুনেছেন।

মণিময় নড়েচড়ে বসল। মুখের হাসি ভালো করে মিলায় নি অপর্ণার। কপালে কুঞ্চিত রেখা দুই একটা। নোটিস ফর্ম এবং কলম তুলে নিল সে। তারপর ধীরে সুস্থে বলল, তোমার দেরি দেখে ল্যাবরেটারিতে খোঁজ করতে গিয়েছিলাম আমরা।

একটু আগে নিজে সেধে যে আঘাত পেয়ে এসেছে, সে তুলনায় এতটুকু উষ্মা নেই কোথাও।

কিন্তু সামান্য ক'টা কথায় বিপর্যয় ঘটে গেল একটা। এতদিনের অভ্যস্ত সংযম চন্দ্র হারিয়ে ফেললেন এক নিমেষে। জবাব না দিয়ে ধীর পায়ে মণিময়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

এত রাতে আপনি এখানে কেন?

নোটিস ফর্ম এবং কলম একপাশে সরিয়ে রেখে অপর্ণা আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠল। কিছু বলার আগেই চন্দ্র বাধা দিলেন, থামো!

দু'চোখের স্থির দৃষ্টি মণিময়ের মুখের ওপর।—[illegible] বছর এমনি কেটেছে, আমি বাধা দিই নি। ভদ্রতার আড়ালে যে পশুটা ঘুমিয়ে থাকে তাকে জাগিয়ে তুলেছেন প্রায়। এরপরে কতটুকু সহ্য হবে আপনার?

মণিময় আড়ষ্ট।

যান।

যন্ত্র-চালিতের মত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সে। অপর্ণার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন চন্দ্র। বলো—

এতদিনের পুঞ্জীভূত দাহ অনুভূতির ওপর এত বড় স্ফুলিঙ্গেরও প্রয়োজন ছিল না কিছু। এর অনেক কমেও অপর্ণার ভাণ্ডার বিপর্যয় সুসম্পূর্ণ হতে পারত। অবাক বিস্ময়ে তাঁকে শুধু দেখছে চেয়ে চেয়ে।

অস্ফুট কণ্ঠে বলল, এ অপমান তুমি কাকে করলে?

অপমান-বোধ যাদের আছে তাদের কেউ নও তোমরা। একদিন বলেছিলাম, আমার সম্মানও তোমার হাতে রইল, সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলে, ও-কথা কেন। আজ বুঝছ?

অপর্ণা চেয়েই আছে।

চন্দ্র ভিতরে চলে গেলেন।

পরদিনও বেশি রাত্রিতেই বাড়ি ফিরেছেন তিনি। টেবিলের ওপর ক্ষুদ্র চিঠি চোখে পড়ল।

আমার খোঁজ কোরো না, তোমার সম্মান তোমারই [illegible]।—অপর্ণা।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্র ঠিক নেই। স্তব্ধ, বিবর্ণ। একটু একটু করে সমস্ত মুখে সুকঠোর ছাপ পড়ে একটা। এক পা দু'পা করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন আবার।

পুরুষ-জীবনে একটা বড় ট্র্যাজেডি পুরুষকারের অভিমান। সংসার-জীবনে এর পরিণাম বিষম। কাছে এসে দাঁড়ানো দায়, দূরে সরে এসেও শান্তি নেই। দু'হাত বাড়িয়ে নিতে সঙ্কোচ, দু'হাত ভরে দিতেও। মিলনে বাধা, বিচ্ছেদ দুঃসহ। এ অভিমান অপরকে যতটুকু ভোলায় তার থেকে অনেক বেশি ভোলায় নিজেকে—আসল ট্র্যাজেডি এইখানে। এই ট্র্যাজেডি ছিল বিপিন চৌধুরীর। আবার এই ট্র্যাজেডির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ডাঃ মোহিনী চন্দ্র।

প্রথম ঘা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও রক্তের কণায় কণায় আগুন লেগেছিল।

কিন্তু এক নয় পুরুষকার আর পুরুষকারের অভিমান। চন্দ্র নিজের কাছে ধরা পড়েছেন।

অপর্ণাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। কোথায় গেছে অপর্ণা? স্টুডিও মহলে। স্টুডিও মহলের কোথাও। কিন্তু পথে পথে ঘুরে কাটল দু'দিন। যেখানে সেখানে কাটল দুই রাত। তবু যেখানে সন্ধান মিলতে পারত অপর্ণার, একবারও সে পথ মাড়ালেন না। চন্দ্র নিঃশেষে ধরা পড়েছেন নিজের কাছে। ধরা পড়েছে অনেক কিছু।

ল্যাবরেটারি।

অপর্ণাকে সে রাত্রিতে ওভাবে বিদায় দেবার পরে দুদিন বিগত। ইতিমধ্যে চন্দ্রও আসেন নি আর। তাঁর বাড়িতে ফোন করেও সাড়া মেলে নি। সরমা ভাবছে সেই থেকে। শুধু এখানকার এই কাজ ছাড়া কিছুই সে ভাবতে চায় না আর। কিন্তু তবু ভাবছে। ভাবতে হচ্ছে। সেই রাত্রিতে যাকে সে অপদস্থ করেছিল সে শুধু অপর্ণা নয়। অপর্ণা চন্দ্র। ডাঃ চন্দ্রের স্ত্রী। সামনা-সামনি সেদিন কিন্তু একবারও মনে হয়নি সে-কথা। পরেও হয় নি। কিন্তু এখন হচ্ছে। চন্দ্রর না আসার সঙ্গে সেদিনের ঘটনার যোগ আছে কিছু। নইলে এমন তো হয়নি কখনো।

দুপুরে হরিআনন্দ খবর নিয়ে এলো, চন্দ্র বা[ড়ি] থেকে বেরিয়েছেন দুদিন আগে। বাড়িও ফেরেন নি, কোনো খবরও দে[ন নি]। বাড়িতে তাঁর চাকর ছাড়া অন্য কেউ নেই।

সরমা বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে থাকে শুধু। সব গোলমেলে ঠেকে কেমন। ঘটনার সঙ্গে ঘটনা মেলাতে পারে না। অপর্ণার সঙ্গে তার সেই ব্যবহারের পরের দিনও তো তিনি এসেছিলেন। সারাক্ষণ কাজ করেছেন।

রাত্রি।

সকলে চলে গেছে। ল্যাবরেটারি নিঝুম।

সরমার কাজ এগোচ্ছে না। অবিনাশ মারা যাবার পর থেকে এটাই সে বরদাস্ত করতে পারে না একটুও। একটা পরুষ নিবিষ্টতায় কাজ করে যায়, কাজ করে যেতে চায়। কিন্তু আজ পারছে না। চেষ্টা করছে। পারছে না।

হঠাৎ এক সময় চোখ তুলে দেখে দোর-গোড়ায় চন্দ্র দাঁড়িয়ে। শুকনো উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি। পায়ে পায়ে কাছে এলেন।

সরমার বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে গেল যেন। 'কি হয়েছে?

কিছু না। সহজ হতে চেষ্টা করলেন তিনি।

দ্বিধা কাটিয়ে সরমা আবারও জিজ্ঞাসা করল, এমন দেখাচ্ছে কেন আপনাকে? কোথায় ছিলেন এ ছুদিন?

চন্দ্রর চুপ করে থাকার কথা। নয়তো যাহোক কিছু বলার কথা। ছু'দিন ধরে সংযত করেছেন নিজেকে। কিছু বলবেন না স্থির করে এসেছেন। কিন্তু এই পরিবেশে, এই মুহূর্তে সরমার দিকে চেয়ে বলার তাড়নাটাই বড় হয়ে উঠল হঠাৎ। বললেন, খুব সাদাসির্ধেভাবেই বললেন, ওদের খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। অপর্ণাকে···আর তোমার দাদাকে।

সরমা বুঝে উঠছে না কিছু। চন্দ্র বুক-পকেট থেকে অপর্ণার ক্ষুদ্র চিঠিখানা তার হাতে দিলেন, পড়ো।

সরমা পড়ল। পড়ার পরে বোবার মত বসে রইল।

নিজের সমস্ত রিক্ততা উজাড় করে ফেলে চন্দ্র স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকেন কয়েক মুহূর্ত। সম্বিত ফেরে তারপর। অসহিষ্ণু পায়ে বারকতক ঘরময় পায়চারি করে নিজের ডেস্কএর সামনে এসে দাঁড়ান। একমাত্র সম্বল পুরুষ-কারের অভিমানটাই বড় করে তোলেন আবার। এ[illegible]মেণ্টের সরঞ্জাম গুছিয়ে নেন।

হাতের কাছে যা পেলেন তাই দিয়ে একটা সলিউশন করে [illegible]র্নারে চাপিয়ে দিলেন। কিসের সলিউশন, কি হবে, সেটা অবান্তর। [illegible]রে নিজেকে আড়াল করছেন। আড়াল খুঁজছেন। সরমাকে আদেশ দিলে প্রাসিডিংসএর ফাইলটা দাও—

সরমার কানে গেল না। অথবা, শুনেও বসে রইল চুপ করে।

নিজেই এসে ফাইল নিয়ে গেলেন তিনি। পাতা ওলটালেন একটা, ছুটো—।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন আবার। সম্পূর্ণ।

বার্নারে ব্লু ফ্লেমের শাঁ শাঁ শব্দ। বড় 'বীকার'এ সলিউশন ফুটছে টগবগ করে। 'বীকার'এর মুখ পর্যন্ত গ্যাস জমে উঠল।

চন্দ্রর হুঁশ নেই। ডেস্কএ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আর, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্রকায় খলের মত পাত্রে কি একটা পদার্থ পিষছেন। সময়মত সলিউশনে মেশাবেন। কিন্তু মেশাবার কথা ভুলে গেছেন। শুধু পিষছেন। ভাবছেন কিছু। আবার পিষছেন। এক-একবার ভাবনাটাকেও পিষে ফেলতে চাইছেন যেন।

হঠাৎ একসময় সচেতন হয়ে দেখেন, সরমা চেয়ে আছে তাঁর দিকে। ভাবলেশহীন নিষ্পলক চাউনি। লজ্জায় ধিক্কারে সচকিত হয়ে উঠলেন চন্দ্র। বিব্রত মুখে বীকারএর ওপর ঝুঁকে খলের পদার্থটুকু ঢেলে দিতে গেলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু ঢালা হল না। খলসুদ্ধ হাত থেকে পড়ে গেল ফুটন্ত সলিউশনে।

চন্দ্র দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন। একেবারে অনাড়ম্বরে ঘটে গেল একটা অঘটন।

সরমা দেখছিল বটে। কিন্তু কি দেখছিল সেই জানে। চমক ভাঙল যেন। সত্রাসে অস্ফুট শব্দ করে উঠল একটা। ত্রস্তে কাছে এসে বার্নার নিবিয়ে দিল। —চোখে লাগল ?

জবাব না দিয়ে হাত দিয়ে চোখ দুটো একবার রগড়ে দিলেন তিনি।

সামনে বসে হাত টেনে নামাতে চেষ্টা করল সরমা।—দেখি, কোথায় লাগল ?

চন্দ্র বাধা দিলেন। সম্পূর্ণ আত্মস্থ হয়েছেন। খুব শা[illegible]মুখে বললেন, থাক, একটু জল নিয়ে এসো আগে।

জল আনতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সরমা। 'বীকার'এর মুখে তখনো ধোঁয়া উঠছে গলগলিয়ে। বড় নিশ্বাস টেনে বুঝতে চেষ্টা করল জিনিসটা কি। তারপর তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসে তাঁর সামনে ঝুঁকে বসল আবার।

জলের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে হাত অসাড় [illegible] গেল সরমার। জল ফেলে দিয়ে ব্যাকুল উদ্‌বেগে দু'হাতে জোর করে টেনে তুলল তাঁকে।

টি পার্টির মজলিস বসেছে প্রযোজক দেশাইয়ের স্টুডিও আপিসে। হাস্যোজ্জ্বল সমাবেশ। প্রযোজক দেশাই এবং তাঁর অনুগতদের বিশেষ আগ্রহটুকু কার প্রতি নিবদ্ধ, অবিদিত নয় কারো। একজনের বাড়ি ছেড়ে আসায় এতগুলি পুরুষের গোপন উল্লাস উপস্থিত তরুণী অভিনেত্রীদের মনোবেদনার কারণ। সুচঞ্চল হাস্য-রসে কার্পণ্য নেই তা বলে। লঘু কৌতুকের পরিবেশন চলেছে মুখে মুখে।

অপর্ণার নিখুঁত প্রসাধনে তিন রাতের মর্মচ্ছেদী যাতনা ঢাকা পড়ে গেছে। হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিচ্ছে সেও। এরই মধ্যে চিরাভ্যস্ত মর্যাদাবোধটুকুও সুপরিস্ফুট। মাঝে মাঝে ভাবছে একটা কিছু, বোঝা যায়। হাতে সেদিনের

খবরের কাগজ। খবর আছে। ছোট্ট খবর। এতবড় বোম্বাই শহরে বেশি লোকের চোখে পড়ার মত খবর নয় কিছু। কিন্তু অপর্ণার চোখে, পড়েছে। এবং তার পর থেকেই ভিতরে ভিতরে নিঃশব্দ কাটাছেঁড়া চলেছে একটা।

একজন বললেন, অপর্ণা দেবী কি আজ অসুস্থ নাকি…কেমন যেন আনমনা দেখছি আপনাকে?

হেসেই জবাব দিল, অসুস্থ তো বটেই, নইলে এমন জায়গায় এসে পড়েছি!

ছদ্ম-ত্রাসে প্রশ্ন-কর্তা চক্ষু বিস্ফারিত করে বিব্রত ভাবটুকু চাপা দিলেন। যশস্বিনী অভিনেত্রীর সুপরিচিত মেজাজ আজ শুধু দেমাক বলেই প্রতীয়মান হল অন্যান্য অভিনেত্রীদের চোখে।

অনুযোগের আড়ালে ভক্তি জ্ঞাপন করলেন আর-একজন।—আপনি পরদায় যেমন বাইরেও তেমনি, একটা এই কি বলে—ঝক-ঝকে ছুরি হাতে করেই আছেন যেন!

আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গী করলেন ক্যামেরাম্যান্ কাপুর।—আপনার 'অনার'এ আজকের পার্টি, ছুরি হাতে থাকলেও ভয় করিনে—আমরা গলা বাড়িয়ে দেব—আওয়ার থ্রোট্স্ অ্যাট্ ইওর ডিস্পোজাল্!

সম্মিলিত হাস্যধ্বনির মাঝখানেই অপর্ণা উঠে দাঁড়াল। দেশাই এগিয়ে এলেন, এরই মধ্যে যাবেন?

হ্যাঁ, কাজ আছে।

সকলের উদ্দেশে ছোট নমস্কার করে বাইরে এলো সে। মণিময় অনুসরণ করল তাকে। জিজ্ঞাসা করল, সত্যিই যাবেন কোথায়?

বললাম তো কাজ আছে।

আমি আসব সঙ্গে?

আসবেন? হাসল অল্প একটু, আচ্ছা আসুন।

অপর্ণার নির্দেশমত একটা হাসপাতালের সামনে ড্রাইভার গাড়ি থামাল। নামল তারা। মণিময় বিস্মিত। এখানে কোথায়?

ডাঃ চন্দ্র অসুস্থ, ল্যাবরেটারিতে অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছিল—তাঁকে দেখতে।

মণিময় দাঁড়িয়ে পড়ল স্থাণুর মত। জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ঘষে নিল বারকতক।

অপর্ণা হাসছে তেমনি। নির্মম হাসি। মাথা নিচু করে দ্রুত প্রস্থান করল মণিময়।

নিরালা কেবিনে চন্দ্র শুয়ে আছেন। চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। অপর্ণার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল কেমন। আস্তে আস্তে কাছে এসে বসল।

কে, সরমা ?

সাড়া নেই।

এত তাড়াতাড়ি এলে আজ ?

সাড়া নেই।

হাত বাড়িয়ে চন্দ্র তুলে নিলেন অপর্ণার হাত। গায়ে কাঁধে হাত দিয়ে অনুভব করতে চাইলেন কি যেন। উত্তেজনায় উঠে বসলেন পরক্ষণে। দু'হাতে চোখের ব্যাণ্ডেজ টেনে খুলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

কিছুক্ষণ…।

আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন আবার। খুব নিস্পৃহ মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে আছি তুমি কি করে জানলে ?

অপর্ণা জবাব দিল, খবরের কাগজে দেখলাম।

আরো সহজ হতে চেষ্টা করলেন চন্দ্র। বললেন, কাগজেও বেরিয়েছে বুঝি …দেখো তো কাণ্ড, সামান্য লেগেছে, দুদিনেই সেরে যাবে।

মনে মনে মস্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অপর্ণা। জিজ্ঞাসা করল, কি করে লাগল ?

চন্দ্র জবাব এড়িয়ে গেলেন। বললেন, কাজ করতে গেলে এমন একটু-আধটু হয়, ও কিছু নয়।

সত্যি কথা বললেন না ডাঃ চন্দ্র। কি হয়েছে জানেন। কি হতে পারে চোখের অবস্থা, তাও জানেন। অন্তত অনুমান করতে পারেন। কিন্তু সে কথা শুনিয়ে অপর্ণাকে কাছে টানতে চান না তিনি। সুস্থ জীবনে যা হয় নি, আজ ওর অনুকম্পা দিয়ে সে ফাঁকটাকে ভরে তুলতে চান না।

দুর্ঘটনা তেমন কিছু নয় জেনে অপর্ণা আশ্বস্ত হয়েছে বটে। কিন্তু নিস্পৃহ দু'চার কথায় অসুস্থতার প্রসঙ্গ এড়ানোর চেষ্টাটাও লক্ষ্য করেছে সেই সঙ্গে। যেন পরিচিত কেউ একজন দেখতে এসেছে তাঁকে। যেটুকু না বললে নয়, সেটুকুই বলা।

একটু থেমে নিরুত্তাপ কণ্ঠে চন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, এ ক'টা দিন কোথায় ছিলে ?

অপর্ণা জবাব দিল না। চুপচাপ চেয়ে রইল।

সেটা উপলব্ধি করেই চন্দ্র ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন একটু। তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। চোখে ব্যাণ্ডেজ। কিন্তু অপর্ণাকে দেখতে চাইছেন তিনি। খুব ভালো করে দেখে নিতে চাইছেন। তার বদলে অপর্ণা দেখছে তাঁকে। হয়তো খুঁটিয়ে দেখছে। আর যে ঝড় বয়ে গেল এ ক'টা দিন, তার আভাস পাচ্ছে। প্রচ্ছন্ন ক্ষোভে বললেন, অ্যাকসিডেন্ট যেমনই হোক, তোমাকে আমি ঠিক আশা করি নি অপর্ণা।

দুই-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অপর্ণা শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, চলে যাব?

অনুমানে তার দিকে মুখ ফেরালেন চন্দ্র। কণ্ঠস্বর থেকেই কিছু যেন উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলেন।—বোসো। অনেকক্ষণ বাদে আবার বললেন, দোষ তোমার নয়, দোষ আমারই।

অধর-প্রান্তে দুটো দাঁতের দাগ পড়ে যায় অপর্ণার।

দোরগোড়া থেকে তার অলক্ষ্যে সরমা নিঃশব্দে সরে গেল।

চন্দ্র হঠাৎ বললেন, কিন্তু তাহলেও তোমার পক্ষে আর কি ফিরে আসা সম্ভব নয়?

অপর্ণা নিরুত্তর।

আসবে? শয্যার ধারে ঝুঁকে এলেন তিনি।

তার যাওয়াটা বড় করে দেখেছেন বলেই আজ এ প্রশ্ন। মৃদু কণ্ঠে অপর্ণা ফিরে জিজ্ঞাসা করল, ক'টা দিন আমি ছিলাম না তোমার সঙ্গে, কেউ জানে?

শোনামাত্র চন্দ্রর বিব্রতভাবটুকু গোপন থাকল না তা। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা চোখের ওপর একটা হাত রাখলেন। মুখের কাছটা বিবর্ণ দেখাচ্ছে। অস্ফুট জবাব দিলেন, জানে···। কি একটা দুর্বলতা যেন ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন পরমুহূর্তে। আরো জোর দিয়ে বললেন, সরমা জানে। তাতে কী?

সাড়াশব্দ নেই। তাঁর অসহিষ্ণুতা উপলব্ধি করেও অপর্ণা চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, কিছু না। এর পরে আমার ফিরে আসাটাই হয়তো সবচেয়ে বড় দুঃখের কারণ হবে তোমার। এসব কথা এখন থাক, তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠো তুমি···তোমার কাজ আছে, সাধনা আছে, সত্যিই এ-সবের কাছে আমি কিছু না।

উঠে দরজার দিকে এগোলো সে।

চন্দ্র ডাকলেন, অপর্ণা যেও না, শোনো—

অপর্ণা দাঁড়াল না, একপ্রকার জোর করেই বেরিয়ে এলো যেন। থমকে দাঁড়াল সরমাকে দেখে। পাশ কাটিয়ে চলল আবার।

দাঁড়ান।

অপর্ণা ঘুরে দাঁড়াল। দৃষ্টি বিনিময়।—বলবে কিছু?

হ্যাঁ। চলেই যদি যাবেন, এখানে আসার তো কোনো দরকার ছিল না?

অপর্ণা খানিক দেখল তাকে। হাসল একটু। বলল, কি জানি… সেদিন তোমার মুখ থেকে একটা অতিবড় সত্যি কথাই শুনেছিলুম ভাই জীবনটা নাটক নয় এ কিছুতে ভুলতে পারলুম না। যাক, অসুখ শুনলে লোকে তো দেখতেও আসে…চোখের অবস্থা কেমন এখন?

ভালো না।

অপর্ণা সচকিত হল যেন।—কিন্তু উনি যে বললেন তেমন কিছু নয়?

ঠিক বলেন নি।

তার চোখে চোখ রেখে অপর্ণা অপেক্ষা করল একটু।—ভালো নয় উনি জানেন?

জানেন।

আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে অপর্ণা সিঁড়ির দিকে এগোলো।

স্টুডিও, নতুন বাসা, সমুদ্রের ধার—কোথাও টিকতে পারল না অপর্ণা, সমস্ত দিন অফুরন্ত যাতনায় ঘোরাঘুরি করে শিবাজী পার্কের বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। পুরানো চাকর দৌড়ে এলো শশব্যস্তে।

ভিতরে ঢুকল। দোতলায় উঠতে গিয়ে পা চলে না। সমস্ত বাড়িটা বোবা শূন্যতায় যেন একটা নিঃশব্দ হাহাকার কানে বাজছে।

হাসপাতাল থেকে অপর্ণা চলে যাবার পরেও সরমা কিছুক্ষণ বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। তারপর কেবিনের কাছে এসে দেখল, চন্দ্র বিছানায় উঠে বসেছেন। কারো প্রতীক্ষায় বসে আছেন যেন।

ভিতরে ঢুকে অপর্ণার পরিত্যক্ত চেয়ারে এসে বসল সরমা।

ঈষৎ ব্যগ্রতায় তার হাত খুঁজে পেতে সময় লাগে চন্দ্রর। কণ্ঠস্বরে সাগ্র অনুনয়, আমি সব ভুল শুধরে নিতে চেষ্টা করব অপর্ণা—

আমি সরমা।

নিমেষে অসাড় নিস্পন্দ হয়ে গেলেন যেন মানুষটি। লজ্জায় বেদনায় সঙ্কুচিত সমস্ত মুখ। হাত ছেড়ে দিলেন।

চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলতে মাসাধিক কাল সময় লাগল। লাঠি ভর করে চন্দ্র হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন একদিন। পাশে সরমা। একটু আগে তাকে ডেকে ডাক্তার জানিয়েছিলেন, চোখে যেটুকু দেখতে পাচ্ছেন এখন, তাও বেশি দিন পাবেন বলে মনে হয় না। সাবধানে রাখতে হবে।

সরমার হাত ধরে চন্দ্র গাড়িতে উঠলেন। কিছুদূরে রাস্তার উল্টোদিকে অপর্ণা দাঁড়িয়ে। আড়ালে সরে গেল।

চন্দ্র আদেশ দিলেন, ল্যাবরেটারিতে যেতে বলো।

সরমা জবাব দেয়, হ্যাঁ সেখানেই থাকবেন আপনি।

সমাদ্দারের ঘরেই ব্যবস্থা করে দিও আমার। অনেক দিন কামাই হয়ে গেল—এ ক'দিনে তোমরা কতদূর কি করলে?

কিছুই না। কিন্তু এখন কিছুদিন বিশ্রাম দরকার আপনার।

আমার কথা ভেবে সময় নষ্ট করতে হবে না তোমাদের।

সরমা চমকে উঠল, হঠাৎ যেন সমাদ্দারের কণ্ঠস্বর শুনল সে।

মেরিন লাইনস্‌এর পথে যতদূর দেখা যায় গাড়ি, অপর্ণা দাঁড়িয়ে রইল। পরে অন্যমনস্কের মত বাড়ি ফিরল এক সময়।

প্রযোজক দেশাই সদলবলে অপেক্ষা করছেন বাইরের ঘরে।

গত একমাস অপর্ণার কোন সন্ধান না পেয়ে শিবাজী পার্কে চন্দ্রর গৃহেই হানা দিয়েছেন। চাকরের মুখে সংবাদ পেলেন, অপর্ণা এখানেই আছে বরাবর।

সমবেত বিস্ময় এবং কুশল প্রশ্নের জবাবে অপর্ণা মৃদুস্বরে বলল, বসুন।

ভিতরে চলে এলো। দোতলা থেকে চেক বই এবং কলম নিয়ে নিচে নেমে এলো আবার। সকলকেই দেখে নিল একবার। আজ আর মণিময় আসে নি। দেশাইকে লক্ষ্য করে বলল, আপনারা মিছেই কষ্ট করে এসেচেন, আমি আর ছবিতে নামব না। চেয়ার টেনে বসল।

ভাবগতিক প্রাঞ্জল ঠেকছে না দেশাই-অ্যাণ্ড্-কোম্পানির। তবু মুখভাবে মনে হল এমন কথা এই যেন প্রথম শুনলেন।—মানে, কোন ছবিতেই প্লে করবেন না আর? দেশাইয়ের মর্মচ্ছেদী বিস্ময়।

না।

কিন্তু নতুন ছবিটা অন্তত শেষ করে দিন, কণ্ট্রাক্ট্ হয়ে আছে—

মাপ্ করবেন।

চলচ্চিত্র প্রযোজক এক নিমেষেই হৃদয়ঙ্গম করলেন আবেদনে ফল হবে বিপরীত গাম্ভীর্যে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, মাপ করবেন বললেই আমরা শুনি .. কি করে, কণ্টাক্ট সই করেছেন, আমরা টাকা অ্যাডভান্স করেছি—।

টাকা ফেরত নিয়ে যান। অপর্ণা চেক বই টেনে নিল।

কিন্তু ওতে তো আমাদের ক্ষতিপূরণ হবে না, এ ছবি আপনাকে শেষ করে দিতে হবে।

চেক বই বন্ধ করে অপর্ণা উঠে দাঁড়াল।—কোর্টএ যান তাহলে, সেখানে আপনাদের ক্ষতিপূরণের মীমাংসা হবে। একমুহূর্তেও অপেক্ষা না করে ওপরে চলে এলো।

ল্যাবরেটারি।

চন্দ্র দেখতে পান না ভালো। হাতড়ে হাতড়ে কাজ করেন। সরমা নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এটা ওটা এগিয়ে দেয় হাতের কাছে। তিনি বিরক্ত হন, আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি, তোমার কাজ করো তুমি।

ল্যাবরেটারির চতুরাঙিনার মধ্যে চন্দ্র নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন আস্তে আস্তে। ফ্যাক্টরির সকল ব্যবস্থাও এখন বেশির ভাগই সরমার তত্ত্বাবধান সাপেক্ষ। চন্দ্র তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন সব। দিচ্ছেনও। এ কিসের প্রস্তুতি সরমা উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করে না।...কিছু হবে না, কিছু হবে না। আর কত হবে? কত আর হতে পারে? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যন্ত্র-চালিতের মত কোথা দিয়ে কেটে যায় টের পায় না। হরিআনন্দ যথাসম্ভব সাহায্য করছে তাকে। ভুটা বড় চাকরি নিয়ে চলে গেছে কিছুদিন আগে। চন্দ্র আর বাধা দেন নি।

নিয়মিত ডাক্তার আসেন। চোখ দেখে যান। সে সময়টুকু সরমার বিষম এক সংকটের মধ্যে কাটে যেন, পাছে এমন কিছু শুনতে হয় যা সে শুনতে চায় না। ডাক্তার চলে গেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তাঁর নির্দেশমত চালাতে চায় চন্দ্রকে। নির্দেশমতই চলেন তিনি। আর কথা [illegible] মুখ বুজে।

তাঁর দিকে চেয়ে সরমার মনে হয় নিজের ওপর নীরবে কি যেন একটা নির্মম প্রতিশোধ নিয়ে চলেছেন তিনি

দক্ষ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। একটু আগে হরিআনন্দ বাড়ি চলে গেছে। বাইরে থেকে যারা আসে তাদের মধ্যে সে-ই সব থেকে আগে আসে আর সবার পরে যায়। চন্দ্র খোঁজ করলেন, রেডঅ্যানের ফাইলটা কোথায় ?

সরমা এগিয়ে এসে তাঁর ডেস্ক থেকেই টিউবটা কাছে বাড়িয়ে দিল।

ঠিক আছে যাও।

অদ্ভুত অন্যদের মত লাগছে চন্দ্রর। মাথাও ভার তখন থেকে। এ কাজটুকু শেষ হলেই আজকের মত ক্ষান্ত হবেন। কিন্তু হচ্ছে না শেষ। থেকে থেকে চোখের সামনে ঝাপসা দেখছেন সব কিছু।

সহসা ভয়ে ত্রাসে একেবারে যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন তিনি। মনে হল যা হবার তার সময় হয়ে এলো। দেহের সব স্নায়ু একসঙ্গে কেঁপে উঠল থর-থরিয়ে। নিষ্ঠুর নির্মম দৃষ্টিনাশা অন্ধকার যেন গ্রাস করতে আসছে তাঁকে। ব্যাকুলমুখে তাকাতে লাগলেন এদিকওদিক। দুই চক্ষু রগড়ে নিলেন দুই হাতে। চোখ টান করে দেখতে চেষ্টা করলেন সব কিছু।

সরমা!

সরমা দৌড়ে এলো কাছে।

সরমা—!

এই যে আমি, কি হয়েচে ?

হঠাৎ থতমত খেয়ে আত্মস্থ হলেন চন্দ্র সাহেব। সামলে নিলেন। যা ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে তার থেকেও এই উত্তেজনাটুকুই বেশি অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। বিব্রতমুখে বললেন, ঠিক যেন দেখতে পাচ্ছিনে আর···।

সরমা চেষ্টা করল একটা টুলের ওপর তাঁকে বসিয়ে দিতে। সক্ষম হল না। ডেস্ক থেকে একটা অ্যাপারেটাস মাটিতে পড়ে ভাঙল ঝনঝন শব্দে। অস্ফুট মৃদু কণ্ঠে চন্দ্র বললেন, ব্যস্ত হয়ো না ···।

পায়ে পায়ে নিজের ঘরে এসে শয্যার উপর বসলেন তিনি। নিজের পশ্চাতে সরমাও এলো। তারপর সম্বিত ফিরতে তাড়াতাড়ি টেলিফোনের রিসিভার তুলে নম্বর ডায়াল করতে লাগল।

ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছে বুঝেই চন্দ্র বাধা দিলেন, ওটা রাখো, রাত করে না। আর এসে কি করবে, কাল সকালে দেখা যাবে। তুমি তোমার হাতের কাজ সব গুছিয়ে রেখে এসো চট করে।

পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে সরমার। টেলিফোনের রিসিভা